একটী ক্ষুদ্র জীবনের কথা

প্রথম খণ্ড

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

১৩৩৯

রায় সাহেব শ্রীযোগেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী
কর্ত্তৃক
চক্রধরপুর হইতে প্রকাশিত।

প্রিণ্টার—শ্রীগোপেশ চন্দ্র নন্দী
বিজয়া প্রেস
১২ নং করিস চার্চ্চ লেন, কলিকাতা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে ~~করকমলে~~

~~আমার আন্তরিক .... স্বরূপ~~

এই ক্ষুদ্র আত্মকথা উপহার

প্রদত্ত হইল।

চক্রধরপুর

তাং ১১।৯। ১৩৩৯ সাল

মুখবন্ধ

যাঁহার "ক্ষুদ্র জীবনের" ইতিহাস এই আখ্যায়িকায় বিবৃত হইয়াছে, তিনি বাস্তবিক "ক্ষুদ্র" নহেন—একজন আদর্শ পুরুষ, সংসারক্ষেত্রে কর্ম্মবীর। অশীতিবর্ষ বয়ক্রমে স্বহস্তে এই আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বাল্যে খুল্লতাতের আশ্রয়ে মাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, সংসার-বিচ্যুত অবস্থায় ক্ষুদ্র কেরাণীগিরি হইতে স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাশক্তি গুণে কি করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, তৎপরে যশের সহিত মহকুমার শাসনভার পরিচালনান্তে অবসর গ্রহণ করেন এবং নানারূপ অবস্থা বিপর্য্যয়েও কি করিয়া তিনি জনপ্রিয় হইয়াছিলেন, তাহাই এই আখ্যায়িকার প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন রীতি-নীতি, সামাজিক আচার ব্যবহার, দ্রব্যাদির মূল্য প্রভৃতি এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়েরও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ইহাতে রহিয়াছে।

বাংলার বাহিরে যে সমস্ত বাঙ্গালী সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সরকারী কার্য্যে অবসর গ্রহণান্তে, অশীতিপর বৃদ্ধ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান, প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি নানারূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যেরূপ কার্য্যকুশলতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং একাধিক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য যে উৎসাহ ও উদ্যম প্রদর্শন

করিয়াছেন, তাহা তরুণ যুবকগণেরও অনুকরণীয়। আতিথেয়তা, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও স্বজনবাৎসল্য তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কি করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে হয় এবং কি প্রকারে সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হওয়া যায়, তাহা ইনি পরবর্ত্তী বংশধরগণকে দেখাইতেছেন। প্রবাসী বাঙ্গালীর সাধারণতঃ স্বদেশের প্রতি আকর্ষণ কম। কিন্তু ইনি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিদেশে থাকিয়াও জন্মভূমির উন্নতিকল্পে কিরূপ আত্মত্যাগ করিয়াছেন তাহা এই আখ্যায়িকায় বিশেষরূপ পরিলক্ষিত হইবে।

গুণের আদর সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। প্রথম জীবনে অবস্থা বৈগুণ্যে বাংলা সরকার কর্ত্তৃক পুরস্কৃত না হইলেও, অবসর গ্রহণান্তে বিহার ও উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট ইহাকে "রায় সাহেব" উপাধিতে ভূষিত করিতে কার্পণ্য করে নাই।

বড় আদরের একমাত্র কন্যার অকালমৃত্যুতে এবং পরিণত বয়সে পত্নীবিয়োগজনিত শোক না পাইলে, এই কর্ম্মবীরের উৎসাহ ও উদ্যম শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিত বলিয়াই বোধ হয়।

ভগবানের নিকট এক্ষণে ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা যে ইনি যেন স্বাস্থ্য ও শান্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য আরও কিছুদিন কর্ম্মক্ষম থাকিয়া সংসারে জ্বলন্ত আদর্শরূপে বিরাজ করিতে থাকেন।

পাঠকগণের সুবিধার জন্য অত্রসহ একটী বংশতালিকা সন্নিবিষ্ট হইল।

শ্রীরমাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী।
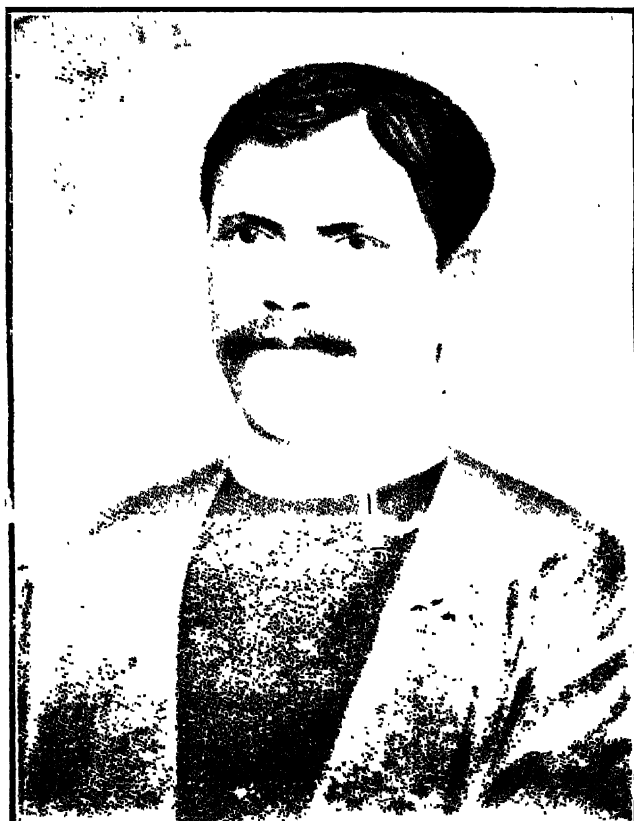
1895

একটী ক্ষুদ্র জীবনের কথা

সূচনা

সর্ব্বসাধারণের পাঠের জন্য এই আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ হয় নাই। আমার লোকান্তর হইলে পরবর্ত্তী বংশধরদিগের মধ্যে যাঁহারা একটু লেখাপড়া শিক্ষা করিবেন, তাঁহাদেরই জন্য; তাঁহাদের একজন পূর্ব্বপুরুষ বাল্যকাল হইতে কি ভাবে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, কিরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন, সংসারের ও তদানীন্তন সমাজের অবস্থায় তাঁহার চরিত্র কি ভাবে গঠিত হইয়াছিল, এবং ঐসকল শিক্ষা, সংস্কার, সাংসারিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া তাঁহার জীবনের কার্য্যকলাপ কি ভাবে পরিচালিত হইয়াছিল, কেবল তাহারই প্রধান প্রধান ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া রাখিতেছি। এই আশায় লিখিতেছি যে, সুশিক্ষিত পরবর্ত্তী বংশধরগণ অন্ততঃ কৌতূহলবশেও এই পুস্তকখানি পাঠ করিবেন। সমাজের পরিবর্ত্তন তীব্র গতিতে ঘটিতেছে; আমার বাল্যকালে লোকের যে রুচি ছিল, এখন আর তাহা নাই। আবার যে সময় আমার নাতিপুতিগুলি মানুষ হইবে, সেই সময় রুচির আরও পরিবর্ত্তন হইবে। যাহাই হউক, আমার কথাগুলি আমি লিখিয়া যাইব; যাঁহার ইচ্ছা হইবে, তিনিই পড়িবেন।

বাংলা সন ১২৫৯ সালের ১৮ই পৌষ (ইং ১৮৫২ সালের

৩১ সে ডিসেম্বর) নদীয়া জেলার অন্তর্গত দিগনগর গ্রামে আমার জন্ম হয়। সর্ব্বপ্রথমে জন্মস্থান দিগনগরের এবং যে বংশে জন্ম-হইয়াছিল, সেই বংশের একটু পরিচয় দেওয়া সঙ্গত বিবেচনায় সংক্ষেপে এই দুইটী বিষয় লিখিতেছি।

যে সময় আমার পূর্ব্বপুরুষেরা দিগনগরে আসিয়া বাস করেন, সেই সময় এই গ্রামটী নদীয়া জেলার মধ্যে বেশ একটু সমৃদ্ধিশালী গণ্ডগ্রাম ছিল। তাহার অনেক নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরে তিন ক্রোশ দূরে জেলার প্রধান নগর এবং নবদ্বীপাধিপতি মহারাজদিগের রাজধানী "কৃষ্ণনগর"; দক্ষিণে তিন ক্রোশ দূরে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগর "শান্তিপুর"; উত্তর-পশ্চিম চারিক্রোশ ব্যবধানে তৎকালীন বাংলার সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রস্থান শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের লীলাক্ষেত্র শ্রীধাম "নবদ্বীপ" এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বে চারিক্রোশ দূরে সুপ্রসিদ্ধ "উলা" বা "বীরনগর"। বহু নিদর্শনের দ্বারা জানা যায় যে পূর্ব্বে দিগনগর গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া পুণ্যসলিলা ভাগীরথী অথবা তাহার একটী শাখা প্রবাহিত ছিল। কালক্রমে সেইটী ভরাট হইয়া প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছিল এবং সেই সুবৃহৎ ভূখণ্ড চররূপে পরিণত হইয়া মানুষের বাসের যোগ্য হইলে ক্রমে ক্রমে ইহার মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম বসিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতেই এই গ্রামগুলি স্থাপিত হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভূমিগুলি খাল, বিল ও জলা ভূমিরূপে বহুদিন বর্ত্তমান ছিল; যথা "ভালুকার বিল", "গোপেয়ার

খাল", "বাগদেবীর খাল" ইত্যাদি। বর্ষার সময় এই সকল খাল, বিল ও জলাভূমিতে ভাগীরথীর জল প্রবেশ করিত এবং সেই সঙ্গে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ নানাবিধ মাছের ডিম এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোনা আসিয়া ঐসকল খালে বিলে যাইয়া মৎস্যপূর্ণ করিয়া রাখিত। আমার বাল্যকালেও ঐ সকল খাল বিলে যাইয়া আমি নিজে এবং সকল শ্রেণীর, সকল বয়সের, লোক প্রতিদিন রাশীকৃত মৎস্য ধরিয়া আনিতাম। বর্ত্তমান সময়ে ঐসকল খাল বিল শুকাইয়া যাইতেছে, এমন কি বর্ষার কয়েকমাস ভিন্ন, অন্য সময় ঐসকল বিলের উপর দিয়া গো শকট প্রভৃতিও অনায়াসে যাতায়াত করিয়া থাকে। সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাববশতঃ গ্রামগুলি জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইতেছে ও প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে। লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয়, কালক্রমে এই সোনার দেশ দ্বিতীয় সুন্দরবনে পরিণত হইবে।'

আমাদের বাসভূমি দিগনগর গ্রামটী যে এককালে খুব বর্দ্ধিষ্ণু ও বিখ্যাত ছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ ছেলেভুলান "জন্তিগাছটীর" ছড়ায় "দিগনগরের মেয়েগুলির" কথা আজও পশ্চিমবঙ্গের প্রতি ঘরে ধ্বনিত হইয়া থাকে। দিগনগরের রাঘবেশ্বর নামক শিবমন্দির শিখরে উৎকীর্ণ নিম্নলিখিত শিলালিপি হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের এই গ্রামের অস্তিত্ব, ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল।

"শাকে সোমনবেষু চন্দ্রগণিতে পুণ্যৈক রত্নাকরো।
ধীর শ্রীযুক্ত রাঘবোদ্বিজমণির্ভূমিভূজামগ্রণীঃ॥

নির্ম্মায় স্ফুরদূর্ম্মি নির্ম্মল জলপ্রদ্যোতিনীং দীর্ঘিকাং।
তত্তীরে কৃতরম্য বেশ্মনি শিবং দেবং সমাস্থাপয়ৎ॥"

অর্থাৎ—১৫৯১ শকে (১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে) ব্রাহ্মণ শিরোমণি রাজশ্রেষ্ঠ ধীরমতি (কৃষ্ণনগর রাজবংশের) রাজা রাঘব স্বচ্ছ জলসঙ্কুল দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তত্তীরে এই সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শিবস্থাপনা করিলেন।

অনেকে অনুমান করেন যে, উক্ত দীর্ঘিকা হইতেই এই গ্রামের নাম দীঘিনগর বা দিগনগর হইয়াছে।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কোন্ সময় কোথা হইতে দিগনগরে আসিয়া বাস করেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে তাঁহাদের নামের সঙ্গে অনেকেরই "রাম" যুক্ত থাকায়—যথা "কেবলরাম", "রামচন্দ্র", 'রামকিশোর" "রামশঙ্কর" "রঘুরাম" ইত্যাদি—অনুমান হয় যে তাঁহারা "ভজলে সীতারামের" দেশ হইতেই আসিয়াছিলেন। কালক্রমে রাজদত্ত "চক্রবর্ত্তী" উপাধি পাইয়াছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে এই দেশেই বিবাহ করিয়া একেবারে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন। যে সময় ভাগীরথী বা তাহার একটী শাখা এই দিগনগর গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত ছিল, তাহার অনেক পূর্ব্বেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে এখানে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, নিম্নলিখিত প্রবাদটীর দ্বারা তাহা কতক পরিমাণে উপলব্ধি হয়। গ্রামের নিকট দিয়া প্রবাহিত থাকায় গ্রামের কুলবধূ ও কন্যাগণ নদীতে যাইয়া স্নান আহ্নিক করিতেন, গৃহাস্থলীর ব্যবহারের জন্য জল আনিতেন, বাসন

মাজিতেন, পর্ব্ব উপলক্ষে সন্ধ্যাদীপ ভাসাইতেন এবং যে সকল কাজে জলের প্রয়োজন সে সমস্ত কাজই এই নদীর জলে নিষ্পন্ন হইত। একদিন একখানি সুসজ্জিত বজরায় কোন ধনীপুত্র বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে আমোদ প্রমোদ করিয়া যাইবার সময় নদীতীরস্থ যুবতীবর্গের প্রতি কুৎসিৎ ইঙ্গিত আদি করিয়া অবমানিত করেন। এই বিষয় আমাদের তৎসাময়িক পূর্ব্বপুরুষ-গণের কর্ণগোচর হইলে, তাঁহারা যোগবলে বা তপস্যার প্রভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই এই নদীর গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক কারণেই যে এটা ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেকালের লোকের বিশ্বাস যে যোগবলেই নদীর গতি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। এই প্রবাদের দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে পূর্ব্বপুরুষগণ বিশেষ ধর্ম্মপরায়ণ, নিষ্ঠাবান্ ও তৎসাময়িক সর্ব্ব-লোক পূজিত উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন। আমার বাল্যকালেও শুনিয়াছি, কোন কোন প্রাচীন লোকে বলিতেন "ওদের কিছু বলিও না, ওরা কেঁউটে বাচ্চা, নদী ফিরানর ঝাড়।"

পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে অনেকেই স্থানান্তর হইতে সৎ-কুলীন সন্তান আনিয়া কন্যার সহিত বিবাহ দিতেন এবং নিজগ্রামে বা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া কিছু ভূসম্পত্তি দিয়া কন্যা জামাতাকে স্থায়ীভাবে বাস করাইতেন। ইহাতেই অনুমান হয় যে তাঁহারা সে সময়ে বেশ একটু সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। আমাদের দৌহিত্র বংশমধ্যে দুই তিন ঘর এখনও দিগনগর ও

ঘোলগাছি প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। কয়েক ঘর স্থানান্তরে উঠিয়া গিয়াছেন এবং দুই তিন ঘর একেবারে নির্ব্বংশ হইয়াছেন।

জন্মস্থানের এবং বংশের যৎসামান্য পরিচয় দিয়া এখন জীবনের কথাগুলি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বয়ক্রম ৭৯ বৎসর হইয়াছে; ননাবিধ রোগে, শোকে এবং সংসারের বহুতর অপ্রীতিকর ঘটনায় শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বড়ই বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এখন দিন গণনা করিবার সময় আসিয়াছে, কোন্ মুহূর্ত্তে যে ডাক পড়িবে কেবল তাহাই ভাবিতেছি। জানি না এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার কতদূর লিখিয়া চিরদিনের জন্য কলম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মধ্যে কেহ যে এই আখ্যায়িকাটুকু আমার লোকান্তরের পর সম্পূর্ণ করিবেন, সেরূপ আশা নাই।

———

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বর্গীয় মহাত্মা বাণীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র পরলোকগত স্বধর্ম্মনিরত, প্রিয়দর্শন, মিষ্টভাষী, বিদ্বান ও সর্ব্ব-লোকপ্রিয় যাদবচন্দ্রের ঔরসে এবং দিগনগর নিবাসী স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা পার্ব্বতী সুন্দরী দেবীর গর্ভে আমার জন্ম হয়। আমার জন্মের পূর্ব্বে পিতামাতার দুইটী কন্যা-সন্তান জন্মিয়াছিল। প্রথমটী শৈশব সীমা উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ইহধাম পরিত্যাগ করেন। দ্বিতীয়টীর নাম ছিল সৌদামিনী। মালিপোতা নিবাসী ফুলের মুখুটী ত্রৈলক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ক্রমেও সন্তান হইল না, এইজন্য ত্রৈলক্যবাবুর মাতা এবং আত্মীয়বর্গ ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করায়, অগত্যা তিনি তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করেন। এই কথা শুনিয়া অভিমানিনী পতিগতপ্রাণা, সাধ্বী সৌদামিনী জীবন ধারণ করা কেবল দুঃসহ যাতনার কারণ হইবে, এই আশঙ্কায় ১২৭৮ সালের ১১ই মাঘ তারিখে স্বামীর অট্টালিকা সংলগ্ন বাগানবাড়ির ভিতর একটী পুষ্করিণীতে ডুবিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া স্বামীর পাঠের জন্য মাথার বালিসের নীচে রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আমি মালিপোতায় গিয়া-ছিলাম। সেই সময় ত্রৈলক্যবাবু সেই পত্রখানি আমাকে

দেখাইয়াছিলেন। সেরূপ করুণ, হৃদয়-বিদারক পত্র পড়িয়া পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়। তাঁহার শিরোভূষণগুলি আমার বিবাহ হইলে আমার পত্নীকে দিবার জন্য পত্রের শেষভাগে স্বামীকে অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন। স্বামীও তাঁহার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে আমার বিবাহ সময় তিনি স্বয়ং দিগনগরে আসিয়া স্বহস্তে সেই অলঙ্কারগুলি আমার পত্নীকে পরাইয়া দিয়াছিলেন।

আমার জন্মের পর পিতার আর দুইটি পুত্র এবং তিনটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কন্যা তিনটীই শৈশবে গতাসু হয়। আমার মধ্যম সহোদর দেবেন্দ্রনাথ আমা অপেক্ষা প্রায় তিন বৎসরের ছোট, এবং কনিষ্ঠ সহোদর রাজেন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের জন্মের প্রায় দুই বৎসর পরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল।

পিতার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র পার্ব্বতী চরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সে সময় গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনাঢ্য ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রঘুরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের “মিছিল খাঁ” (বর্ত্তমান Clerk of the Crown) ছিলেন। এই পদে সে সময় প্রভূত অর্থোপার্জ্জনের নানারূপ পন্থা ছিল। পিতার সহোদর স্বর্গীয় মহেন্দ্র নারায়ণ সেই সময় মুন্সেফী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পিতা সে সময় পুরাতন পুলিসের সদর দারোগার পদে কৃষ্ণনগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নূতন পুলিস সৃষ্টি হইলে পোষাক পরিধান করিতে হইবে, ড্রিল, প্যারেড (drill

parade) এবং নানাবিধ নূতন নূতন কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা করিতে হইবে, এই আশঙ্কায় পুলিসের চাকরী পরিত্যাগ করেন। পিতার সৎস্বভাব, কার্য্যপটুতা এবং বিশেষরূপ ধর্ম্মজ্ঞান থাকায় উপরিস্থ কর্ম্মচারিবর্গ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন। ঠিক সেই সময়ে কলেক্টরী ও ফৌজদারী আফিসের নাজিরের পদ শূন্য হওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর পিতাকে সেই পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই নাজিরের পদে থাকিতে থাকিতেই কয়েক বৎসর পরেই তিনি পেন্সন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই পিতৃব্য মহেন্দ্র নারায়ণ সংসারের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পিতামহ বাণীকান্ত জ্যেষ্ঠ সহোদর কালীশঙ্করের সহিত মনোমালিন্য সূত্রে পৈতৃক ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিয়া আমাদের বংশের দৌহিত্র দিগনগরবাসী মনোহর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া পিতামহী অন্নপূর্ণা দেবীকে লইয়া সেইখানেই বাস করিতে লাগিলেন। পিতা সে সময় বাখরগঞ্জ জেলায় কোন স্থানে দরোগাগিরি কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ কুটীরেই পিতৃব্য মহেন্দ্র নারায়ণের জন্ম হয়। সাংসারিক গোলযোগের কথা এবং শেষ বয়সে পিতামাতার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ শুনিয়া পিতা কয়েক মাসের বিদায় লইয়া দেশে আসিয়াছিলেন। মাতৃকোলে শিশু সহোদরটীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "মা এটী ভগবানের দান আমার একটী দোসর হইল।" তাহার পর পৈতৃক

ভদ্রাসনের পূর্ব্ব ভাগ আমাদের বর্ত্তমান বসতবাটীর নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সেইটী সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। পিতামহ বাণীকান্ত কোন বিষয়-কার্য্য করিতেন না; অর্থোপার্জ্জনের কোন চেষ্টাই ছিলনা। অথচ পুত্রের অর্থে যথেচ্ছা দান-ধ্যান করিতেন, গ্রামবাসী দরিদ্র পরিবারদিগকে নিয়মিতরূপ চাউল, দাইল এবং পরিধেয় বস্ত্রও দান করিতেন। এইরূপ অযথা ব্যয় হেতু সময় সময় ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন, ঋণ পরিশোধের জন্য বারংবার পুত্রকে লিখিতেন; পুত্রও অম্লান বদনে পিতার ঋণ পরিশোধ করিতেন। একবার বিরক্ত হইয়া পিতৃদেব পিতামহকে লিখিয়াছিলেন, "বাবা আপনার এখনও কত টাকা ঋণ আছে তাহা ঠিক করিয়া লিখিবেন"। পিতামহ এই পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছেন; "তামা তুলসী গঙ্গাজল আমার নিকট নাইরে ব্যাটা: ইচ্ছা হয় দেনা পরিশোধ করিও, ইচ্ছা না হয় করিও না।" এই পত্র পাইয়া পিতা একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পিতার মনে ক্লেশ দিয়া মহাপাপ করিয়াছেন, এই আশঙ্কায় এক দিবারাত্রি উপবাস করিয়া পরদিন বিহিত বিধানে প্রায়শ্চিত্ত ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন। নিজে ঋণগ্রস্ত হইয়াও পিতার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারটী চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে অতি শীঘ্রই প্রচার হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই সকলেই জানিয়াছিলেন স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র একজন প্রকৃত ধর্ম্মভীরু, পিতৃমাতৃভক্ত আদর্শ চরিত্রের লোক। আমার বাল্যকালে এবং যৌবনে গ্রামের প্রাচীনদিগের মুখে

এবং স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর মুখে এই ঘটনার বিবরণ অনেক বার শুনিয়াছি। "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ", এই মহাবাক্যের মর্ম্ম সেই দেবপ্রকৃতি মহাপুরুষ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আমাদের অঞ্চলে তাঁহার নাম এখনও প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

অনেক দিন পরে সংসারে একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল, এই আনন্দে আমার বাল্য জীবন মহাআদরেই অতিবাহিত হইয়াছিল। পিতা কৃষ্ণনগরে দারোগা, জ্যেষ্ঠতাত পার্ব্বতীচরণ প্রভূত ধনশালী, ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি, পিতৃব্য মহেন্দ্রনারায়ণ মুন্সেফ; সুতরাং আমার আদরের সীমা ছিল না। বালসুলভ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া যখন যাহা পাইবার জন্য আব্দার ধরিতাম, একজন না একজন তাহা অবিলম্বেই পূর্ণ করিতেন। সেই সময় বিজয়া দশমীর দিন, বৎসরের প্রথম দিন (১লা বৈশাখ) এবং মহরমের সময় হিন্দু মুসলমান বন্ধুভাবে সম্মিলিত হইয়া ঢাল, তলোয়ার, লাঠি, সড়কি প্রভৃতি খেলা এবং নানাবিধ কুস্তি ব্যায়াম প্রভৃতি দেখাইয়া সকলকে আনন্দ দিত এবং সুদক্ষ খেলোয়াড়গণ পুরস্কার পাইত। আমারও সেইরূপ খেলার সাধ দেখিয়া জ্যেষ্ঠতাত ছোট একখানি ঢাল, একখানি ছোট তলোয়ার এবং নানাপ্রকারের ছোট ছোট লাঠি আমাকে দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত ময়না, চন্দনা, নানা জাতীয় পায়রা টিয়া, প্রভৃতি পাখী এবং বেজী প্রভৃতি অনেকগুলি জীবজন্তুও আমার তৃপ্তি সাধন জন্য

সংগৃহীত হইয়াছিল। আমার পৌত্রেরা এখন যেমন এয়ার-গান (air-gun), ফুটবল, ছোট ছোট-মোটর গাড়ী রেল-গাড়ী "একোরডিনা" (accordina) প্রভৃতি নানাবিধ খেলনা পাইতেছে, আমাদের বাল্যকালে এসকলের নামও শুনি নাই।

শয্যা ত্যাগ করিয়াই এক বাটী গরম দুগ্ধ, কিছু পরে বাগানের উৎপন্ন ফলমূল, মুড়ি ও ছানার সন্দেশ প্রভৃতির দ্বারা প্রাতরাশ নির্ব্বাহ করিতাম; এখন যে সন্দেশটী ছয় পয়সার কম মূল্যে পাওয়া যায় না, সে সময় এক পয়সায় তাহা পাওয়া যাইত। বাড়ীতে অনেকগুলি দুগ্ধবতী গাভী বহুদিন পর্য্যন্ত প্রতিপালিত হইত। এমন কি আমার বিবাহের পর বালিকা পত্নী প্রথমে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া যে দৃশ্য দেখিয়া গিয়াছিলেন, পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া শ্বশুরবাড়ীর নানারূপ গল্পের মধ্যে নিম্নলিখিত গল্পটীও করিয়াছিলেন। "মা আমায় কি গোয়ালাবাড়ী বিয়ে দিয়েছিস্; ওমা সকাল বেলায় একপাল গরু, একপাল বাছুর বেরিয়ে এল, তিন, চারটা লোক গাই দুইতে লাগিল; কেঁড়ে, কেঁড়ে দুধ নিয়ে এল, আবার এক মাগী কোমরে কাপড় জড়িয়ে ঘোল মইছে; তা থেকে মাখন তুলে ঘি তৈরী করছে; আমি ত দেখেই অবাক!" হায়, সেদিন কোথায় গেল! কি পাপে, কাহার অভিশাপে সেই সুখের দিন একেবারে অদৃশ্য হইল! সেই বালিকা পত্নী উপযুক্ত সময়ে সকল স্থানেই গাভী পুষিতেন, গো বৎসের সেবা তাঁহার অন্যান্য কাজের অন্যতম ছিল। তিনি বর্ত্তমানে সময় সময় গৃহপালিত গাভীগুলিই প্রতিদিন আট

দশ সের করিয়া দুগ্ধ দিত। সে সময় গোয়ালার দুগ্ধ কদাচিৎ প্রয়োজন হইত। এখন গোয়ালার দুগ্ধের উপরই নির্ভর। আজ আমার গৃহ বালক-বালিকাদিগের কলরবে মুখরিত। কিন্তু দুগ্ধের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে এক এক চামচ দুগ্ধ মিশ্রিত চা পান করাইয়াই রাখিতে হইতেছে। টাকায় /৩॥০ বা /৪ সের দুগ্ধ কিনিয়া পান করান একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কথায় বলে, "সোণার চাঁদেরা দেশে এল, দেশেও আকাল হল।" দুঃখ করিয়া কোন ফল নাই, বিধাতার ইচ্ছাতেই এই সকল ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এখন আমাদের শিক্ষা সংস্কার এবং তদানুসঙ্গিক অন্যান্য কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখন গ্রামে স্কুল ছিল না। প্রথমে উমাচরণ সরকার, পরে লালমোহন সরকার (উভয়েই দিগনগর সংলগ্ন হাতিশালা গ্রামবাসী) আমাদের গুরুমহাশয় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমাদের বহির্ব্বাটীর একটী ঘরে তাঁহারা থাকিতেন এবং এক পরিবারস্থ লোকের ন্যায় আমাদের বাটীতেই তাঁহাদের আহারাদি নির্ব্বাহ হইত। বাল্যকালে গ্রামে বালকদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের সঙ্গেই অধিক সময় খেলা করিয়া বেড়াইতাম, শিক্ষকদের উপদেশ বা শাসন একেবারেই গ্রাহ্য করিতাম না। এই সকল বিষয় পিতার কর্ণগোচর হইলে তিনি আমাকে কৃষ্ণনগরে লইয়া যান এবং প্রথমে কলেজিয়েট্ স্কুলে কিছুদিন অধ্যয়ন করিবার পর পিতার পরম বন্ধু মিশনারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় রাসবিহারী বসু (ইনি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন)

মহাশয়ের অনুরোধে আমাকে মিশনারি স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিয়াছিলেন। মধ্যম সহোদর দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই অতিশয় নম্রপ্রকৃতি, ধীর ও মেধাবী ছিল। বাটীতে থাকিয়া দেবেন্দ্র বিশেষ মনোযোগ সহকারে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিল। রাজেন্দ্র তখনও নিতান্ত শিশু; তাহার বিদ্যারম্ভের সময় তখন পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই। প্রায় এক বৎসর কৃষ্ণনগরে পিতার নিকট থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিবার পর, পিতার চক্ষের দৃষ্টি ক্ষীণ হওয়ায় তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণনগর হইতে আমাকে সঙ্গে লইয়া বাটী আসিলেন। ঠিক সেই সময় জ্যেষ্ঠতাত পার্ব্বতী চরণ চক্রবর্ত্তীর প্রযত্নে গ্রামে একটী ইংরাজী-বাংলা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। আমি সেই বিদ্যালয়ে কিছুদিন লেখাপড়া শিক্ষা করিলাম। কিন্তু এই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতেই দেশে ম্যালেরিয়া জ্বর উপস্থিত হইয়া নব-প্রতিষ্ঠিত স্কুলের অনেকগুলি ছাত্রকে অকালে কালভবনে প্রেরণ করিল। যাহারা কোনক্রমে মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি পাইল, তাহারাও এত দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়িল যে, অগত্যা লেখাপড়া শিক্ষা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইল। সুতরাং স্কুলটীর পরমায়ুও শেষ হইল। আমরাও ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া এরূপ দুর্ব্বল ও সামর্থ্যহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম তখন যে আমাদের জীবন রক্ষার জন্যই সকলে ব্যস্ত ছিলেন; লেখাপড়া শিক্ষার দিকে সে সময় আর কাহারও দৃষ্টি ছিল না।

দেশের অবস্থা এইরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে, তাহার

প্রতিকারের কোন উপায় গ্রামবাসী বা গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে উদ্ভাবন করা হইল না। চিরপ্রচলিত দোল, দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা কার্ত্তিকপূজা, ভগবতী যাত্রার আমোদ প্রমোদ, বারোয়ারী মহিষ-মর্দ্দিনী পূজা এবং সেই উপলক্ষে যাত্রা, পাঁচালী, কবির লড়াই, ঢপের গান প্রভৃতি সমভাবেই চলিতে লাগিল। এই সকল উৎসবের বিবরণ এখন আর মনে আসে না। তবে দুর্গোৎসব উপলক্ষে জ্যেষ্ঠতাত পার্ব্বতীচরণের বাটীতে যে সকল আমোদ প্রমোদ হইত তাহার কিছু কিছু লিখিতেছি।

প্রকাণ্ড পূজার দালান, সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গন, সমস্ত প্রাঙ্গনটী নীলবর্ণের চাঁদোয়ায় ঢাকা; চাঁদোয়া বা সামিয়ানার ভারবাহী অগণ্য সুদীর্ঘ বংশখণ্ড হইতে ঝাড়লণ্ঠনের সঙ্গে কাঁদি কাঁদি অর্দ্ধ পক্ক কাঁটালি কলা, বাতাবি লেবু, শসা, নারিকেল, চারি পাঁচ সের ওজনের পক্কান্ন (এই জিনিষটা যে কি তাহা আমাদের দেশের লোকেই বুঝিবেন), বড় বড় গ্রামোফোনের রেকর্ডের আয়তনযুক্ত তেলে ভাজা জিলিপি প্রভৃতি ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর দ্বাদশীর দিন এই সকল ফলমূল ও মিষ্টান্ন নামাইয়া পূজার দালানে রক্ষিত হইত। পূজা উপলক্ষে যে সকল লোক বিশেষ পরিশ্রম করিত, বাটীর দাসদাসী এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণের বিধবাবর্গকে তাহা বিতরণ করা হইত। পূজার তিন দিন গ্রামবাসী এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে পঞ্চাশ ব্যঞ্জনযুক্ত মহাপ্রসাদ ভোজন করান হইত। কায়স্থ এবং অন্যান্য শূদ্রদিগকেও পূজার মধ্যে এক একদিন ভোজন করান হইত। ইহা

ব্যতীত দীন দুঃখী, কাঙ্গালী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে চিড়া, মুড়ি, মুড়কি, পক্কান্ন বিতরণ করা হইত। সেই কয়েকটা দিন যে কি উৎসাহে, কি আনন্দে কাটিত তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। মহামায়ার প্রসাদ যে কি অমৃততুল্য বোধ হইত, তাহা আর কি বলিব। সেই এক্হাতা ঝোলের সঙ্গে দুই এক টুকরা প্রসাদী মাংস, দুই চারিটী ছোলা মটর এবং দুই চারি টুকরা হাড়ের কুচি যে কি উপাদেয় বোধ হইত, তাহা প্রকাশ করা যায় না। তার বহু বৎসর পরে যৌবনে, এমন কি পরিণত বয়সেও নানাস্থানে নানাপ্রকারের সুদক্ষ পাচকের দ্বারা প্রস্তুত পলাণ্ডু, রসুন সংযুক্ত চপ, কারি, কাটলেট প্রভৃতি খাদ্যও সেই প্রসাদী মাংসের ন্যায় রসনার তৃপ্তিদায়ক হয় নাই।

তারপর যাত্রা, কবি, পাঁচালী প্রভৃতি সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু বলিতে হইবে। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের বাটীতে প্রতি বৎসরই একদল যাত্রা বা ঢপের গান আসিত। কিন্তু বারোয়ারী পূজা উপলক্ষে সপ্তাহকাল দুই তিন দল যাত্রা, ঢপের গান, দুই দল কবি প্রায়ই আনা হইত। যতদূর মনে পড়ে, সে সময় গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণ যাত্রা, মহেশ চক্রবর্ত্তীর দক্ষযজ্ঞ, গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর, মদন মাষ্টারের ধ্রুবচরিত্র, লোকনাথ ধোপার নল দময়ন্তী, ভগবতী পালের রাবণ বধ, আনন্দ পণ্ডিতের শ্রীমন্তের কমলে কামিনী দর্শন ও সিংহল কারাগার হইতে পিতৃ-উদ্ধার প্রভৃতি পৌরাণিক বিষয়ই লোকের চিত্তাকর্ষণ করিত এবং এই সকল যাত্রার দলই সে সময়ে বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং নামজাদা ছিল। বর্ত্তমান

সময়ের যাত্রার পোষাক পরিচ্ছদ, বক্তৃতা, ঐক্যতান বাদন প্রভৃতির অনেক উন্নতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু গানের রাগ রাগিণীর আর সে মৌলিকত্ব নাই। এখনকার রং, ঢং, গান প্রায় সমস্তই থিয়েটারের অনুকরণ হইতেছে। আমি অমিশ্র রাগ রাগিণীর পক্ষপাতী বলিয়াই হউক অথবা বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত রাগ রাগিণী প্রভৃতির মধ্যে কি যেন একটা দোষ আছে সেই কারণেই হউক, আমার সেকালের যাত্রা, ঢপ প্রভৃতিই বেশ ভাল বোধ হইত। মধুসূদন কিন্নরের (মধুকানের) এবং তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রী জগৎ মোহিনীর ঢপ এবং সেই সময়ের নামজাদা সংকীর্ত্তন বাল্যকালে, কৈশোরে এবং যৌবন প্রারম্ভে অনেকবার শুনিয়াছি। সেইরূপ অমিশ্র রাগ রাগিণী ও ভাবপূর্ণ কীর্ত্তন বর্ত্তমান সময়ে আর শুনিতে পাই না। মনে হয় এখন লোকের রুচিও যেমন বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কীর্ত্তনের ভাব, ভাষা, সুর প্রভৃতি সমস্তই সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত হইয়াছে। তারপর কবির লড়াই, এটা বড়ই আমোদের জিনিষ ছিল। এণ্টনী সাহেব, হরু ঠাকুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদিগকে আমি দেখি নাই; তবে তাঁহাদের সাগ্‌রেৎ বা শিষ্যদিগের লড়াই আমি দুই তিনবার শুনিয়াছি। এরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং সরল ভাবে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহতকরা আজকাল আর দেখিতে পাই না। অবশ্য বর্ত্তমান সময়ের মার্জ্জিত রুচি অনুসারে তাঁহাদের প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে অশ্লীলতা দোষ লক্ষিত হইত। কিন্তু দর্শক ও শ্রোতৃবর্গের শ্লীলতা বা অশ্লীলতার দিকে একেবারেই লক্ষ্য থাকিত না। প্রশ্নের কি

উত্তর হয়, আক্রমণ কিরূপভাবে প্রতিহত হয়, তাহা শুনিবার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত থাকিত এবং উপযুক্তরূপ উত্তর শুনিতে পাইলেই আমোদপ্রিয় শ্রোতৃবর্গ সাময়িক উত্তেজনাবশে উত্তর-দাতাকে কোলে লইয়া নাচিতেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে টাকা, বস্ত্র এমন কি মূল্যবান শাল, দোশালা, বেনারসী চাদর প্রভৃতিও পুরস্কার দিতেন।

নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিতে হইলে বর্ত্তমান সময়ের প্রথম শ্রেণীর অনেক মাসিক পত্রিকায় "সদ্যস্নাতা আর্দ্রবসনা" নানাবর্ণে চিত্রিত সুন্দরী যুবতীর যে সকল ছবি প্রকাশ হইতেছে এগুলিও সুরুচির পরিচায়ক নয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে অপরিণতবয়স্ক যুবকদিগের এমন কি অসংযমী প্রৌঢ়েরও মনে একটা লালসা জন্মাইয়া দেয়। আমরা অশিক্ষিত পল্লীবাসী সেকালের লোক ; এই ছবিগুলি দেখিয়া এবং এই সকল মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিলাত ফেরত বাবুদের সংসারের ঘটনা লইয়া যেসকল নভেল বাহির হইতেছে তাহা পড়িয়া, আমাদের কেবল মনে হয়, সমাজ সংস্কারকবর্গ নরনারীর নৈতিক উন্নতির পথ না দেখাইয়া গরীব, নিরীহ, শান্তপ্রকৃতি এবং নীতি ও স্বধর্ম্মানুরাগী বঙ্গবাসীকে বিপথেই লইয়া যাইতেছেন। সেকাল আর একালের লোকের কার্য্যপ্রণালী, রুচি, প্রকৃতি প্রভৃতির কথাপ্রসঙ্গে বোধ হয় অনেকগুলা অপ্রীতিকর ও অনাবশ্যক কথাও লিখিয়া ফেলিয়াছি। অধিক অগ্রসর না হইয়া এখন আবার আমার নিজের কথাগুলি বলিব।

এই সময় আমার বয়ক্রম ১০ বা ১১ বৎসর হইয়াছিল। পিতৃব্য মহেন্দ্রনারায়ণ তখন বাঁকুড়ায় একটীং সদর আমীন পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সদর আমিনী পদ মুন্সেফ ও সদরআলার মধ্যবর্ত্তী। অনেকদিন হইল এই পদ উঠাইয়া দিয়া কেবল মুন্সেফ এবং তাহার উপর সাবঅর্ডিনেট জজের সৃষ্টি হইয়াছে। পিতৃব্যদেব সেই সময় ছুটি লইয়া দেশে আসিয়াছিলেন। দেশের অবস্থা আমাদের শারীরিক অবস্থা দেখিয়া তিনি আমাদের তিন ভাইকেই সঙ্গে লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্র ও রাজেন্দ্র সে সময় নিতান্ত শিশু, বিদেশে থাকিতে পারিবে না বিবেচনায় শেষে কেবল আমাকে সঙ্গে লইয়া পিতৃব্য তাঁহার কর্ম্মস্থান বাঁকুড়ায় গিয়াছিলেন। বাংলা দেশের মধ্যে বাঁকুড়া সে সময় অতি স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। সেই স্থানের জলবায়ুর গুণে দুই তিন মাসের মধ্যেই আমার সমস্ত রোগ দূর হইয়াছিল। শরীর একটু দুর্ব্বল ও কৃশ হইলেও বেশ লাবণ্য হইয়াছিল। এইরূপে বাঁকুড়ায় কয়েকমাস থাকিবার পর খুড়ামহাশয় পুনরায় তাঁহার পূর্ব্বের কর্ম্মস্থল বাঁকুড়ার পাঁচক্রোশ পূর্ব্বদিকে ওঁদাগ্রামে মুন্সেফি পদে আসিয়াছিলেন। সেখানে কোন স্কুল বা পাঠশালা ছিল না। অবসর সময় আমাকে এবং স্থানীয়কয়েকটী বালককে তিনি নিজেই একটু একটু ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিতেন। তাঁহার প্রথম পুত্র ভূপতি এবং দ্বিতীয় পুত্র শ্রীপতি এই ওঁদায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যে সময় আমি ওঁদায় গিয়াছিলাম তখনও শ্রীপতির জন্ম হয় নাই। কয়েক-

মাস ওঁদায় থাকিবার পর আমাদের গ্রামবাসী তারণ ঘোষ হঠাৎ একদিন পিতার মৃত্যু-সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইল। আমার দ্বাদশবর্ষ বয়ক্রম; পিতৃব্যের স্নেহযত্নে বেশ প্রফুল্ল মনেই দিন কাটিতেছিল। দেব-প্রকৃতি পিতার মৃত্যু-সংবাদে বিশেষ দুঃখ হয় নাই, কিন্তু পিতৃব্যদেব এই সংবাদে বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ওঁদা গ্রামের যাবতীয় ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। ওঁদার পত্তনী তালুকদার এবং উকীল স্বর্গীয় রুক্মিণীকান্ত রায় মহাশয়কে এবং সমবেত ভদ্রলোকদিগকে পিতৃব্যদেব কহিলেন, "সকলে পিতৃ-অন্নে প্রতিপালিত হয়, কিন্তু আমি ভ্রাতৃ-অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম; আজ আমি প্রকৃতই পিতৃহীন হইলাম।"

যাহা হউক, শোকাবেগ কতকটা প্রশমিত হইলে ওঁদা নিবাসী মহেশচন্দ্র চৌধুরী, রাজকৃষ্ট ঘোষ এবং পূর্ব্বোল্লিখিত তারণ ঘোষকে সঙ্গে দিয়া সত্বর আমাকে দিগনগরে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রাদ্ধাদি নির্ব্বাহের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থও তাঁহাদের সঙ্গে দিয়াছিলেন। যথাকালে দিগনগরে উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণ ভোজন, জ্ঞাতি ভোজন, অপরাপর সাধারণ শূদ্র ভোজন, কাঙ্গালী বিদায়, সংকীর্ত্তন প্রভৃতি বেশ একটু সমারোহের সহিত নির্ব্বাহ হইল। বর্ত্তমান সময়ে দেড় হাজার টাকা ব্যয়েও সেরূপ সমারোহ ও সুশৃঙ্খলার সহিত সমস্ত কাজ নির্ব্বাহ হয় কি না সন্দেহ। শ্রাদ্ধান্তে পিতৃব্যের আদেশ মত রাজকৃষ্ট ও মহেশ, মাতাঠাকুরাণী এবং আমার কনিষ্ঠ দুই সহোদরকেও আমার সঙ্গে ওঁদায় লইয়া

আসিয়াছিল। বাংলা ১২৭০ সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ, রাসযাত্রার পর ষষ্ঠী তিথিতে পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন। সেই সময় হইতে কিছুদিন আমাদের জীবন যে কিরূপ দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় অতিবাহিত হইয়াছিল,তাহা এখনও মনে হইলে হৃৎকম্প হয়। পিতৃব্যদেব উদার-প্রকৃতি, আমোদপ্রিয় ও কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক ছিলেন। রাজকার্য্যে ও লোকজনের সহিত সর্ব্বদা নানারূপ আলোচনায় লিপ্ত থাকায়, সাংসারিক আভ্যন্তরীণ অবস্থা বড় একটা জানিতে পারিতেন না। পিতৃব্যপত্নী বলিতে গেলে তখনও যৌবন সীমা অতিক্রম করেন নাই। ইনি পিতৃব্যদেবের চতুর্থ পক্ষের পত্নী, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ক্রমের সময় ইনি আমাদের সংসারে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মাতৃষ্বসা ও মাতাঠাকুরাণীও আসিয়া আমাদের সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই মাতাঠাকুরাণীর হস্তে আমার বিধবা মাতা, আমি ও শিশু সহোদর দুইটী কয়েক বৎসর যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলাম তাহা সমস্ত লিখিতে হইলে কেবল ঐ প্রসঙ্গের ঘটনাগুলি লইয়াই একখানি ছোটখাট পুস্তক লেখা যাইতে পারে। সুতরাং সেসকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার সময় নাই, প্রবৃত্তিও নাই।

কয়েক মাস এইরূপে ওঁদায় অতিবাহিত হইলে, সেই বৎসর শীতের শেষে "অর্দ্ধোদয়" নামক মহাযোগ উপস্থিত হওয়ায়, খুড়া মহাশয় সপরিবারে এবং আমার মাতাঠাকুরাণী এবং আমার কনিষ্ঠ সহোদর রাজেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নান এবং সাংসারিক ও বৈষয়িক কতকগুলি বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য এক

মাসের বিদায় লইয়া দেশে গিয়াছিলেন। আমি ও দেবেন্দ্র কয়েকটী অনুচরের সঙ্গে সে সময় ওঁদাতেই ছিলাম। মাতা-ঠাকুরাণী এবং রাজেন্দ্রকে দিগনগরে রাখিয়া পিতৃব্য যথাকালে সপরিবারে ওঁদায় প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার কয়েক মাস পরেই তিনি চট্টগ্রামে বদলী হইয়াছিলেন। প্রথমে পাচক ব্রাহ্মণ এবং দুই তিনজন অনুচর সঙ্গে নিজে সেখানে উপস্থিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবার কিছুদিন পরেই খুড়িমাতা-ঠাকুরাণী, দুই পুত্র (ভূপতি ও শ্রীপতি) এবং তাঁহার শাশুড়ীঠাকুরাণী ও তৎ-ভগ্নীকে চট্টগ্রামে লইয়া গিয়াছিলেন। দেবেন্দ্র ও রাজেন্দ্রকে রাণাঘাটের স্কুলে পাঠাভ্যাসের জন্য পাঠান হইল। তাহারা সেখানে আমার মাতৃস্বসার বাটীতে থাকিয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিতে লাগিল। খুড়ামহাশয় তাহাদের আহারাদি এবং শিক্ষার জন্য প্রতিমাসে মাসীমাতার নিকট টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। তাঁহার পরমবন্ধু স্বর্গীয় ভূপতি রায় সেই সময় বর্দ্ধমানে সাবঅডিনেট জজের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইনিই নিজ নামে আমাদের ভূপতির নাম রাখিয়াছিলেন। আমি এই ভূপতি বাবুর নিকট প্রেরিত হইলাম।

সেখানে ব্রাহ্মসমাজ স্কুলে আমাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। অন্যান্য সহপাঠীদের মধ্যে অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক বালকের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। বহু-বৎসর পরে আমরা দুইজনেই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পর, এক সময় পুনরায় বর্দ্ধমানে এবং মেদিনীপুরে মিলিত হইয়া-

ছিলাম। আমি অবসর গ্রহণ করিবার পরও অনুকূলের সঙ্গে কয়েকবার মেদিনীপুরে এবং চক্রধরপুরে কয়েকদিন একত্রে কাটাইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। সুখে সুখী, দুঃখে, দুঃখী, সম্পদে বিপদে তাহার ন্যায় অকৃত্রিম বন্ধু বোধ হয় এখন অতি দুর্লভ। বর্দ্ধমানে কয়েক মাস অধ্যয়ন করিবার পর আমার চঞ্চল চিত্ত দিগনগরে যাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। খুড়ামহাশয়কে নানারূপ অনুনয় বিনয় করিয়া কয়েকখানি পত্র লেখার পর দিগ-নগরে যাইবার অনুমতি পাইলাম। আমাদের চিরসুহৃদ দিগ-নগরের বিষয় সম্পত্তির তৎকালিক তত্ত্বাবধায়ক স্বর্গীয় নন্দকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় বর্দ্ধমানে আসিয়া আমাকে দিগনগরে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রায় দুই মাস কাল নানাপ্রকার গ্রাম্য আমোদে কাল কাটাইলাম। তারপর আমিও রাণাঘাটে প্রেরিত হইলাম। মাসীমা নিঃসন্তান ছিলেন; আমাদিগকে অতীব যত্নে লালন পালন করিতেন। সেখানে যাইয়া দেখিলাম দেবেন্দ্র এই কয়েক মাসের মধ্যেই লেখাপড়ায় বেশ অগ্রসর হইয়াছে। হেড মাষ্টার মহাশয়কে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাহার সঙ্গে এক শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছিলাম। চারি পাঁচ মাস রাণাঘাটে বিদ্যা শিক্ষা করিবার পর শুনিলাম যে দিগনগরে একটী ইংরাজী-বাংলা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। খুড়ামহাশয়ের আদেশ ক্রমে আমরা রাণাঘাট পরিত্যাগ করিয়া সেই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলাম।

এই উপলক্ষে দিগনগরের তদানীন্তন অবস্থার কথা কিছু এই

স্থানে উল্লেখ করিব। আমাদের বংশের দৌহিত্র যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নানাকারণে ঋণজালে জড়িত হইয়াছিলেন। ঋণ পরিশোধের উপায়ান্তর না দেখিয়া কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য জমিদার মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের প্রথমা কন্যা সৌদামিনী দেবীর সহিত জ্যেষ্ঠপুত্র সারদা প্রসাদের বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহ ব্যাপার যাদবচন্দ্রকে ঋণজাল হইতে মুক্ত করিলেও তাঁহাকে সামাজিক শাসনের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ "পিরিলি" অপবাদগ্রস্ত। সুতরাং গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ স্বজনবর্গ যাদবচন্দ্রের সহিত আহার বন্ধ করিয়াছিলেন। এমন কি যাঁহারা যাদবচন্দ্রের সহিত আচার-ব্যবহার করিয়াছিলেন তাঁহারা পর্য্যন্ত সমাজের শাসনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সারদাপ্রসাদ বাল্যকাল হইতেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও নানাবিধ সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ীর সংশ্রবে আসিয়া তথাকার উচ্চ আদর্শে, শিক্ষায় এবং নিজের যত্নে বেশ সুশিক্ষিত, সুমার্জ্জিত এবং একজন উচ্চদরের লোক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে দিগনগরে সর্ব্বদাই আসিতেন। দেশে তখন একরূপ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সারদাপ্রসাদ দুর্ভিক্ষ পীড়িত দরিদ্র-দিগের জন্য একটী অন্নছত্র খুলিলেন; একটী ইংরাজী-বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়াই সেখানে পড়িবার জন্য আমরা রাণাঘাট হইতে দিগনগরে আসিয়াছিলাম। সারদাবাবু যুবকদিগকে লইয়া সর্ব্বদাই নানাবিধ আমোদ প্রমোদ করিতেন, ভোজ দিতেন। এই ভাবে কয়েক

মাসের মধ্যেই অনেককেই পিতার দলভুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবার পরেই, তাঁহার দলের "বসন্তের কোকিল"গুলি যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় সমাজভুক্ত হইলেন। সে সময় রক্ষণশীল দলের কি কঠোর শাসন ও শক্তি ছিল!

দিগনগরে সেই নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যয়নের পর আমি কোন একটা ভাল স্কুলে পড়িবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় আমার ভগিনীপতি পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রৈলক্য নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে তাঁহার কর্ম্মস্থল ভবানীপুরে লইয়া গিয়াছিলেন। এবং তথাকার "হিন্দু একাডেমী" স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি অল্পদিন পরেই আমাশয় পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পুনরায় দিগনগরে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এই সময় দিগনগরের সেই স্কুলটীর একজন শিক্ষক পরলোকগমন করায় এবং নানা কারণে ছাত্র সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় সারদাপ্রসাদ স্কুলের সাহায্য বন্ধ. করিলেন। স্কুলটীও উঠিয়া গেল। সেই স্কুলের ইংরাজী শিক্ষক মহাশয়কে মাসিক ৬৲ টাকা বেতন এবং আমাদের বাটীতে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া আমাদের গৃহ-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ছাত্র-গৃহের অন্নভোজী গৃহ-শিক্ষকের মানসম্ভ্রম এবং অবস্থার বিষয় সকলেরই সুবিদিত। তাহাতে আবার আমাদের গৃহ-শিক্ষকটী এক আমোদপ্রিয় যুবক ছিলেন। পদ্য রচনা, সঙ্গীত রচনা, পাশা খেলা প্রভৃতি বিষয়েই তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। ধর্ম্মের ডাকে একবার

প্রাতে এবং আর একবার সন্ধ্যায় আমাদিগকে লইয়া বসিতেন। অবশিষ্ট সময় আমরা আপন রুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী খেলা ধুলায় কাটাইতাম। সে সময় মাছ ধরার বাতিক আবালবৃদ্ধ সকলেরই এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে ধীর ও শান্ত প্রকৃতি দেবেন্দ্র এবং স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র অঘোরনাথ পর্য্যন্তও এই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। গ্রামের দীঘিতে, গোপেয়ার বিলে, হাতিশালা, বাথানগাছি, ইটলা প্রভৃতি গ্রাম-সমূহে, যেখানে যেখানে মৎস্যপূর্ণ পুষ্করিণী, খাল, বিল ছিল সর্ব্বত্রই অবাধে দলবদ্ধ হইয়া প্রতিদিন রাশীকৃত মৎস্য ধরিয়া আনিতাম। হায় রে সেদিন এখন কোথায়! এখন কালেভদ্রে যদি কখনও দেশে যাওয়া হয়, সে সময় চারিদিকে লোক পাঠাইয়াও আর ভাল রকম মাছ সংগ্রহ করিতে পারি না।

এইরূপে আমার জীবনের চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিক্রম হইল। সেই সময় পিতৃব্যদেব চট্টগ্রাম হইতে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গড়বেতায় বদলি হইয়া আসিলেন। পূজার পূর্ব্বে দেশে আসিয়া মহাসমারোহে দুর্গোৎসব করিলেন এবং বিদায় শেষে আমাদের তিন ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। গড়বেতায় ইংরাজী বিদ্যালয় না থাকায়, ভৈরব চন্দ্র পাত্র নামক একজন উকীল অবসর সময়ে আমাদিগকে ইংরাজী পড়াইতেন।

গড়বেতা নিবাসী শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তী তখন সর্ব্বদাই আমাদের সঙ্গে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। তখন পর্য্যন্তও তিনি ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন নাই। আমি নিজেও মহাপণ্ডিত, কিন্তু

ইংরাজী শিক্ষার জন্য সূর্য্যকুমারের বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া আমিই তাঁহাকে ইংরাজী শিখাইতে লাগিলাম। এই সূর্য্যকুমার প্রতিভা-বলে যথাসময়ে "রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ" বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং উত্তরকালে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করিয়াছিলেন। শাসন সংক্রান্ত এবং স্থানীয় উন্নতি সংক্রান্ত বিষয়ে (যাহাকে administrative ability বলে) তাঁহার কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা হইয়াছিল।

সেই সময় খুড়ামহাশয়ের বাসায় পিসিমার সপত্নী-পুত্র শশী-ভূষণ মুখোপাধ্যায়, দিগনগর নিবাসী শ্রীরাম চক্রবর্ত্তী, ওঁদা নিবাসী মহেশ চন্দ্র চৌধুরী ও জীবনকৃষ্ণ সরকার এবং অক্ষয় রায় প্রভৃতি অনেকগুলি লোক চাকুরীর আশায় বসিয়া ছিলেন। আমি তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া গান বাজনায় এবং তাস খেলিয়া অনেক সময় কাটাইতাম। এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইলে নিয়মিতরূপে লেখাপড়া শিক্ষার জন্য খুড়ামহাশয় আমাকে এবং দেবেন্দ্রকে বাঁকুড়ায় পাঠাইয়া দিলেন। ওঁদার নিকটবর্ত্তী কুমারডাঙ্গা নিবাসী খুড়ামহাশয়ের পুরাতন বন্ধু যাদবচন্দ্র সরকার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে তাঁহারই বাসায় আমাদিগকে রাখিয়া দিয়াছিলেন। যাদবচন্দ্র জজ আদালতের মোহরার ছিলেন। খুড়ামহাশয় আমাদের আহার, জলখাবার, দুগ্ধ প্রভৃতির জন্য উপযুক্তরূপ অর্থ পাঠাইতেন, কিন্তু আমারা ভাল খাইতে পাইতাম না। জল খাবার কেবল স্কুল হইতে আসিয়া এক পয়সার চিড়া, এক পয়সার মুড়কি এবং এক পোয়া "জলবৎ তরলং"

গোয়ালার দুগ্ধ। আহারের এরূপ ক্লেশ জীবনে কখনও পাই নাই। কয়েক মাস পরে জননীকে এই সকল কষ্টের কথা লিখিয়াছিলাম। তিনি খুড়ামহাশয়কে এই সকল বিষয় জানাইয়া লিখিয়াছিলেন ;— "আমার বাছারা তরকারি দিয়া ভাত খাইতে পায় না, তুমি এ বিষয় একটু দেখিবে"। তদুত্তরে খুড়ামহাশয় তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "ভবিষ্যতে তোমার বাছাদের ভাতের কষ্ট হওয়া অপেক্ষা এখন একটু তরকারির কষ্ট ভাল।" অতি সরলভাবে কি মূল্যবান্ প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন! অবশেষে আমাদের স্কুলের (বাঁকুড়া জেলা স্কুল) প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে আমাদের কষ্টের কথা জানাইয়াছিলাম। ইনি পিতার একজন পুরাতন বন্ধু ছিলেন। ইঁহারই চেষ্টায় পিতৃব্যদেব অবশেষে আমাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া একটী পৃথক বাসা করিয়া দিয়াছিলেন ও পাচক ব্রাহ্মণ ও একটী চাকরাণী নিযুক্ত করিয়া কুঞ্জবিহারী বাবুর তত্ত্বাবধানে আমাদিগকে রাখিয়াছিলেন। বাঁকুড়া সে সময় পর্য্যন্তও সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। আমাদের শরীর খুব সুস্থ এবং মন খুব প্রফুল্ল থাকিত। প্রধানশিক্ষক মহাশয়ের যত্নে আমাদের লেখাপড়াও এতদিনের পর সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। তবে এই সময় আমি যৌবন-সুলভ আমোদ প্রমোদেই অবসর সময় কাটাইতাম। কুসংসর্গ দোষও ঘটিয়াছিল।

বাঁকুড়ায় সে সময়ে প্রায় বারমাসই নানাবিধ উৎসব হইত। ঝুলন যাত্রা, ভাদু পরব, দুর্গোৎসব, কার্ত্তিকপূজা, রাসযাত্রা, এখেন

শিকার (মকর সংক্রান্তির দিন শিকার করিতে বাহির হওয়া) দোলযাত্রা, মনসাপূজা ও ভাসান, গাজন প্রভৃতিই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই সকল পর্ব্ব বা উৎসব উপলক্ষে আমরা কতই না আমোদ প্রমোদ করিয়া বেড়াইতাম! জিনিষপত্র খুবই সুলভ ছিল। আমরা দুই ভাই দিনের বেলায় প্রায়ই মাছের ঝোল, দাইল ও টক এবং রাত্রিতে ঐ সমস্ত তরকারির সঙ্গে এক এক পোয়া দুগ্ধ খাইতাম। তিন পয়সায় এক পোয়া মাছ, এক পয়সায় এক পোয়া দুগ্ধ পাওয়া যাইত। সে সময় ক্ষুধা এতই প্রবল এবং পরিপাক শক্তি এত বেশী ছিল যে স্কুলের ছুটির পর বাসায় আসিয়া চারি পয়সার কচুরিও জিলিপিতে কিছুতেই ক্ষুন্নিবারণ হইত না বলিয়া আমাদের বৃদ্ধ ঝি চাউলের গুঁড়া, তিল গুঁড়া প্রভৃতি মিশাইয়া এক একদিন এক একরূপ পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া দিত। অতি সুন্দর সুগন্ধ আখের গুড়ের সঙ্গে এবং খাঁটী দুগ্ধ সংযোগে বেশ একরকম পেট ভরিয়াই সে সময় আহার হইত। কোন কোন দিন বা সে মুড়ী, চিড়ে, ছোলা প্রভৃতি ভাজিয়া জল খাবারের আয়োজন করিত। আর একটী বিষয়ও এই স্থানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। পূর্ব্বপুরুষগণ শক্তি উপাসক ছিলেন। "ভজলে সীতারামের" দল শক্তি উপাসক রাজার রাজ্যে বাস করিয়াই সম্ভবতঃ ক্রমে ক্রমে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকিবেন। আমরাও স্তব, স্তুতি, উপাসনা শিখি নাই,—শিখিয়া ছিলাম কেবল মায়ের মহাপ্রসাদ খাইতে; তাহাও আবার বোধ হয় তিন বৎসর বয়সের সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। এই-

রূপে ক্রমে একটি প্রকাণ্ড মাংসাশী জীব হইয়া পড়িয়াছিলাম। সে সময় এক টাকায় বেশ একটী হৃষ্টপুষ্ট পাঁঠা পাওয়া যাইত। কয়েকটী সহপাঠীও আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ায়, মাসের মধ্যে দুই তিনবার মায়ের পূজা দিয়া অতি আনন্দে প্রসাদ ভোজন করা যাইত। আমিই গ্রামে গ্রামে যাইয়া পাঁঠা ক্রয় করিয়া আনিতাম, নিজেই মায়ের মন্দিরে নিবেদন করিতাম, নিজেই বলি দিতাম এবং নিজে রন্ধন করিতাম। এই ব্যাপার ক্রমশঃ মাষ্টার পণ্ডিতবর্গের কর্ণগোচর হইয়াছিল। প্রধান পণ্ডিত স্বর্গীয় শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার নাম রাখিয়াছিলেন "ছাগুলে চক্কত্তি"। আমাদের স্কুলে "জিম্‌ন্যাস্‌টীক" বা অন্য কোনরূপ ব্যায়াম শিক্ষার বন্দোবস্ত না থাকায়, আমিই অগ্রণী হইয়া একটী "ক্রিকেট ক্লাব" স্থাপন করিয়াছিলাম। সেই সঙ্গে আমাদের সেকালের গ্রাম্য খেলা "হা ডু ডু" "বাতাবন্দি" এবং নানাপ্রকারের কুস্তি শিক্ষাও হইতে লাগিল। শিক্ষকেরও অভাব হইল না। স্কুলের সেক্রেটারি, সিভিল সার্জ্জন রিচার্ডসন এবং জেল দারোগার পুত্র মিঃ জেনাভন ক্রিকেট খেলার শিক্ষক হইলেন, এবং স্থানীয় দুইটী কুস্তিগীর পালোয়ান আমাদিগকে কুস্তি ও নানারূপ খেলা শিখাইতে লাগিলেন। স্কুলে এই একটী নূতন জিনিষ প্রবর্ত্তিত হইবার সংবাদ সহরের মধ্যে শীঘ্রই প্রচারিত হওয়ায় রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন সহরের অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক আমাদের খেলা দেখিতে আসিতেন।

আমাদের শেষ পরীক্ষার সময় নিকটবর্ত্তী হইলে সকলেরই

একটা মহা চিন্তা উপস্থিত হইল। সে সময় "প্লানচেট" (planchette) আমরা প্রথম দেখিলাম। প্লানচেট সাহায্যে ভবিষ্যতের অনেক সংবাদ জানিতে পারা যায় এই কথা শুনিয়া আমরা একখানি প্লানচেট ক্রয় করিয়া একদিন সন্ধ্যার পর আমাদের বাসার সকলে একত্র হইয়া আমাদের সহপাঠী পরলোকগত বিরিঞ্চি চক্রবর্ত্তীর প্রেতাত্মাকে একাগ্রমনে ডাকিতে লাগিলাম। ক্রমে আমার যেন নিদ্রাকর্ষণ হইতে লাগিল। সেই সময় সহপাঠিগণ আমার হাতে পেন্সিল দিয়া প্লানচেটের উপর একখানি সাদা কাগজ রাখিয়া দিলেন। আমি কিছুই জানিতে পারিলাম না। পরে জানিলাম ভূতের ভয়ে কোন কোন সহপাঠী একেবারে অভিভূত হওয়ায় দুই একটী প্রশ্নের পরেই আমার সম্মুখ হইতে প্লানচেটখানি সরাইয়া আমার হাত হইতে পেন্সিলটী তাঁহারা ছাড়াইয়া লইয়াছেন। সেই সময় আমি ঘুম ভাঙ্গার ন্যায় চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে অলস অস্ফুট দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম, সকলে আমার মুখে চোখে জল দিয়া একটু গরম দুধ পান করাইল। তারপর কাগজে কি লেখা হইয়াছে দেখিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম অধিকাংশ লেখাই অস্পষ্ট, কিন্তু নিম্নলিখিত কয়টী কথা বেশ স্পষ্টভাবে লেখা ছিল ঃ—
"Seventeen will pass" অর্থাৎ সতর জন পাস হইবে। এই ব্যাপারটা সহরে প্রচারিত হইলে অধিকাংশ লোকেই এটাকে ছেলেখেলা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা পরীক্ষার ফল না দেখিয়া এটাকে একেবারে অবিশ্বাস করিতে

পারি নাই। পরীক্ষা শেষ হইলে আমি ও দেবেন্দ্র দিগনগরে আসিয়াছিলাম। যথাকালে পরীক্ষার ফল বাহির হইল ; দেবেন্দ্র দশ টাকা বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে এবং আমি দ্বিতীয় বিভাগে পাস হইয়াছিলাম এবং ঠিক সতরজনই পাস হইয়াছিল। এই প্লানচেট সাহায্যে ভবিষ্যৎ ঘটনা জানিবার কিছু না কিছু গূঢ় রহস্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত। আমরা যে কয়জন সে বৎসর পাস হইয়াছিলাম তাহার মধ্যে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা নিবাসী চন্দ্রশেখর সরকার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি এবং দুই তিনটী মেডেল পাইয়াছিলেন। এই চন্দ্রশেখর কয়েক বৎসরের মধ্যেই এল, এ, বি,এ, এম,এ এবং আইন পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া প্রথমে ভাগলপুরের একজন সুপ্রসিদ্ধ উকীলের পুত্রদিগের গৃহ-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া পরে নিজেই ওকালতী ব্যবসা অবলম্বন করেন এবং এই ব্যবসায়ে অল্পদিনের মধ্যেই প্রভূত খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

আমাদের গ্রামে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মধ্যে আমরা দুই ভাই সর্ব্বপ্রথম এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াছিলাম। কনিষ্ঠ সহোদর রাজেন্দ্র নাথ ও খুড়ামহাশয়ের তৎসময়ের চাকুরীস্থল দাঁতন স্কুল হইতে চারি টাকা বৃত্তিসহ junior scholarship (মধ্য-ইংরাজী) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় আমরা ক্ষণজন্মা ছেলে বলিয়া পল্লীবাসীদিগের ধারণা হইয়াছিল। আমাদের আদরের পরিসীমা ছিল

না। এইরূপে প্রায় দুইমাস উত্তীর্ণ হইবার পরে দেবেন্দ্র কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান বিদ্যালয় প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং আমি ক্যাথিড্রেল মিশন কলেজে প্রবিষ্ট হইলাম। কিন্তু অল্পদিন পরেই আমি সেই কলেজ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনগর কলেজে প্রবিষ্ট হইলাম। কনিষ্ঠ সহোদর রাজেন্দ্র নাথও কৃষ্ণনগরে আমাদের সঙ্গে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। কৃষ্ণনগর নেদিয়ার পাড়ায় সারদাসুন্দরী দেবী এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী (উভয়েই বিধবা এবং বষিয়সী) কয়েকটি ছাত্রকে নিজ বাটীতে রাখিয়া তাহাদের আহারাদির ব্যবস্থাও, রন্ধনাদি করিয়া দিতেন। তদ্দারাই তাঁহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত। আমাদের গ্রামের অঘোর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নুটবিহারী সরকারও সেই বাটীতে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। বেশ একরূপ আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। প্রতি শনিবারেই সকলেই একত্রিত হইয়া বাড়ী আসিতাম, আবার সোমবার প্রাতে কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া যাইতাম। আমার এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার প্রথম পরিচ্ছেদ এই স্থানেই শেষ করিলাম।

——o——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বঙ্গ, বিহার উড়িষ্যার মসনদে লেফট্‌ন্যাণ্ট গভর্ণররূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি একজন সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহারই সময় "নেটীভ সিভিল সার্ভিস" বা "সাব অর্ডিনেট সিভিল সার্ভিস" নামক একটী পদের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই পদে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত শিক্ষার জন্য তিনি হুগলি কলেজে একটী বিশেষ বিভাগ যোগ করিয়াছিলেন। শিক্ষার্থীগণকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা করিতে হইত।—

১। ফৌজদারী ও রাজস্বসংক্রান্ত আইন (Criminal and Revenue Laws)

২। সার্ভে ইন্‌জিনিয়ারিং ও ড্রয়িং (Survey, Engineering and Drawing)

৩। বাঙ্গালা হাতের লেখা পড়া ও অনুবাদ করা (Reading and translating Bengali manuscript)

৪। ব্যায়াম (Gymnastics)

৫। অশ্বারোহণ (Riding)

৬। সন্তরণ (swimming)

৭। উদ্ভিদ বিদ্যা ও রসায়ন (Botany and Chemistry)

শেষোক্ত বিষয়টী শিক্ষা করা ছাত্রদিগের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত, কিন্তু প্রথম ছয়টীতে উত্তীর্ণ হওয়া প্রয়োজনীয় ছিল। পরীক্ষায় পারদর্শিতা অনুসারে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে উচ্চ শ্রেণী (higher grade) এবং নিম্ন শ্রেণী (lower grade) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইত। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণকে একেবারে "সব ডেপুটী কালেক্টরী" পদের উপযুক্ত বিবেচনা করা হইত এবং নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রগণ "কানুনগো"গিরির উপযুক্ত হইতেন।

এই সংবাদ ক্রমে দেশময় রাষ্ট্র হইল। শুনিলাম বাঁকুড়া স্কুলের সহধ্যায়ীদের মধ্যে কয়েকজন এবং আমাদের কৃষ্ণনগর কলেজের কয়েকজন "সিভিল সার্ভিস" ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছেন। অনেকগুলি কেরাণী, পুলিসের হেড কনেষ্টবল, অল্পবেতনের শিক্ষক প্রভৃতিও বিদায় লইয়া এই ক্লাসে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমারও মাথা ঘুরিয়া গেল। পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলাম এবং "ইউনিভারসিটি" হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়া হুগলির "নেটীভ সিভিল সার্ভিস" ক্লাসে প্রবিষ্ট হইলাম। চুঁচুড়ার ব্যারাকে আমাদের প্রকাণ্ড একটা বোর্ডিং হইয়াছিল। আমার পুরাতন সহপাঠী ও পরিচিত অনেককেই সেখানে দেখিতে পাইলাম। আমি যেসময় এই ক্লাসে ভর্ত্তি হইলাম, তখন পরীক্ষার কেবলমাত্র সাতমাস বিলম্ব ছিল। যাহা হউক খুব উৎসাহ সহকারে পড়াশুনা করিতে লাগিলাম। অশ্বা-

রোহণ, সন্তরণ, জিমন্যাস্‌টিক প্রভৃতি বিষয়গুলিতেও বেশ সুনিপুণ হইতে লাগিলাম। যথাসময়ে পরীক্ষা দেওয়া হইল এবং প্রায় দুইমাস পরে পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখিলাম আমি নিম্ন-শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। যাহা হউক, শীঘ্রই একটা কানুনগো-গিরি চাকরী পাইব এই আশায় বেশ প্রফুল্ল মনে আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। উচ্চ শ্রেণীতে যাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে যিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া-ছিলেন, তাঁহাকে একেবারে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাঁহার পরের পাঁচ জনকে সব ডেপুটী কালেক্টর পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, এবং কয়েকজনকে কানুনগো পদেও নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইঁহারা সকলেই সিভিল সার্ভিস ক্লাসে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে কোন না কোন একটা চাকুরী করিতেন; সেই সময়ে আফিসের কাজকর্ম্ম, দেশের প্রচলিত আইন প্রভৃতি বিষয়ে অনেকটা অভিজ্ঞতা পূর্ব্ব হইতেই লাভ করিয়া এই সাব-ডিনেট সিভিল সার্ভিস ক্লাসে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। যাঁহারা সব ডেপুটী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও একজন ছিলেন। ইঁহার বিষয় পুনরায় আরও দুই একবার উল্লেখ করিতে হইবে।

এই সময়ের প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে (বাং ১২৮০ সালের বৈশাখ) শান্তিপুর লক্ষ্মীতলা নিবাসী স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা হেমাঙ্গিনী দেবীর সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্বে হেমাঙ্গিনীকে আমি

দেখিয়াছিলাম, শ্যামবর্ণা ও স্থূলাঙ্গী বলিয়া এই বিবাহে আমার ততটা অভিমত ছিল না। কিন্তু মাতাঠাকুরাণীর এবং অন্যান্য আত্মীয়বর্গের একান্ত অনুরোধে এই হেমাঙ্গিনী দেবীই আমার ধর্ম্মপত্নী হইয়াছিলেন এবং অর্দ্ধ শতাব্দকাল আমার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের নানাস্থানে, নানা সুখে দুঃখে কাল কাটাইয়াছিলেন। বিবাহের প্রথম কয়েক বৎসর আমি তাঁহাকে উপযুক্তরূপ স্নেহ করি নাই ; অধিকন্তু সময় সময় অযথা উৎপীড়ন করিয়াছি, ও নিতান্ত বর্ব্বরের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। তথাপি সেই পতিপরায়ণা সাধ্বী একদিনের তরেও আমার প্রতি বিন্দুমাত্র বিতৃষ্ণার ভাব বা অনাদর দেখান নাই। আমার আহার বিহার, সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি দিবারাত্র দৃষ্টি রাখিতেন, অকাতরে আমার সেবা করিতেন। শরীর বেশ সবল ও সুস্থ ছিল বলিয়া দাসদাসীর সাহায্য বড় একটা লইতেন না ; গৃহস্থালীর অনেক কার্য্যই অতি নিপুণতার সহিত নিজেই নির্ব্বাহ করিতেন। এই দেব-প্রতিম রমণীর কথা আখ্যায়িকার মধ্যে সময় সময় সম্ভবতঃ উল্লেখ করিতে হইবে, এখন এই পর্য্যন্ত।

সেই বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসে খুড়ামহাশয় বিদায় লইয়া দেশে আসিলেন এবং নবদ্বীপ "যুগন্নাথ"-তলা পাড়া নিবাসী স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী নৃসিংহদাসী দেবীর সহিত আমার মধ্যম সহোদর দেবেন্দ্রনাথের বিবাহ একটু সমারোহের সহিত দিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ভূপতির উপনয়নও এই সময় বিশেষরূপ জাঁকজমকের সহিত সমাধা

হইয়াছিল। ইহার কয়েক মাস পর হইতেই বুঝিতে পারিলাম, খুড়ামহাশয় আমাদের শিক্ষার জন্য আর অধিক অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত নহেন। প্রধানতঃ সেই জন্যই আমি কলেজ ছাড়িয়া হুগলির "সাবর্ডিনেট সিভিল সার্ভিস" ক্লাসে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শীঘ্রই, গভর্ণমেণ্ট আমাকে একটী কানুনগো-গিরি চাকরী দিবেন এই আশায় বেশ আমোদ প্রমোদে দিগনগরে কাল কাটাইতেছিলাম। সেই সময় দামুরহুদা নিবাসী রজনীকান্ত বসু, যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র জ্ঞানদা প্রসাদের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া দিগনগরে বাস করিতেছিলেন। রজনী বাবু অতি সুপুরুষ, সচ্চরিত্র এবং সরল প্রকৃতিও অমায়িক লোক ছিলেন ; গান বাজনায় তাঁহার বেশ নৈপুণ্য ছিল। সঙ্গীত বিষয়ে আমারও একটু রুচি থাকায়, বিশেষত রজনী বাবুর স্বভাব-গুণে অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। আমাদের গ্রাম সংলগ্ন হাতিশালা গ্রাম নিবাসী মহানন্দ সরকার সেই সময় ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারি শিক্ষা করিতে-ছিলেন। তাঁহার সহিতও আমাদের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য হইয়াছিল। সাতগেছিয়া নিবাসী পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী, সম্বন্ধে আমার স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীর পিসতুত ভাই ছিলেন। আবার আমার নিকট জ্ঞাতি ভ্রাতা স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর শ্যালক এবং কেশবচন্দ্রের নাবালক পুত্র রাধিকা প্রসাদের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়করূপে দিগনগরে বাস করিতেছিলেন। ইনিও অতি সুপুরুষ, গান বাজনা এবং আমোদপ্রিয় লোক ছিলেন। আমাদের স্বর্গীয়া

মাতাঠাকুরাণীর মাসতুত ভ্রাতা লালবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও দিগনগরে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। ইহা ব্যতীত নন্দকুমার চক্রবর্ত্তী, রামগোবিন্দ ঘোষ, রামলাল মোদক প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণও অবাধে আমাদের সঙ্গে মিশিতেন। সন্ধ্যার পর প্রায়ই গান বাজনায় অতিবাহিত হইত। নন্দকুমার সে সময় আমাদের বিষয়-সম্পত্তির রক্ষনাবেক্ষণ করিতেন। এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইলে খুড়ামহাশয়ের তৎকালিক কর্ম্মস্থান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাঁতনে যাইয়া মহানন্দে কিছুদিন কাটাইয়া আসিলাম। তাহার পর খুড়ামহাশয় তাঁহার পুরাতন বন্ধু ভূপতি বাবুর নিকটে আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। ইনি সে সময় ঢাকার সাবর্ডিনেট জজ ছিলেন। তিনি ও তৎপত্নী ও পরিবারস্থ সকলেই আমাকে যথেষ্ট স্নেহ যত্নে রাখিয়াছিলেন। আফিসের কাজ কর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্য আমাকে জজ আফিসের Translator বাবুর শিক্ষানবিশ নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ভবিষ্যতে ভাল হইবে এই উপদেশ দিয়া নিজেই আমাকে আইন পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। সে সময় জজ ও সবজজেরাই নিম্নশ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন। একটু চেষ্টা করিলেই অনায়াসেই আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম। তাহা হইলে উদরান্নের জন্য নানা কষ্ট, নানা লাঞ্ছনা ও বিপদভোগ করিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত না, কোন একটী জেলায় সদরে বা মহকুমায় বসিয়া ওকালতি ব্যবসা অবলম্বন করিয়া থাকিলেই

সকলদিকেই ভাল হইত; কিছু বিষয় সম্পত্তিও করিতে পারিতাম। কিন্তু ভগবানের সে ইচ্ছা ছিল না, দুই মাস আফিসের কাজ কর্ম্ম শিক্ষা এবং বাড়ীতে আইন পড়িবার পর খুড়ামহাশয়ের পত্র পাইলাম দাঁতন মধ্য-ইংরাজী স্কুলের হেড মাষ্টারি পদ খালি হইয়াছে, মাসিক বেতন ৩৫৲ টাকা। সত্বর দাঁতনে যাইয়া সেই মাষ্টারি কাজে আপাততঃ নিযুক্ত হইবার জন্য তিনি উপদেশ দিয়াছেন। মহানন্দে ঢাকা পরিত্যাগ করিলাম। বাটী হইয়া যথা সময়ে দাঁতনে উপস্থিত হইয়া মাষ্টারি পদ গ্রহণ করিলাম। খুড়ামহাশয়ের বাসাতেই থাকিতাম। বেতনের মধ্য হইতে পকেট খরচের জন্য ৫৲ টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট ৩০৲ টাকা খুড়িমাতাঠাকুরাণীর নিকট রাখিয়া দিতাম। মাত্র আটমাস কাল এই শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। ছাত্রদিগের গুণেই হউক বা মাষ্টারদের গুণে হউক, যে আটজন ছাত্রকে সে বৎসর শেষ পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে তিনজন বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে, তিনজন দ্বিতীয় বিভাগে এবং একজন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে সুখ্যাতিও লাভ হইয়াছিল। এই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতেই খুড়ামহাশয়ের দৃষ্টি ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হয়। চক্ষু চিকিৎসার জন্য বিদায় লইয়া দেশে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। আমারও সেই সময় উপর্য্যুপরি দুইটী কঠিন রোগ হইয়াছিল। প্রথমটী গণ্ডমালা (Scrofulous abscess) বামগণ্ডের নিম্নভাগে পর পর তিনটি ফোড়ার ন্যায় হইয়াছিল। অস্ত্র চিকিৎসার জন্য মেদিনী-

পুরে যাইয়া শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দাস সিভিল কোর্ট আমীন মহাশয়ের বাসায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম। পূর্ব্ব বৎসর ভূপতি বৃত্তি-সহ মাইনর পরীক্ষায় দাঁতন স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এই সময় মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে পড়িতেছিল। ভূপতিও ব্রজনাথ বাবুর বাসায় থাকিত। ডাক্তার ভুবনেশ্বর মিত্র মহাশয় আমার গণ্ডমালার অস্ত্র চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কথঞ্চিৎ আরোগ্য হইবার পর পুনরায় দাঁতনে ফিরিয়া যাইবার পর কয়েকদিন পরেই রক্ত-আমাশয় রোগে ক্রমে ক্রমে শয্যাগত হইয়া পড়িলাম। সেই সময় খুড়ামহাশয়ের বিদায় মঞ্জুর হইয়া আসিলে তিনি সমস্ত পরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া দিগনগরে আসিয়াছিলেন। আমার চিকিৎসার জন্য শান্তিপুরে আমার শ্বশুরালয়ে আমাকে রাখিয়া গিয়াছিলেন। শান্তিপুরের উপকণ্ঠে বাউইগাছি গ্রাম নিবাসী প্রসিদ্ধ কবিরাজ রামগোপাল সেন মহাশয়ের চিকিৎসায় আমি দুই সপ্তাহের মধ্যেই রোগমুক্ত হইয়া দিগনগরে গিয়াছিলাম। কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত আহারাদি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানে থাকিয়া ঔষধ সেবন করিতে হইয়াছিল।

বর্ষার প্রারম্ভেই আমরা দিগনগরে উপস্থিত হইলাম। ডাক্তারেরা বলিয়াছিলেন একটু শীত পড়িলেই চক্ষুর চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য, সেইজন্য পিতৃব্যদেব আমাকে এবং একজন অনুচর সঙ্গে লইয়া রাসযাত্রার পরে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সেই সময় মাণিকতলা ষ্ট্রীটের একটী বাড়ীতে দেবেন্দ্র, রাজেন্দ্র, ভূপতি, শ্রীপতি, পূর্ব্বোল্লিখিত সূর্য্যকুমার অগস্তি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

রামনারায়ণ অগস্তি প্রভৃতি কয়েকজন ছাত্র মেস করিয়া থাকিতেন। বাড়ীটী বেশ সুপ্রশস্ত দ্বিতল। অনেকগুলি ঘর রন্ধনশালা, পায়খানা, জলের কল প্রভৃতি থাকায় আমরা সকলে বেশ আরামে ছিলাম। চক্ষে অস্ত্র চিকিৎসা হইল, তাহার পর তিনমাস পর্য্যন্ত ডাক্তারেরা পিতৃব্যদেবকে কলিকাতায় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কোন ফলই হইল না, সুতরাং কলিকাতা হইতে পেন্সনের দরখাস্ত দিয়া পিতৃব্যদেব দিগনগরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের কলিকাতায় অবস্থিতির সময়ে বাবু সারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে আসিয়া তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছিলেন। সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের বাটীতে নিমন্ত্রণ পত্র সহ একখানি বৃহৎ পিত্তলের থালায় আনন্দ লাড়ু ও সন্দেশ, একহাঁড়ি উৎকৃষ্ট দধি, একবাটী তৈল এবংএকটী রোহিৎ, মিরিকি বা কাৎলা মাছ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, বিশেষ বিশেষ স্থানে বোধ হয় বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। এই নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া খুড়ামহাশয় আমাদের সকলকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের মধ্যে কে কে বিবাহে যাইবে। সারদা বাবু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যাকে বিবাহ করিয়া পিরিলিবাদ গ্রস্ত এবং জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন, একথা সকলেই জানিত। পাছে বিবাহ উপলক্ষে যাইয়া জাতিভ্রষ্ট হইতে হয় এই আশঙ্কায় সকলেই এক বাক্যে অসম্মতি প্রকাশ করিল, কেবল সূর্য্যকুমার, রাজেন্দ্র, শ্রীপতি ও আমি যাইতে স্বীকৃত হইলাম। শ্রীপতি বলিল "বাবা এমন একটা ফলার কি ছাড়া যায়? কাল তখন

গঙ্গাস্নান করিয়া একটা তুলসী পাতা খাইয়া শুদ্ধ হইব।” যথাকালে আমরা কয়জন বিবাহে উপস্থিত হইয়া “ব্রাহ্ম মতের” বিবাহ এই প্রথম দেখিলাম এবং আহারাদির যেরূপ আয়োজন দেখিলাম ইতিপূর্ব্বে আর কখনও সেরূপ দেখি নাই। কলিকাতার বড়লোকের বিবাহে যে কি সমারোহ হইয়া থাকে তাহা ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। ইহার প্রায় একমাস পরেই আমরা দিগনগরে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম।

সেই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে আমার মাতুল স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহার খুল্লতাত পুত্র নৃসিংহপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গাজিপুরে কোন চা কোম্পানীর recruiting agent ছিলেন। পিতৃব্যদেবের অনুমতি লইয়া আমি কিছুদিনের জন্য সেখানে গিয়াছিলাম। সে সময় মিঃ রিভেট কার্ণাক (Mr. Rivett Carnac) সেখানকার “ওপিয়াম এজেণ্ট’ (Opium Agent) ছিলেন। মাতুল মহাশয়দিগের পরামর্শমত একদিন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমার সার্টিফিকেটগুলি দেখাইলাম এবং তাঁহার আফিসে আমাকে একটী চাকরী দিবার প্রার্থনাযুক্ত একখানি আবেদন পত্র দিলাম। তিনি আমার সঙ্গে প্রায় দশ মিনিট কথাবার্ত্তা বলিয়া নানারূপ প্রশ্ন করিয়া দরখাস্তের উপর লিখিলেন :—The applicant looks respectable and intelligent ; let him be appointed as clerk in the Damdata office on Rs. 30/- a month.” অর্থাৎ আবেদনকারীকে ভদ্রলোক এবং বুদ্ধিমান বোধ হইল। “দামদেতা”

আফিসে তাহাকে ত্রিশ টাকা বেতনে কেরাণীগিরি পদে নিযুক্ত করা হউক। আমার তখন সেই ডেপুটী ও সবডেপুটীপূর্ণ বিকৃত মস্তিষ্কে মহামতি কার্ণাকের প্রদত্ত কেরাণীগিরি স্থান পাইবে কেন? আমি সেই চাকরী গ্রহণ না করিয়া কিছুদিন পরে দেশে ফিরিয়া আসিলাম। অনেকদিন পরে শুনিয়াছিলাম যে আর একটী বাঙ্গালী যুবক সেই পদে নিযুক্ত হইয়া তিন বৎসরের মধ্যে মাসিক দেড়শত টাকা বেতনের পদ এবং আরও কয়েক বৎসর পরে "সব ডেপুটী ওপিয়াম এজেণ্ট" (Sub-Deputy Opium Agent) হইয়াছিলেন। এই পদের বেতন সে সময় আটশত টাকা বা তদধিক ছিল। অদৃষ্টে নানারূপ কষ্টভোগ ছিল; সুতরাং "হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া" আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিল। গাজিপুরে দ্রষ্টব্য মধ্যে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সমাধি-মন্দির, সুপ্রশস্ত ফুলবাগানের মধ্যে আড়ম্বরশূন্য অথচ সুদৃশ্য বাড়ী, নানাবর্ণের নানাবিধ দেশী ও বিলাতী ফুল, তাহার মধ্যে নানাজাতীয় গোলাপই অধিক। আর একটী দেখিবার জিনিষ গোলাপফুলের চাষ। এক স্থানে এত গোলাপ বাগান আর কোথাও দেখি নাই; এই গোলাপ হইতেই গাজিপুরের প্রসিদ্ধ গোলাপ জল প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেশে আসিবার সময় মাতুলেরা দুই বোতল অতি উৎকৃষ্ট গোলাপ জল আমাকে দিয়াছিলেন।

দেশে আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আমোদ প্রমোদেই সময়টা কাটিতে লাগিল। কিন্তু দেখিলাম পিতৃব্যদেব এখন একেবারে

মিতব্যয়ী হইয়া পড়িয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা হওয়াই সম্ভব। মাসিক দুইশত টাকা পেন্সন, কয়েক হাজার টাকার কোম্পানির কাগজের সুদ এবং জমি জায়গার সামান্য আয়েই সংসার খরচ, ছেলেদের শিক্ষা প্রভৃতি নির্ব্বাহ করিতে হইবে। তাঁহার আদর্শে আমিও সাংসারিক অনেক কাজ স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম; যথা লেপ বালিসের আবরণ সেলাই, চেয়ার টেবিল বার্ণিস করা, জুতা বার্ণিস করা, ছেঁড়া জামা কাপড় প্রভৃতি রিপু করা, নিজে বাজার করিয়া আনা প্রভৃতি। এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইবার পর কনিষ্ঠ সহোদর রাজেন্দ্র-নাথের বিবাহের প্রস্তাব হইতে লাগিল; নানা স্থানে পাত্রী দেখা এবং নানা স্থান হইতে পাত্র দেখা হইতে লাগিল। মহেশপুর সে সময় নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে যশোহর জেলার বনগাঁ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়। মহেশপুর হইতে তিনটী ভদ্রলোক রাজেন্দ্রকে দেখিতে আসিয়া আমাদের অবস্থা, চালচলন, আচার ব্যবহার, আহারাদির আয়োজন প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিবার জন্য এক সপ্তাহ আমাদের বাটীতে ছিলেন। যথেষ্ট সমাদরে ও যত্নে তাঁহাদিগকে রাখা হইয়াছিল। তখন বর্ষাকাল, ঘরে প্রচুর দুগ্ধ, দীঘিতে প্রচুর মাছ; প্রতিদিনই আমরা দীঘি হইতে তিন চারিটি রুই, মিরগাল ধরিয়া আনিতাম, ঘরে ছানা, ক্ষীর, দধি ও সন্দেশ আদি প্রস্তুত হইত। সদ্য প্রস্তুত গব্য ঘৃতেরও অভাব ছিল না। তাহার উপর ভদ্রলোকগুলিকে প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের গান বাজনার মজলিসে লইয়া যাইতাম।

তাঁহারা যথাসময়ে মহেশপুর প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত অবস্থা কন্যাপক্ষকে জানাইলে, সেখানকার অন্যতম জমিদার স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সুকুমারী দেবীর সহিত অতি সমারোহে রাজেন্দ্রনাথের বিবাহ দিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রনাথের বিবাহের দুই এক মাস পর হইতেই আমাদের প্রতি পিতৃব্যপত্নী এবং পিতৃব্যের শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ব্যবহার সম্বন্ধে ভাবান্তর দেখিতে লাগিলাম। সামান্য কারণে বা অকারণে আমাকে, সহোদর দুইটীকে, এবং জননীকে পিতৃব্যদেব অতি কটু ভাষায় তিরস্কার করিতেন। পিতৃব্যের শ্বশ্রূঠাকুরাণীর বিনানুমতিতে মাতাঠাকুরাণী যদি আমাদের জন্য বা নিজের জন্য সামান্য কিছু যথা, দুইটী আলু, এক টুকরা মানকচু বা এক মুষ্টি ভাল মিহি চাউল বা একটু গুড় লইতেন, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইত। মাতাঠাকুরাণী অকাতরে এই সকল অপমান সহ্য করিতেন। মানসিক কষ্টের সীমা পরিসীমা ছিল না। আমি সকলই দেখিতাম, শুনিতাম, কিন্তু নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া কোন প্রতিবাদ করিতাম না। কিন্তু মাতৃভক্ত দেবেন্দ্র এই সকল অন্যায় আচরণ সহ্য করিতে পারিত না। সময় সময় পিতৃব্যের সহিত ঘোরতর বাকবিতণ্ডা উপস্থিত করিত। ফল এই হইল যে খুড়ামহাশয় দেবেন্দ্রনাথের পড়ার খরচ বন্ধ করিয়া দিলেন। দেবেন্দ্র সহাস্যমুখে বলিল, "আমার যদি ইচ্ছা থাকে, উপায়ও হইবে।" সেই সময় হইতে অবসর সময়ে ছাত্র পড়াইয়া দেবেন্দ্র নিজের কলিকাতার মেসের ও পড়ার খরচ চালাইতে লাগিল।

তারপর আমি একাই বাটীতে থাকিয়া নীরবে সব সহ্য করিতে লাগিলাম। ঘরে তখন তিনটী বৌ। রাজেন্দ্র পত্নী জমিদার কন্যা এবং সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা বলিয়া প্রায়ই পিত্রালয়ে থাকিতেন। মধ্যম বধূমাতা (দেবেন্দ্র পত্নী) অতি চতুর ও বুদ্ধিমতী; তিনি সময়োপযোগী কথাবার্ত্তা এবং ব্যবহারের দ্বারা নিজের অবস্থাকে কতকটা মানাইয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু আমার স্ত্রীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। চতুরতা কাহাকে বলে বালিকা তাহা জানিত না, মনের কথা বলিতে পারিত না, অথচ বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট দেহ ছিল বলিয়া বাসন মাজা, কাপড় কাচা হইতে আরম্ভ করিয়া সেই বৃহৎ পরিবারের ডাল ভাত রন্ধন প্রভৃতি অনেক কাজই তাহাকে করিতে হইত। শীতকালের প্রাতে উঠিতে একটু বিলম্ব হইলেই আইমাতাঠাকুরাণী (পিতৃব্যের শ্বশ্রূ) আসিয়া ঠাণ্ডা জল গায়ে ছড়াইয়া দিতেন এবং কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিতেন। ছেলেপিলের অসুখ হইলে সাগু প্রস্তুত হইত; ছেলেরা সহজে সাগু খাইতে চাহিত না; জোর জবরদস্তী করিয়া সামান্য একটু খাওইয়া তাদের চক্ষের জল, মুখের লালা, সিকনী মিশ্রিত যাহা অবশিষ্ট থাকিত আইমাতাঠাকুরাণী আদর করিয়া তাহাকে খাওয়াইতেন। বলিতেন, "বড় বৌ, খা, খা, আহা কত মেহনত কচ্ছিস, খা, গায়ে জোর হবে।" আহা, বেচারী সেই উপাদেয় সাগু চক্ষু কর্ণ মুদ্রিত করিয়া এক চুমুকেই গিলিয়া ফেলিত।

এইভাবে কয়েক মাস অতীত হইল। একদিন পিতৃব্যদেব

আমাকে এবং জননীকে অকারণে অযথা এরূপভাবে তিরস্কার ও অপমান করিলেন যে আমি যে কোন প্রকারেই হউক প্রাণ পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিলাম। শারীরিক অসুস্থতার ভাণ করিয়া রাত্রিতে কিছুই খাইলাম না। আপন শয়ন ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কি করিব কোথায় যাইব, কি করিলে নিজের ও জননীর এই যন্ত্রণা দূর হইবে। আহারান্তে সকলে নিদ্রিত হইলে জননী ধীরে ধীরে এক বাটী গরম দুগ্ধ এবং দুইটী নারিকেলের লাড়ু লইয়া আমার শয়ন ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে সেইগুলি খাওয়াইলেন। হেমাঙ্গিনী ঘরের একটী কোণে ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে সমস্ত দেখিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইল, আমি রাত্রি শেষে কলিকাতা যাত্রা করিয়া চাকরীর অন্বেষণ করিব। মাতাঠাকুরাণীর হাতে মাত্র পনরটী টাকা ছিল, তাহা হইতে আমাকে সাত টাকা দিলেন। আমি হেমাঙ্গিনীর সাহায্যে আমার একটী ক্যাম্বিসের ব্যাগের মধ্যে পরিধেয় বস্ত্রাদি গুছাইয়া লইয়া, শেষ রাত্রিতে নিঃশব্দে বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। পদব্রজে শান্তিপুর পর্য্যন্ত যাইয়া দুই তিনটী কলিকাতা যাত্রী ভদ্রলোকের সঙ্গে ছ্যাকড়া গাড়ীতে রাণাঘাটে আসিয়া ট্রেণ ধরিলাম এবং যথাকালে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া দেবেন্দ্র, রাজেন্দ্র, ভূপতি প্রভৃতিদের মেসে উঠিলাম; এবং মেসের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য টাকার প্রয়োজন বুঝিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া চাকরীর চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

আমাদের গ্রামের রামগোবিন্দ ঘোষ মহাশয় সেই সময় কোন

সওদাগরের আফিসে কাজ করিতেন এবং এই মেসেই থাকিতেন। তিনিও আমার জন্য নানাস্থানে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। স্বগ্রামবাসী মতিলাল কর্ম্মকারের চেষ্টায় মাসিক চার টাকা বেতনে একটী গোপনন্দনের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলাম। নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণের হোটেলে আহারাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল, জলযোগের ব্যবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। ছেলেটি এক ঘণ্টার বেশী পড়িতে পারিত না, তারপর প্রায় এক ঘণ্টা নানারূপ গল্প শুনাইতাম। ক্রমে ছাত্রের পিতামহী, তারপর ছাত্রের বিধবা পিসী ও দুইটী অবিবাহিতা ভগ্নী এবং পরিশেষে ছাত্রের মাতাঠাকুরাণী পর্য্যন্ত আমার গল্প শুনিতে আসিতেন। সেই সময়ের পূর্ব্ব হইতেই বেশ ভাবভঙ্গী করিয়া, থিয়াটারের অভিনেতাদের ন্যায় গল্প বলিবার অভ্যাস ছিল। আমার গল্প শুনিয়া সকলেই খুব আনন্দ প্রকাশ করিতেন। মহাভারত, রামায়ণ, বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঞ্চবিংশতি এবং সেক্সপিয়ারের কবিতা ও গল্পের আখ্যানভাগগুলি তাঁহাদিগকে শুনাইতাম। ক্রমে আমার গল্প বলিবার নৈপুণ্য পাড়ায় প্রচার হওয়ায় এক একদিন পাড়ার বালক ও মহিলাগণ গল্প শুনিবার জন্য এতই আসিতে লাগিলেন যে ঘরে আর জায়গা হইত না। সেই সময় যদি শ্রীমদ্ভাগবত, সংস্কৃত মহাভারত, রামায়ণাদির দুই দশটা শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া কলিকাতা সহরে কথকতা ব্যবসায় আরম্ভ করিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় ভালই হইত।

বাটী হইতে কলিকাতায় আসিয়াই পূর্ব্বপরিচিত উচ্চপদস্থ

কয়েকজনকে আমার যে কোন একটী চাকরি করিয়া দিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম। ভবতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি তখন ডেপুটী কালেক্টরী পদে উন্নতি লাভ করিয়া দার্জ্জিলিংয়ে রোডসেস রিভ্যালুয়েসনের (re-valuation) জন্য সেখানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার নিজের আফিসে ঠিক সেই সময়ে দ্বিতীয় কেরাণীর পদ খালি হইয়াছিল, তাহাতে মাসিক বেতন ছিল চল্লিশ টাকা। সত্বর দার্জ্জিলিং যাইয়া সেই কাজটী গ্রহণ করিবার জন্য ভবতোষ বাবু আমাকে পত্র লিখিলেন। এই পত্র পাইয়া যে কি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা আর কি বলিব। বাঙ্গালী জীবনের তৎসাময়িক চরম উচ্চাভিলাষ ডেপুটীগিরির মরীচিকা হইতে একেবারে চার টাকা বেতনে গোপনন্দনের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া জীবনের আশাভরসা, উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি একেবারেই লোপ পাইয়াছিল। এইরূপ সময়ে চল্লিশ টাকা বেতনের কেরাণীগিরি যে কি উপাদেয় পদার্থ, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কেহ বুঝিবে না।

ভবতোষ বাবুর আদেশক্রমে ভবানীপুরের বাবু অবিনাশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট হইতে ভবতোষ বাবুর কয়েকটী জিনিষ সঙ্গে লইয়া দিগনগরে ফিরিয়া আসিলাম। অবিনাশ বাবু তখন রাজসাহী বিভাগের কমিশনার আফিসের একাউণ্ট্যাণ্ট ছিলেন। নিজের যোগ্যতাগুণে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। দার্জ্জিলিং যাইবার এবং দার্জ্জিলিংয়ে কিরূপভাবে বাস করিতে হইবে সদাশয় অবিনাশবাবু আমাকে সেই সকল

উপদেশ দিয়াছিলেন। আমি দিগনগরে উপস্থিত হইয়া জননী, পিতৃব্য, পিতৃব্যপত্নী এবং অন্যান্য গুরুজনবর্গের পদ বন্দনা করিয়া চল্লিশ টাকা বেতনের চাকরী পাইবার সংবাদ দেওয়ায় সকলেই মহা আনন্দ প্রকাশ করিলেন। দুই তিন দিন বাটীতে থাকিয়া সামান্য বিছানা, বালিস এবং শীতবস্ত্র, পাথেয়স্বরূপ কয়েকটী টাকা পিতৃব্যের নিকট হইতে লইয়া দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলাম। সে সময় দার্জ্জিলিং যাইবার জন্য রেলপথ নির্ম্মাণ হয় নাই। সুতরাং সাহেবগঞ্জ, কাড়াগোলা, পূর্ণিয়া, কৃষ্ণগঞ্জ এবং শিলিগুড়ি, কর্‌সিয়ং প্রভৃতি স্থান দিয়া সেই সময়ের প্রচলিত পথে কখন রেল, কখন ষ্টীমার, কখন এক্কা এবং সর্ব্বশেষে অশ্বারোহণে চারি-দিনে দার্জ্জিলিং উপস্থিত হইয়া প্রথমে কয়েকদিন ভবতোষ বাবুর বাসাতেই ছিলাম, তারপর ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের হেড ক্লার্ক গোবর-ডাঙ্গা নিবাসী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে থাকিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তিনি নিঃসন্তান, তিনি ও তাঁহার পত্নী এই দুইজনেই সেখানে থাকিতেন! আমি প্রতি মাসেই আমার খরচের টাকা তাঁহার পত্নীর হাতে দিতাম, তিনিও সন্তাননির্ব্বিশেষে আমাকে বিশেষ যত্নে রাখিয়াছিলেন। এইরূপে কেরাণীগিরিপদে থাকিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত আমার নির্দ্দিষ্ট কাজগুলি ব্যতীত প্রধান কেরাণীর কাজ এবং হাকিম যেসকল হুকুমাদি লিখিতেন তাহাও শিক্ষা করিতাম। দুই তিন মাস পরেই রোডসেস্ কমিটী এবং মিউনিসিপালিটীর (Joint office) জয়েণ্ট আফিসের একাউণ্ট্যাণ্টের পদ খালি হওয়ায় ভবতোষ বাবুর সুপারিসে

ডেপুটী কমিশনার এড্গার সাহেব (পরে Sir John Edgar) আমাকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন এ ডবলিউ পল (A. W. Paul Esq. I. C. S.) নামক একটী তরুণ সিভিলিয়ান। আমার পদের বেতন ছিল নব্বই টাকা। কিন্তু অতি তুচ্ছ অপরাধে কখন ২৲, কখন ৫৲ জরিমানা করিতেন, মোটের উপর মাসে পঞ্চাশ টাকার অধিক পাইতাম না। আবার তাহার উপর Stupid, Nonsense প্রভৃতি অভিধানে আমাকে সম্ভাষণ করিতেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোন সিভিলিয়ানের অধীনে চাকরী করি নাই। আফিসের কর্ত্তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার কায়দা কানুন শিখি নাই। মেজাজ এবং রক্ত খুবই গরম ছিল, সংসারের ভার মাথায় পড়ে নাই, সুতরাং সাহেবের সঙ্গে সমান উত্তর করিতাম। একদিন কহিলেন—Am I to open a lunatic asylum for you here ? অর্থাৎ, 'তোমার জন্য কি এখানে একটা পাগলা গারদ খুলিতে হইবে ?' আমি সেই-দিনই ইস্তফা দিয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া দার্জ্জিলিং পরিত্যাগ করিলাম। আফিসের কেরাণী সম্প্রদায় এবং সকলে আমার কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, কেহ কেহ বলিল লোকটা হয় পাগল, নতুবা ঘরে খাবার আছে, নচেৎ এমন চাকরীটী এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা অনায়াসে ত্যাগ করা সহজ নহে। সেই সময় সারাঘাট হইতে জলপাইগুড়ি পর্য্যন্ত রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছিল, দুই একখানি ট্রেণও চলিতেছিল। আমি দার্জ্জিলিং হইতে জলপাইগুড়ি পর্য্যন্ত গোযানে আসিলাম, সূর্য্যোদয়ের কিছু

পূর্ব্বেই ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম সেই সময় নানা শ্রেণীর যাত্রীপূর্ণ (অধিকাংশই কুলী) চারি পাঁচখানি প্যাসেঞ্জার গাড়ী এবং অন্যূন ৬০।৬৫ খানি নানা আকারের ঢাকা ও খোলা মনুষ্য, জীব, কাঠ, কয়লা আদি বোঝাই মালগাড়ী পুচ্ছে বাঁধিয়া দুইখানি ইঞ্জিন ধূম উদ্গিরণ করিতেছে। ষ্টেশনের বাবুদের জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ট্রেণখানি পদ্মানদী তীরবর্ত্তী লাইনের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত সারাঘাট নামক স্থানে যাইতেছে। আমি সেই ট্রেণে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁহারা কহিলেন যে, রাত্রিকালে অনিশ্চিত সময়ে ট্রেণ সেখানে উপস্থিত হইবে। ট্রেণ হইতে নামিয়া কোন স্থানে রাত্রি অতিবাহিত করিবার ঘর নাই, আহার্য্য ক্রয় করিবার দোকান নাই, শীতকালে মহা কষ্টে থাকিতে হইবে। উপদেশ দিলেন, দিবাভাগটা জলপাইগুড়ি সহরের মধ্যে যাইয়া কোন স্থানে কাটাইয়া সন্ধ্যার ট্রেণে যাইলে প্রত্যূষে সারাঘাট পৌঁছিতে পারিব এবং সঙ্গে সঙ্গেই ষ্টীমার যোগে পদ্মা পার হইয়া অপর পারে দামুকদিয়া নামক স্থানে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলের গাড়ী ধরিয়া বেলা ১২টা-১টার মধ্যে বাটীতে পৌঁছিতে পারিব। তখন পদ্মানদীর উত্তর দিকের রেলের নাম ছিল "নর্দার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট্ রেলওয়ে।" বাবুদের এই পরামর্শ বেশ সমীচীন বিবেচনা হওয়ায় আমার বিছানা বালিস প্রভৃতির বাণ্ডিল, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি তাঁহাদের নিকট রাখিয়া একটু দূরবর্ত্তী জলপাইগুড়ি সহরে প্রবেশ করিলাম।

সে সময় জলপাইগুড়িতে দুই একটী শিবের মন্দির ব্যতীত

পাকাবাড়ী বা পাকা রাস্তা একটীও ছিল না। তক্তা বা বাঁশের মাচানের উপর খড়ের ছাউনী ঘরে সরকারী আফিস বসিত। অফিসারবর্গও সেইরূপ ঘরে বাস করিতেন। নানাস্থানে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম রাস্তার ধারে একটী ঐরূপ ঘরের ভিতর কয়েকটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক বসিয়া চা পান করিতেছেন। একজন একটী সেতার লইয়া দু একবার ঝঙ্কার দিতেছেন এবং দেখিলাম বাবুরা হাসি তামাসায় ঢেউ খেলাইয়া বেশ একটু আমোদে আছেন। ভাবিলাম, এই স্থানেই প্রবেশ করিতে হইবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ, ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয় আসিতে পারি কি?" সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডা লাগিয়া চা খাইবার ইচ্ছাও হইয়াছিল। এই স্থানে উল্লেখ প্রয়োজন যে, দার্জ্জিলিং অবস্থিতি কালেই প্রতিদিন অন্ততঃ এক পেয়ালা চা পান অভ্যাস হইয়াছিল। হঠাৎ দুয়ারে একটী অপরিচিত মনুষ্য মূর্ত্তির আবির্ভাব দেখিয়া সকলেই একেবারে নিস্তব্ধ, হাতের পেয়ালা হাতে করিয়া সকলেই আমার মুখের দিকে তাকাইলেন। সেতার-বাদক যন্ত্রটি নামাইয়া রাখিলেন। দুই এক মিনিট পরে একজন কহিলেন, "আসুন, চা ইচ্ছা করেন কি?" আমি সম্মতি জানাইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে ঘরে প্রবেশ করিয়া কম্বলাচ্ছাদিত মাচানের উপরে বসিলাম, হিন্দুস্থানী চাকর গরম গরম এক পেয়ালা চা লইয়া আসিল। আহা, সেই চা কি উপাদেয়ই বোধ হইয়াছিল! চায়ের পেয়ালায় এক একটী চুমুক দিতে দিতে আত্মকাহিনী সংক্ষেপে আরম্ভ করিবা মাত্রই অন্য

একটী দ্বার দিয়া আমার পূর্ব্বপরিচিত ভবানীপুর নিবাসী বাবু অবিনাশচন্দ্র সেন মহাশয় ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে চিনিয়াই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, দার্জ্জিলিং পরিত্যাগ করিয়া আসিবার কারণ কি? তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপার তাঁহাদিগের গোচর করিলাম। আর চাকরী করিতে ইচ্ছা নাই, হয় দেশে গিয়া চাষ বাস করিব, অথবা থিয়েটারের দলে প্রবেশ করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিব। সকলেই হো, হো, করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সেতার-ধারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের তা'হলে গান বাজনা জানা আছে।" আমি উত্তরে কহিলাম, "অতি সামান্য এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হাত হইতে সেতারটী লইয়া তানপুরার ন্যায় সুর দিয়া প্রাতঃকালের উপযোগী রাগিণীযুক্ত দুই তিনটী শ্যামা সঙ্গীত গাহিলাম। সে সময় বেশ সুকণ্ঠই ছিলাম। স্বর্গীয় হরদেব চক্রবর্ত্তী, নন্দকুমার চক্রবর্ত্তী, রামলাল মোদক প্রভৃতি সুগায়কদিগের গানগুলি দিগনগরে সর্ব্বদা শুনিয়া সঙ্গীতে যৎসামান্য অধিকার জন্মিয়াছিল। কয়েক মাস দার্জ্জিলিংয়ে থাকিয়া ভগবানদত্ত চেহারাটীও বেশ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। সকলেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "ওহে লোকটাকে কোন রকমে এখানে রাখিতে হইবে।" অতি যত্নসহকারে আহারাদি করাইয়া আমায় দার্জ্জিলিংয়ের পোষাক পরাইয়া আফিসে লইয়া গেলেন। এই মেসের বাবুদের মধ্যে তিনজন কমিশনার আফিসের এবং দুইজন পি, ডবলিউ বিভাগে কাজ করিতেন। অবিনাশ বাবু এবং কমিশনার আফিসের অন্য দুইটী বাবু আমাকে তাঁহাদের আফিসে লইয়া

গিয়া কমিশনারের পার্সন্যাল য়্যাসিণ্ট্যাণ্ট মিঃ জে, এ, ক্রেভেন (Mr. J. A. Craven) সাহেবের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন এবং আফিসে কোন একটা চাকুরী দিয়া আমাকে রাখিবার জন্য অবিনাশ বাবু বিশেষ অনুরোধ করিলেন। অবিনাশ বাবু নিজে একখানি দরখাস্ত লিখিয়া দিলেন ; মিঃ ক্রেভেন তাহার উপরে লিখিলেন—The applicant looks respectable, has got a fair knowledge of English and some experience of office wark. He may be appointed to act for the Court of Wards Head Clerk, who has applied for three months' leave on medical certificate. অর্থাৎ, দরখাস্তকারীকে ভদ্রঘরওয়ালা বলিয়া বোধ হইতেছে ; ইংরাজীতে একরকম দখল আছে। এবং আফিসের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞান আছে। কোর্ট অফ ওয়ার্ডের হেড ক্লার্ক ডাক্তারের সার্টিফিকেট সহ তিন মাসের বিদায় প্রার্থনা করিয়াছেন ; দরখাস্তকারীকে সেই পদে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এই দরখাস্তখানির সঙ্গে আমার যে দুই চারিখানি সার্টিফিকেট ছিল, তাহা গাঁথিয়া নিজেই কমিশনার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করিয়া দরখাস্ত দাখিল করিতে সকলে উপদেশ দিলেন। অবিনাশ বাবু বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে সাহেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার সময় যেন "Sir" শব্দটী ব্যবহার না করিয়া "My lord" (মাই লর্ড) বলিয়া সম্বোধন করি। কারণ, কমিশনার ছিলেন, Lord H. Ulick Brown (লর্ড ইউলিক ব্রাউন)। ইনি আয়র্ল্যাণ্ডের মারকুইস অফ স্লাইগোর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। নগদ

কিছু অর্থ ব্যতীত ভূসম্পত্তি কিছুই ছিল না। সেইজন্য হ্যালিবরি কলেজ হইতে ভারতবর্ষীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া প্রথমে য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন। আমি আফিস হইতে বাহির হইয়া দুর্গানামের সঙ্গে কেবল 'মাই লর্ড', 'মাই লর্ড' মুখস্থ করিতে করিতে আফিসের প্রায় সিকি মাইল দূরে কমিশনারের বাসায় উপস্থিত হইলাম। কার্ড পাঠাইয়া দিবা মাত্র ডাক পড়িল। উপস্থিত হইয়াই প্রায় ভূমি স্পর্শ করিয়া সেলামান্তর বেশ খাড়া হইয়া দাঁড়াইলাম। সাহেব কি একটা লিখিতেছিলেন, দু'তিন মিনিট পরে মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়াই কহিলেন, "What you want ?" (কি চাও ?) উত্তরে কহিলাম, "I have come to pay my respects to your lordship !" (আপনার লর্ড-সিপকে সম্মান দেখাইতে আসিয়াছি।) সাহেব কহিলেন, "Is that all ?" (কেবল এইজন্যই আসিয়াছ ?) আমি কহিলাম, "and to submit this application" (এবং এই দরখাস্তখানি দিবার জন্য।) সাহেব একটু হাসিয়া কহিলেন, "I see." (বুঝিলাম।) তারপর আমার দরখাস্ত, ক্রেভেন সাহেবের সুপারিস প্রভৃতি পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "Where do you come from ?" (তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?) আমি কহিলাম, দার্জ্জিলিং হইতে। একটু বিরক্তির ভাব দেখাইয়া কহিলেন, "I ask where is your native home ?" (আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার বাড়ী কোথায় ?) আমি

কহিলাম, জেলা নদীয়ার অন্তর্গত দিগনগর গ্রামে। এই কথা শুনিয়া একটু চিন্তার পর কহিলেন, "Dignagar, midway between Krishnagar and Santipore?" (কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরের মাঝামাঝি সেই দিগনগর?) উত্তর করিলাম, 'আজ্ঞে হাঁ।' জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাদব চক্রবর্ত্তীকে জান?" উত্তর—"আজ্ঞে, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।" সাহেব আর একবার আমার দিকে বেশ ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাদব কেমন আছে?" আমি কহিলাম, অনেকদিন পূর্ব্বে তিনি স্বর্গলাভ করিয়াছেন। ইহার পর আর কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়া, ক্রেভেন সাহেবের সুপারিসের নীচে মাত্র "approved" (মঞ্জুর) লিখিয়া কহিলেন, "যাও, ভাল করিয়া কাজ কর।" পরে শুনিয়াছিলাম, যখন সাহেব বাহাদুর নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন সেই সময় পিতৃদেব তাঁহার অধীনে চাকরী করিয়াছিলেন। চাকরী পাইয়া মনের উল্লাসে আফিসে ফিরিয়া প্রথমে অবিনাশ বাবু, পরে ক্রেভেন সাহেবকে সেলাম করিয়া কমিশনারের হুকুম দেখাইলাম। তিন চারি দিন পরে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের হেড ক্লার্ক বাবু বিদায় লইয়া যাওয়ার পর আমি তাঁহার স্থান অধিকার করিলাম। অবিনাশ বাবু অতি যত্নসহকারে আমাকে কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা দিতে লাগিলেন; আমার অনেক কঠিন কঠিন কাজ নিজেই করিয়া দিতে লাগিলেন। সাহেব বাহাদুর হাতের লেখা খুব পছন্দ করিতেন। সময় সময় বড় বড় ড্রাফ্‌ট নকল করিবার জন্য আমার নিকট পাঠাইতেন,

হুকুম থাকিত "Jogendra to copy on half margin in half an hour" (যোগেন্দ্র কাগজের অর্দ্ধভাগে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে নকল করিয়া পাঠাও।) আমিও ঘড়ির দিকে চাহিয়া কুড়ি পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই পরিষ্কাররূপে নকল করিয়া পাঠাইতাম। এইরূপে তেইশ দিন গত হইলে আঁফিসের রেভিনিউ পেস্কারের পদ খালি হইল। অনেকগুলি পুরাতন কেরাণী এই পদের প্রার্থী হইলেন। কিন্তু কমিশনার বাহাদুর আমাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিলেন। অবিনাশ বাবু, সালকিয়া নিবাসী (বড়) শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, গুপ্তিপাড়া নিবাসী (ছোট) শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকগুলি কেরাণী মহা আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এই দায়িত্বপূর্ণ কাজটী কিরূপভাবে নির্ব্বাহ করিতে হইবে সর্ব্বদা তাহার উপদেশ দিতেন। একটু গান বাজনা, গল্প বলা প্রভৃতি অভ্যাস থাকায় সন্ধ্যার পর প্রতিদিনই আমাদের বাসায় বেশ একটা মজলিস বসিতে লাগিল। এইভাবে দুই তিন মাস অতিবাহিত হইবার পরে আগুন লাগিয়া কমিশনার এবং ডেপুটী কমিশনারের আফিস, প্রায় সমস্ত কাগজ পত্র ও আসবাব ভস্মসাৎ হইয়া গেল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, যে সেই সময় সমস্ত বাংলো আফিস ও ছোট বড় সকলেরই বসতবাটী তৃণ, কাষ্ঠ, বাঁশ দ্বারা নির্ম্মিত ছিল। অনেক কষ্টে আফিসের কতক কাগজ রক্ষা হইয়াছিল। কোন দুষ্ট প্রকৃতি বদমায়েস কর্ত্তৃক আফিসে অগ্নি সংযোগ হইয়াছিল এই সন্দেহে তাহাকে ধরিয়া দেওয়ার জন্য পাঁচশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইল; কিন্তু কোন ফল

হইল না। অতঃপর আমাদের আফিস অবিলম্বে দার্জ্জিলিং লইয়া যাইবার আদেশ হইল। আমরাও তল্পি তল্পা গুছাইয়া দার্জ্জিলিংয়ে উপস্থিত হইয়া একটী মেসের বাসায় পূর্ব্বের ন্যায়ই চালাইতে লাগিলাম। আমাদের মেসে বড় শশী বাবু, হরদয়াল বাবু, আমি এবং আর একটী যুবক (নাম মনে নাই) গান বজনায় একটু নিপুণ ছিলাম বলিয়া প্রায় প্রতি শনিবারেই এক এক জায়গায় আমাদের নিমন্ত্রণ হইত। তার মধ্যে ভবতোষ বাবুই অগ্রণী ছিলেন। এইরূপে দুই তিন মাস গত হইলে আমি কঠিন আমাশয় পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলাম। মহামতি লড ইউলিক ব্রাউন এই সংবাদ শুনিয়া সত্বর সরকারী হাঁস-পাতালের একটী ভাল ঘরে আমাকে উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য অবিনাশ বাবুকে উপদেশ দিলেন। আদেশ কার্য্যে পরিণত হইলে, ডাক্তার সাহেব ও য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন অতি যত্ন সহকারে আমার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। ভবতোষ বাবু ও রাজকৃষ্ণ বাবুর পত্নী অতি যত্ন সহকারে নানাবিধ সুপথ্য প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেন। রোগ একটু আরোগ্য হইল; কিন্তু শরীর একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। আফিস পুড়িয়া যাওয়ায়, কাগজপত্র গুছাইয়া, ডিপার্টমেণ্ট ভেদে আলমারীতে লেবেল লাগাইয়া সাজাইয়া রাখিবার জন্য কেরাণীবর্গকে দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে হইতেছিল। আমার জায়গায় একটী লোক নিযুক্ত করা প্রয়োজন হওয়ায় কমিশনার বাহাদুর মিঃ ক্রেভেন সাহেবের দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন :—"যোগেন্দ্রকে বল ছুটী লইয়া দেশে চলিয়া যাউক,

আমি শীঘ্রই তাহাকে নীচের কোন জেলায় একটী চাকরী দিব।” এই আদেশ পাইয়া একটু সবল হইবার পর দেশে চলিয়া আসিলাম। বাটীতে মাতাঠাকুরাণী এবং অন্যান্য সকলের শুশ্রূষা-যত্নে অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নীরোগ হইয়া উঠিলাম। পত্নী সে সময় শান্তিপুর পিত্রালয়ে ছিলেন। শ্বশুরবাড়ী যাইয়া কিছুদিন থাকিবার জন্য শ্বশুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিগনগরে আসিয়া খুড়ামহাশয়ের অনুমতি লইয়া আমাকে শান্তিপুর লইয়া গিয়াছিলেন। শ্বশুরবাড়ীর আদর যত্ন বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন, সে আদর যত্নের কথা লেখা বাহুল্য মাত্র। তবে সেই আদর যত্নের সঙ্গে শ্বশ্রূঠাকুরাণী প্রতি-দিনই বলকারক সুপথ্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন। সেই সময় গঙ্গায় জেলেরা নানাবিধ মাছ ও সেই সঙ্গে নানাজাতীয় কচ্ছপ ধরিয়া আনিত। তাহার মধ্যে সুখাদ্য কচ্ছপ বাছিয়া লইয়া সেই কচ্ছপের ঝোল আমাকে সেবন করাইতেন; খাঁটী গরম দুগ্ধ, মাখন, ঘোল, ওল, মানকচু, গর্ভমোচার তরকারী, কই, মাগুর সিঙ্গি, বাইন, মৌরলা প্রভৃতি মাছের তরকারী প্রস্তুত করিয়া দিতেন। পত্নী হেমাঙ্গিনী ক্রীতদাসীর ন্যায় সেবা করিতে লাগিলেন। শান্তিপুর একটী প্রকাণ্ড সহর। পাড়ার এবং অন্য পাড়ার অনেকগুলি যুবকের সঙ্গে সর্ব্বদা বেড়াইতাম, সন্ধ্যার সময় গান বাজনা, গল্পগুজব, হাস্য পরিহাসে দিনগুলা বেশ কাটিতে লাগিল; শরীরের পূর্ব্ব লাবণ্য, মনের স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে ফিরিয়া আসিল।

এইভাবে দেড়মাস অতিবাহিত হইলে কমিশনার বাহাদুর আমাকে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে কানুনগো পদে নিযুক্ত করিয়া নিয়োগ-পত্র প্রেরণ করিলেন। অবিলম্বে পাবনায় যাইয়া কালেক্টর মিঃ কেলেহার (Mr. Kellehar) সাহেবকে কমিশনারের পত্র দেখাইলাম। তিনিও কমিশনারের পত্র পাইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নৌকাযোগে সিরাজগঞ্জ উপস্থিত হইয়া একটী মেসের বাসায় উঠিলাম। সেই মেসের মেম্বর ছিলেন শ্রীরাম মৈত্রেয়, সাব ডেপুটী কালেক্টর, অম্বিকাচরণ হালদার, হেড ক্লার্ক, এবং স্কুলের হেড পণ্ডিত কানন বিহারী গোস্বামী। আমিও সেই দলে প্রবিষ্ট হইলাম। কাননবিহারী অতি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, তাঁহার সহিত অতি সহজেই বেশ ঘনিষ্ঠতা হইল। সন্ধ্যার পর প্রায়ই গান বাজনা হইত।

আমি যে সময় কানুনগো পদে সিরাজগঞ্জ গিয়াছিলাম তখন মিঃ ব্রেট (Mr. Brett) সবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন। ইনি অতি ধীর প্রকৃতি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্থানান্তরে বদলী হওয়ায় মিঃ হ্যাগার্ড (Mr. Haggard) নামক একটী উগ্র-প্রকৃতি সিভিলিয়ান যুবক তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। ইঁহার কঠোর ও অভদ্র ব্যবহারে আমরা সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। রাজকার্য্যে প্রায় সর্ব্বদাই আমাকে বাহিরে যাইয়া সার্ভে, ভূমি সংক্রান্ত মোকর্দ্দমার তদন্ত, খাসমহলের প্রজাদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় এবং নানাবিধ তদন্ত করিতে হইত।

আমাদের গ্রামের বরদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সেই সময় সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সাহাজাদপুর পরগণার নায়েব ছিলেন। কলিকাতার মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এই পরগণার অধিকারী ছিলেন। সময় সময় সাহাজাদপুরে যাইয়া দুই একদিন বরদা প্রসাদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া আসিতাম। ক্রমে হ্যাগার্ড বাহাদুরের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া কমিশনার বাহাদুরকে লিখিলাম যে সিরাজগঞ্জের জলবায়ু আমার সহ্য হইতেছে না, আমাকে পুনরায় আপনার আফিসে কোন কাজে নিযুক্ত করা হউক। উত্তরে তিনি লিখিলেন, "তোমাকে ভাল চাকরীই দিয়াছিলাম। যাহা হউক, আপাততঃ মাসিক ৫০৲ বেতনে একটী অস্থায়ী চাকরী খালি আছে ; ইচ্ছা থাকিলে সত্বর আসিয়া কাজে নিযুক্ত হইবে।" কালবিলম্ব না করিয়া প্রথমে একবার দিগনগর যাইয়া, তারপর রাজসাহী জেলার সদর রামপুর বোয়ালিয়ায় উপস্থিত হইয়া পুনরায় কমিশনার আফিসে প্রবিষ্ট হইলাম। কমিশনারের আফিস সে সময় শীতের দিনে রামপুর বোয়ালিয়ায় এবং গরমের সময় দার্জ্জিলিংয়ে থাকিত। এই রামপুর বোয়ালিয়াতেই আমি স্থায়ীরূপে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হই এবং এই স্থানেই অনেকদিন অবস্থিতি করিয়া অনেকগুলি ভাল ভাল লোকের সহিত পরিচিত হইয়া নানারূপ আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইয়াছিলাম। পর পরিচ্ছেদে সেই সকল বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলের নাটোর ষ্টেশন হইতে ১৪ ক্রোশ পশ্চিমে পদ্মা নদীর উত্তর তীরে (left bank) রামপুর বোয়ালিয়া নগর অবস্থিত। সহরের দক্ষিণ ভাগ অনেকটা গ্রাস করিয়া পদ্মা নদী সে সময়ে সহরের নিম্ন ভাগ দিয়া প্রবাহিত ছিল। আমি রামপুরে উপস্থিত হইয়া প্রথমে হাতিশালা নিবাসী স্বর্গীয় কালীকুমার বসু মহাশয়ের বাসায় উঠিয়াছিলাম। কালী বাবু সে সময় রাজসাহী জেলার কোন একটী থানায় সব ইন্‌স্‌পেক্টার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র ও পরিবারবর্গ রামপুরে তাঁহাদের নিজের বাটিতে থাকিতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র লালবিহারী আমার দিগনগর স্কুলের সহপাঠী ও বাল্যসখা। তিনি অতি যত্নে আমাকে তাঁহাদের বাটীতে আপাততঃ থাকিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে খুড়ামহাশয় সেই সময়ের একজন প্রধান উকীল বাবু ভুবন মোহন মৈত্রেয় মহাশয়কে তত্ত্বাবধানের জন্য লিখিয়াছিলেন। খুড়ামহাশয় যে সময় নাটোরে মুন্সেফ ছিলেন, সেই সময় ভুবনবাবু কিছুদিন তাঁহার বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত তিনি খুড়ামহাশয়কে বিশেষরূপে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। তাঁহার ন্যায় ধীর, গম্ভীর, সদ্বিবেচক এবং নির্ম্মল চরিত্রের লোক

প্রায় দেখা যায় না। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবামাত্র আমাকে সেই দিনই নিজের বাটীতে উঠাইয়া আনিলেন এবং সমস্ত পরিবারবর্গ অতি আত্মীয় নির্ব্বিশেষে আমাকে আহারাদি করাইতে লাগিলেন। লালবিহারীও অতি নম্র, ধীর, অমায়িক এবং নির্দ্দোষ চরিত্রের লোক ছিলেন। ভুবন বাবু ও লালবিহারী চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের বাটীর খুব নিকটেই মাসিক আট টাকা ভাড়ায় আমার জন্য একটী বাসা ঠিক করিয়া দিলেন।

একমাস পরে কয়েক দিনের বিদায় লইয়া আমি দিগনগর যাইয়া মাতাঠাকুরাণীকে ও পত্নীকে রামপুরে লইয়া আসিলাম। গৃহস্থালীর কাজের জন্য কেবল একটী চাকরাণী ছিল। রন্ধনাদি এবং সাংসারিক অন্যান্য কাজ মাতা ও পত্নীই নির্ব্বাহ করিতেন। সে সময় আমি বেশ হিসাবী ছিলাম, সমস্ত দ্রব্যাদিও খুব সুলভ ছিল। সুতরাং পঞ্চাশ টাকায় আমার বেশ একরূপ গৃহস্থ ভদ্রলোকের ন্যায় চলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু অল্পদিন পরেই আমার অস্থায়ী কেরাণীগিরির সময় উত্তীর্ণ হইবামাত্রই মহামতি লর্ড ইউলিক আমাকে রাজসাহী জেলাতেই কানুনগো পদে নিযুক্ত করিলেন। ঠিক সেই সময় সংবাদ পাইলাম যে খুড়ামহাশয় কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার জন্য শান্তিপুরে নীত হইয়াছেন। অবিলম্বে এক মাসের বিদায় লইয়া সপরিবারে দিগনগর উপস্থিত হইলাম। কিন্তু হায়! আসিয়াই শুনিলাম তিন দিন পূর্ব্বে খুড়ামহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এ যেন একেবারে অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় বোধ হইল। খুড়ামহাশয়ের

পীড়ার সংবাদ পাইয়া দেবেন্দ্র, রাজেন্দ্র এবং খুড়ামহাশয়ের পুত্র ভূপতি, শ্রীপতি, নৃপতি ও শচীপতি সকলেই বাটীতে আসিয়াছিল। খুড়ামহাশয় বর্ত্তমানে সংসারের ভাবনা আমাদিগকে একদিনও ভাবিতে হয় নাই। দ্বাদশ বর্ষ বয়সের সময় আমার পিতৃবিয়োগ হয়, কিন্তু খুড়ামহাশয়ের স্নেহ ও যত্ন পাইয়া আমরা পিতৃশোক ভুলিয়াছিলাম। পিতৃব্যদেবের মৃত্যুতে আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে পিতৃহীন হইয়াছিলাম।

যাহা হউক, শোকাবেগ দমন করিয়া পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার পর কিরূপে সংসার চলিবে, কিরূপে ভূপতি ও তাহার সহোদরদিগের বিদ্যা শিক্ষা হইবে, কয়েকদিন ধরিয়া আমাদের পরিবারের হিতৈষী বন্ধু নন্দকুমার চক্রবর্ত্তী, মথুরা মোহন ঘোষ প্রভৃতি বিজ্ঞ লোকদিগের সহিত আলোচনা হইল। পরে স্থির হইল যে দেবেন্দ্র মাসিক ত্রিশ টাকা এবং আমি মাসিক পনর টাকা করিয়া সংসার খরচ পাঠাইব। জমি জায়গা ও কোম্পানীর কাগজের সুদ হইতে ভূপতিদের লেখাপড়া শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। এই সময়ের দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে দেবেন্দ্র আসাম প্রদেশে মাসিক নব্বই টাকা বেতনে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। রাজেন্দ্র নাথ কলিকাতায় থাকিয়া বারম্বার এল,এ, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইতেছিল। ভূপতি, শ্রীপতি ও তাহাদের ছোট ভাই দুইটীও কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছিল। নন্দকুমার চক্রবর্ত্তী পূর্ব্ব হইতেই আমাদের বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, এখন সমস্ত ভারই তাঁহার

উপর বিশেষরূপে ন্যস্ত করিয়া আমরা আপন আপন কর্ম্মস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

রামপুরে উপস্থিত হইবার কয়েক দিন পরেই আমাকে নাটোরে বদ্‌লি করা হইল। সৌভাগ্যক্রমে পরিবারবর্গকে দিগনগরে রাখিয়া আসিয়া একটী মেসের বাসায় আর কয়েকটী কর্ম্মচারীর সঙ্গে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। কোন ঝঞ্ঝাট না থাকায় একাই নাটোরে যাইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম। মুন্সেফ কোর্টের সেরেস্তাদার স্বর্গীয় দুর্গানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও বাল্যকালে নাটোরে খুড়ামহাশয়ের বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই তাঁহার সহিত আমাদের পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। আমি তাঁহার বাসায় উঠিয়া এক বৎসরকাল তাঁহার পরিবারভুক্ত হইয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ছিলাম।

নাটোরের পরিচয় কাহাকেও দিতে হইবে না। প্রাতঃস্মরণীয় রাণী ভবানীর বংশধরেরা তখন সেখানকার প্রধান জমীদার। বড় তরফের মালিক জগদিন্দ্র নাথ রায় তখন নাবালক, তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে ছিল। ছোট তরফের মালিক ছিলেন রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়। এই দুই ঘর জমিদারই নাটোরে বাস করিতেন। নাটোরের অনতিদূরে দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথ নাথ রায়ের সুরম্য প্রাসাদ ছিল। নাটোরে দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা, নানাজাতীয় মৎস্য সে সময় অতি সুলভ মূল্যে অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যাইত। ছানার সন্দেশ সাত আট রকমের

পাওয়া যাইত। এইরূপ সন্দেশ বোধ হয় আর কোন স্থানেই এরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালীতে প্রস্তুত হইত না। কিন্তু এত সুবিধা সত্ত্বেও নাটোর সে সময় বড়ই অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। আমি প্রায়ই জ্বরে শয্যাগত থাকিতাম, অবশেষে শরীরের এরূপ অবস্থা হইল যে স্থান পরিবর্ত্তনই আরোগ্যের একমাত্র উপায় বলিয়া ডাক্তারেরা মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। আমার রামপুরে অবস্থিতি সময়েই পত্নী অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছিলেন। মাতাঠাকুরাণী খুড়ামহাশয়কে এই সংবাদ দিয়া লিখিয়াছিলেন "ঠাকুরপো, সন্দেশের জন্য কিছু টাকা রাখিও"। পিতৃব্যদেব উত্তরে লিখিয়াছিলেন "বউ, টাকা রাখিলাম, কিন্তু দেখিও যেন পাটালি না দিতে হয়!" ইহার অর্থ, পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই সন্দেশ এবং কন্যা জন্মিলে পাটালি বিতরণ করিবেন। প্রথম পোয়াতি বলিয়া শ্বশুরমহাশয় কন্যাকে এবং পরিবারবর্গকে তাঁহার সেই সময়ের কর্ম্মস্থল (তিনি তখন রংপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত ছিলেন) রংপুরে লইয়া গিয়াছিলেন। সেইখানেই আমার একমাত্র পুত্র প্রমথনাথের জন্ম হয়। আমি সময় সময় রংপুরে যাইয়া তাহাদিগকে দেখিয়া আসিতাম। প্রমথ যখন চারি পাঁচ মাসের সেই সময় আমার শারীরিক অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া উঠিল। তিন মাসের বিদায় লইয়া রংপুর যাইয়া পত্নী ও শিশু পুত্রকে সঙ্গে লইয়া দিগনগরে আসিলাম। বায়ু পরিবর্ত্তন, পুত্রের অন্নপ্রাশন এবং সংসারে সেই সময় যে একটা অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিতেছিল তাহার প্রতিবিধান উদ্দেশ্যেই দেশে আসিয়াছিলাম।

ব্যাপারটী এই যে আমাকে না জানাইয়া পিতৃব্যপত্নী নাবালক পুত্রদের অভিভাবকস্বরূপ সার্টিফিকেট লইয়াছিলেন। পৈতৃক ভূসম্পত্তির অর্দ্ধাংশ, পিতৃব্যদেবের অর্জ্জিত প্রায় দেড়শত বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মত্র ভূমি, ভদ্রাসন বাটী, যাহা সমস্তই পিতার ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার অর্দ্ধাংশ, পিতার অর্জ্জিত তৈজস পত্র ও অন্যান্য আসবাবের অর্দ্ধাংশ, পিতৃব্য অর্জ্জিত তৈজস পত্র, শাল দোশালা, রূপার বাসন, পাল্কি,চেয়ার টেবিল প্রভৃতি সমস্ত এবং, পিতৃব্য যে কয়েক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ (Promissory Notes) ক্রয় করিয়াছিলেন তাহা সমস্ত নিজের নামে ও নাবালক পুত্রদের নামে সার্টিফিকেটভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। গ্রামের প্রাচীনেরা উপদেশ দিলেন, মোকদ্দমা করিয়া সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির তুল্যাংশ গ্রহণ কর। মাতাঠাকুরাণীও সেইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু পিতৃব্যপত্নী ও নাবালক ভাইদের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা করা নিতান্ত অভদ্রের কাজ বিবেচনায়, এবং পিতৃবিয়োগের পর পিতৃব্যদেব যেরূপ স্নেহ যত্নে আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন তাহা চিন্তা করিয়া প্রাচীনদের পরামর্শ আমি গ্রহণ করি নাই। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, "লোকটার বিষয় বুদ্ধি একেবারেই নাই, ডাহা বোকা।" কেহ বা কহিলেন, "মোকদ্দমা করিতে পয়সার দরকার ; পয়সা পাবে কোথায়?" আবার কেহ কেহ বলিলেন, "ভালই করিয়াছে ; সাধু যাদব চন্দ্রের পুত্রদের উপযুক্ত কাজই করিয়াছে ; ভগবান তাহাদের কষ্ট দিবেন না।" এইরূপ

নানাবিধ মন্তব্য চলিতে লাগিল। আমাদের এই ত্যাগ স্বীকার দেখিয়া বৃদ্ধ পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মথুরা মোহন ঘোষ এবং নন্দ-কুমার চক্রবর্ত্তী দুই এক বিন্দু আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। •

ইহার পর কিছুদিন সংসার পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে লাগিল, কিন্তু তাহাও অতি অল্পদিন। একদিন সন্ধ্যার পর আমরা তিন সহোদর ভূপতি, শ্রীপতি ও গ্রামের কয়েকটী যুবক বাহিরের বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া সংসার সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিতেছি এমন সময় পিতৃব্যপত্নী সেখানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "যোগী (আমাকে সকলেই যোগী বলিয়াই ডাকিত) আমি এতদিন সংসারের কর্ত্রী ছিলাম, এখন তোমার মায়ের কর্ত্তৃত্ব আমি সহ্য করিতে পারিব না, আমি পৃথক হইব।" আমরা তাঁহার পায়ে ধরিয়া এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলাম, কিছুতেই তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ হইল না। সার্টিফিকেট লইবার পর হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা পৃথক হইয়াছিলাম, কেবল এক সঙ্গে রন্ধনাদি ও আহারাদি হইত মাত্র। পরদিন হইতে দেখিলাম, পিতৃব্যপত্নী পৃথক রন্ধনশালায় অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইয়া আপন পুত্রদিগকে আহার করিবার জন্য বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন। অপরদিকে পুরাতন রন্ধনশালায় মাতাঠাকুরাণী আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে ডাকিলেন। আমি ও শ্রীপতি বাটীর ভিতর যাইয়া উভয় রন্ধশালায় কি কি ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত

হইয়াছে তাহা প্রথমে দেখিবার জন্য দুই ঘরেই প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, দুই ঘরেই সেদিন বেশ একটু জঁাকজমকের সঙ্গে নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছিল। আমরা দুইজন পরামর্শ করিয়া আমাদের রন্ধনশালায় যে যে ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছিল শ্রীপতিকে তাহার অর্দ্ধেক দিলাম, শ্রীপতিও নূতন রান্নাঘরে যাহা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার অর্দ্ধাংশ আমাদের ঘরে আনিয়া দিল। কহিল "বড়দাদা, ভারি মজা হয়েছে, এখন হতে আমরা অনেক রকম তরকারী দিয়া ভাত খাইব।" আমাদের কাণ্ড দেখিয়া মাতাঠাকুরাণী, খুড়িমাতাঠাকুরাণী এবং উপস্থিত প্রতিবেশীনী মহিলাবর্গ হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে আমরা আপন আপন কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলাম।

বঙ্গাব্দ ১২৮৭ কার্ত্তিক মাসে (ইং ১৮৮০ অক্টোবর) আমরা তিন সহোদর একান্নবর্ত্তী পরিবারের অধিকাংশ অবিভক্ত বিষয় সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া সংসার সমুদ্রে ভাসিলাম। আমার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার মরীচিকা বহুদিন পূর্ব্বে লোপ পাইয়াছিল। আসাম প্রদেশে মাষ্টারী কর্ম্ম গ্রহণ করার পূর্ব্বে দেবেন্দ্র বি,এ, এম,এ এবং বি,এল এই তিনটী পরীক্ষায় এক সঙ্গে উত্তীর্ণ হইয়া সত্বরই একটা মুন্সেফী চাকরী পাইবেন এই আশায় অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াও ভাগ্যদোষে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। বি,এ পরীক্ষার শেষ দিন জপ, তপ সারিয়া পরীক্ষা গৃহে উপস্থিত হইতে কয়েক মিনিট বিলম্ব হওয়ায় সেদিন আর তাহার পরীক্ষা

দেওয়া হইল না। সুতরাং মুন্সেফ হইবার আশা পরিত্যাগ করিয়া মাষ্টারী পদে আসামে চলিয়া গিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ ইউনিভারসিটিতে বিফল মনোরথ হইয়া গ্রন্থকার হইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছিলেন। "ভারত বিজয়" নামক একখানি নাটকও লিখিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন; তাহার অভিনয় কলিকাতার কোন কোন রঙ্গমঞ্চে দুই একদিন হইয়াছিল। কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক পুস্তকই বিক্রয় হইয়াছিল। আসাম প্রদেশে মাষ্টারী গ্রহণ করিবার পর হইতে শ্রীহট্ট, মণিপুর এবং আসামের নানাস্থানের নবদ্বীপযাত্রী নানাশ্রেণীর বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে সর্ব্বদাই দেবেন্দ্রনাথের দেখা সাক্ষাৎ হইত, তাহার ফলে দেবেন্দ্রনাথের মনে প্রগাঢ় বৈষ্ণব ভাব উদয় হইয়াছিল। শৈশব হইতে দেবেন্দ্র অতি ধীর, নম্র প্রকৃতির এবং ন্যায়পরতা ও ধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নাটোরের জলবায়ু আমার একেবারেই সহ্য হয় নাই; সর্ব্বদাই পীড়িত হইতাম। বিদায় শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বে আমাকে পুনরায় রামপুরে বদলী করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কমিশনার বাহাদুরকে লিখিয়াছিলাম। ভগবানের কৃপায় প্রথম হইতেই আমি তাঁহার সুনজরে পড়িয়াছিলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই প্রত্যুত্তর আসিল যে আমার আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে এবং কানুনগো পদে আমাকে রামপুরে বদলী করা হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া কি আনন্দ হইল তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। এই সংবাদ পূর্ব্বোল্লিখিত বাবু

ভুবনমোহন মৈত্রেয়, লালবিহারী বসু, অবিনাশ বাবু প্রভৃতি বন্ধুবর্গ জানিতে পারিয়া, ভুবন বাবুর বাটীর অতি সন্নিকটে মাসিক দশ টাকা ভাড়ায় একটী বাড়ী লইয়া, একেবারে পরিবারবর্গকে লইয়া শীঘ্রই রামপুরে যাইবার জন্য আমাকে তিন চারিখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আমিও কাল বিলম্ব না করিয়া মাতাঠাকুরাণী, পত্নী ও পুত্র প্রমথনাথকে লইয়া রামপুর যাত্রা করিলাম। রামপুরে আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবার প্রায় তিনমাস পরে, পদ্মা তীরবর্ত্তী রামপুর হইতে প্রায় ১৬ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে নওসারা সুলতানপুর নামক একটী বৃহৎ খাস-মহালের জরিপ জমাবন্দী প্রস্তুত করিবার আদেশ পাইলাম। এই কাজে প্রায় চার পাঁচ মাস মফঃস্বলে থাকিতে হইবার সম্ভাবনা থাকায় পরিবারবর্গকে দিগনগরে রাখিয়া আসিয়া তাহার পর মফঃস্বল যাত্রা করিলাম। নওসারা সুলতানপুরের সংলগ্ন বিলমাড়িয়া নামক গ্রামে আমার ক্যাম্প হইল। সঙ্গে চেনম্যান, চাপরাসী প্রভৃতি চারি পাঁচ জন ছিল। সেই সময় (Messrs Watson Co.) অয়াটসন কোম্প্যানীর সেখানেপ্রবল প্রতাপ। অনেক জমিদারী, অনেকগুলি নীলকুঠী। বিলমাড়িয়ায় তখন প্রধান কুঠী এবং আফিস। আমা অপেক্ষা দুই এক বৎসরের বড় মিঃ হেস্ (Mr. Hays) নামক একটী অবিবাহিত যুবক সেই সময় সেখানকার ম্যানেজার। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সহিত বেশ ঘনিষ্ঠতা হইল। সন্ধ্যার সময় প্রায়ই তাঁহার সহিত দুই ঘণ্টা কাটাইতাম। বিলাতের গল্প, আমার দেশের গল্প, খবরের

কাগজ পড়া এবং সেই সঙ্গে এক একটু পানদোষও ঘটিতে লাগিল। পদ্মার চরে নানাজাতীয় বন্য হাঁস, নানাজাতীয় চা পাখী, চকাচকি, সারস (Swan) সহস্র সহস্র থাকিত। শিকারের ভয়ানক বাতিক ও অভ্যাস থাকায় প্রায়ই অনেক পক্ষী শিকার করিয়া আনিতাম, এবং সাহেবকেও দুই চারিটা পাঠাইয়া দিতাম। আমার গুলি বারুদ ফুরাইয়া গেলে সাহেব পাঠাইয়া দিতেন। দিনের বেলায় গব্য ঘৃত, নানাপ্রকার মাছের তরকারী, খাঁটী দুগ্ধ প্রায় তিন পোয়া ক্ষীরের ন্যায় জ্বাল দিয়া অতি সুন্দর মিহি চাউলের সঙ্গে আহার এবং রাত্রিকালে শিকার লব্ধ পক্ষী মাংসের কাবাব, কারি প্রস্তুত করিয়া অতি পরিপাটী এবং সুচারু-রূপে আহারের গুণে আমার দেহের লাবণ্য একেবারে ফিরিয়া গিয়াছিল। পাবনা জেলা নিবাসী একটী ব্রাহ্মণ চাপরাসী রূপে আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি খুব সুদক্ষ পাচক ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন মৎস্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ অতি উপাদেয় তরকারী প্রস্তুত করিতেন। আমাদের দেশে সেরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালীর মৎস্য রন্ধন কোথাও দেখি নাই। বিলমাড়িয়া নিবাসী নীলকুঠীর একজন জমাদারের একমাত্র পুত্র জগদান সিং আমার সহিত প্রথমে শিকারে বাহির হইত; পরে আমার নিকট দিন রাত্রি থাকিয়া চাকরের ন্যায় সমস্ত কাজ নির্ব্বাহ করিত। ক্রমে জগদান শিকার করিতে এবং গান বাজনা ও শিক্ষা করিতে লাগিল। আরও কয়েকটী পল্লীবালক তাহার সঙ্গে জুটিল। মাঠে জরিপ করিবার সময়ও তাহারা সঙ্গ ছাড়িত না। রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন

পিপাসা পাইত। সেই সময় আমার এই বালকসৈন্যের দল দৌড়াইয়া কৃষকদের নিকট হইতে তরমুজ, শসা, ইক্ষু প্রভৃতি চাহিয়া আনিত। তাহারাও সময় সময় আপনা হইতেই প্রচুর পরিমাণ ফলমূল উপহার দিত। আমার বালকসৈন্যগণকে লইয়া, পদ্মাতীরে গাছের ছায়ায় বসিয়া, পরম আনন্দে সেইগুলি উপভোগ করিতাম। এইভাবে প্রায় তিন মাস অতিবাহিত হইবার পর সংবাদ পাইলাম মাতাঠাকুরাণী কঠিন পীড়ায় শয্যাগত। কয়েকদিনের বিদায় লইয়া অবিলম্বে দিগনগর যাত্রা করিলাম। কিন্তু আমি বাটীতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি দিব্যধামে গমন করিয়াছিলেন। তিনি যে এই বয়সেই (তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বোধ হয় বায়ান্ন তিপ্পান্ন বৎসরের অধিক হয় নাই) পরলোক গমন করিবেন তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। মনে হইল ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে অকাল মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিতাম। তখন যেস্থানে ছিলাম সে স্থানটী অতীব স্বাস্থ্যকর। পীড়ার প্রারম্ভেই তাঁহাকে এবং পত্নী ও পুত্রকে বিলমাড়িয়ায় আনিয়া রাখিলে বোধ হয় বাঁচাইতে পারিতাম। যে অর্থের দ্বারা জীবহত্যার উপকরণ ক্রয় করিয়াছিলাম, যে অর্থে বালক ভোজন হইতেছিল, সেই অর্থের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা শুশ্রূষাদির ব্যয় অনায়াসেই নির্ব্বাহ হইত। অনুতাপে ও আত্মগ্লানিতে পুড়িয়া কতিপয় মাত্র মুদ্রা সম্বল করিয়া দিগনগরে যাইয়া পারলৌকিক ক্রিয়া, ব্রাহ্মণ ভোজনাদি নির্ব্বাহ করা হইল। বলা বাহুল্য যে পত্নীর কয়েকখানি অলঙ্কার বন্ধক দিয়া

প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা হইয়াছিল। মাতার মৃত্যুকালে পরম ধার্ম্মিক মাতৃভক্ত দেবেন্দ্র উপস্থিত থাকিয়া অকাতর পরিশ্রমে তাঁহার চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিল। রাজেন্দ্র সে সময় আসাম প্রদেশে গোয়ালপাড়ায় শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

শ্রাদ্ধাদি সমাধান্তে পুনরায় বিলমাড়িয়ায় আসিয়া জরীপ জমাবন্দীর কাজ এক মাসের মধ্যেই সমাধা করা হইল। রাম-পুরে ফিরিয়া পৃথক বাসা না করিয়া বিপিন বাবু, অবিনাশ বাবু, অতুলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, বঙ্কুবিহারী মল্লিক এবং হরিমোহন মল্লিকের সঙ্গে এক মেসে কিছুদিন থাকা হইল। বিপিন বাবু ও অবিনাশ বাবুর পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। অতুলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী ছিলেন কলেজের একজন প্রফেসার; বঙ্কুবিহারী মল্লিক ছিলেন অবিনাশ বাবুর ভায়রাভাই, ইনি কবিরাজি ব্যবসায় করিতেন। হরিমোহন মল্লিকও অবিনাশ বাবুর ভায়রাভাই এবং আবগারি আফিসে সে সময় কেরাণী পদে নিযুক্ত ছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি অবিনাশ বাবু কয়েক বৎসর পরেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। বিপিন বাবু পরে কটকের র‍্যাভেন্‌স কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছিলেন। অতুল বাবু বিলাত যাইয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া Cirencester Collegeএ কৃষি বিভাগের কাজ করেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। হরিমোহন আবগারি বিভাগের সব ইনস্‌পেক্টারী পদে

উন্নীত হইবার কিছুদিন পরেই কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে পরলোক গমন করেন। ইনি অতি আমোদপ্রিয়, সরল-হৃদয় এবং স্পষ্টবক্তা লোক ছিলেন। এই সকল ব্যক্তি ব্যতীত ডাঃ চন্দ্রনাথ চৌধুরী, ডাঃ কেদারেশ্বর আচার্য্য, ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ বাগচি, ডাঃ কেশবলাল, বাবু বসন্তকুমার চৌধুরী উকিল, শ্যামা চরণ মজুমদার উকিল, যোগেশ চন্দ্র বাগচি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের ম্যানেজার, কালী প্রসন্ন দত্ত কোর্ট সবইনসপেক্টার, দীনবন্ধু ভৌমিক সবইনসপেক্টার (ইনি পরে পুলিসের সুপারিণ্টেডেণ্ট হইয়া রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছিলেন), গৌরাঙ্গ সরকার কালেক্টারীর সেরেস্তাদার প্রভৃতি অনেকগুলি গণ্যমান্য ভদ্র-লোকের সঙ্গে নানাবিধ আমোদ প্রমোদে কয়েক বৎসর বেশ কাটাইয়াছিলাম। তবে সেই সময় উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অনেকেই মদ্যপায়ী ছিলেন ; উপপত্নী রাখা এবং তাহাদের বাড়ীতে যাইয়া বন্ধুবান্ধব সহ আমোদ প্রমোদ করা যেন বেশ একটা বড় মানুষীর অঙ্গ ছিল। আমি স্বভাবতঃই আমোদ প্রিয়, সে সময় গান বাজনাও বেশ একটু অভ্যাস ছিল ; সুতরাং এই দলে সময় সময় মিশিয়া কোন কোন দিন সমস্ত রাত্রিই কাটাইয়া সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে বাসায় ফিরিতাম। বিপিন বাবু, অবিনাশ বাবু ক্রমে এই বিষয় জানিতে পারিলেন এবং শীঘ্রই পরিবারবর্গকে আনিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অগত্যা আমি কয়েকদিনের বিদায় লইয়া পত্নী, শ্বশ্রূঠাকুরাণী এবং প্রমথকে রামপুরে আনিয়া প্রথমে পরম সুহৃদ ভুবন বাবুর বাসায় কিছুদিন থাকিবার পর

মাসিক দশ টাকায় সদর রাস্তার উপর ঘোড়ামারা নামক পাড়ায় একটী দোতালা বাড়ী লইয়া বাস করিতে লাগিলাম। কানুনগো চাকরীতে প্রায়ই বাহিরে যাইতে হইত। যে কয়দিন সদরে থাকিতাম সে কয়টা দিন দিবাভাগে আফিসের কাজে এবং রাত্রি-কালে সেই পানাসক্ত বাবুদের সঙ্গে মিশিয়া আমোদ প্রমোদ করিতাম। পত্নী প্রতিবাদ করিলে তাহাকে নানা কটু কথায় তিরস্কার করিতাম। কিন্তু চাকরীটি হারাইবার ভয়ে আফিস সংক্রান্ত কাজে কখনই অবহেলা করি নাই।

মফঃস্বল হইতে আসিবার সময় এক একদিন প্রচুর পরিমাণে পক্ষী শিকার করিয়া আনিতাম এবং উল্লিখিত বন্ধু বান্ধবদিগের মধ্যে প্রকৃত হিতৈষী যে কয়জন ছিলেন তাঁহাদিগকে আহারের নিমন্ত্রণ করিতাম। তখন এই ভোজের ব্যবস্থা ছিল, খিচুরি বা সাদাসিদে ঘি ভাত, পাখীর রোষ্ট, পাখীর কারি, কোন রকম চাটনী এবং ঘরের প্রস্তুত একটা মিষ্টি। পত্নী ও শ্বশ্রূঠাকুরাণী অতীব আহ্লাদ সহকারে আহার্য্য প্রস্তুত করিতেন; চাপরাসীদের মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত সেই ব্রাহ্মণ পরিবেশনাদি করিত। এইরূপে অসৎ সঙ্গ প্রায় পরিত্যক্ত হইল। সেই সময় শিকারলব্ধ পক্ষিমাংস বড়ই উপাদেয় বলিয়া বিপিন বাবু প্রমুখ কয়েকটী বন্ধু পরামর্শ করিয়া একটী স্পোর্টিং ক্লাব (Sporting Club) স্থাপন করিলেন। শিকারে আমিই সর্ব্বাপেক্ষা পাকা এবং আমার লক্ষ্য অব্যর্থ দেখিয়া আমাকেই সেই ক্লাবের সেক্রেটারী করা হইল। আমরা এক একদিন এক একদিকে, কখন জমিদারের বজরা চাহিয়া

লইয়া পদ্মার চরে, কখন বা তাঁহাদের হাতী চাহিয়া লইয়া গজারোহণে নানাস্থানে যাইয়া স্তূপাকার নানাজাতীয় পক্ষী শিকার করিয়া আনিতাম এবং এক একদিন, এক একজন মেম্বারের বাসায় ভোজের আয়োজন হইত। এই স্পোর্টিং ক্লাব ব্যতীত একটী রিডিং ক্লাব ও স্থাপিত হইল। অবসর সময়ে সকলে সেই ক্লাবে উপস্থিত হইয়া খবরের কাগজ পড়িয়া এবং গান বাজনা, তাস খেলা প্রভৃতিতে সময় কাটাইতাম।

মহামতি লর্ড ইউলিক ব্রাউন তখন বিভাগের কমিশনার এবং সদাশয় মিঃ রডক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর। উভয়েই আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। আমি আফিস সংক্রান্ত কর্ত্তব্য কাজগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত নির্ব্বাহ করিতাম। এই সময় বালিনিবাসী কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত হইয়া রামপুরে উপস্থিত হইলেন এবং আমার বাসার সম্মুখেই রাস্তার অপর পার্শ্বে একটী বাসা ভাড়া লইলেন। পরে ইনি এক্‌জিকিউটীব ইনঞ্জিনিয়ার হইয়াছিলেন। তিনি Theosophical সম্প্রদায়ের একজন সভ্য ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীতবাদ্যে বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। দেখিতে যেমন সুপুরুষ, স্বভাবও সেইরূপ কমনীয় ছিল। তিনি আমাদের দলভুক্ত হইবার পর অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমরা অনেকেই থিওসফিক্যাল সম্প্রদায়ের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলাম।

বঙ্গাব্দ ১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে (ইং ১৮৮৩ মে মাস)

কন্যা নীল নলিনীর জন্ম হয়। ইহার কয়েক দিন পরেই দেড় মাসের জন্য সবডেপুটী কালেক্টর পদে নিযুক্ত হইয়া জলপাইগুড়ি যাইতে হইয়াছিল। বাসার সমস্ত বিষয় তত্ত্বাবধানের ভার বন্ধুবর শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর রাখিয়া গিয়াছিলাম। জলপাইগুড়িতে বাবু বিহারী লাল মুখোপাধ্যায় সব ডেপুটী কালেক্টর মহাশয়ের বাসায় দেড় মাস ছিলাম। বিহারী বাবু অতি সজ্জন, বিদ্বান, সুরসিক এবং কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন। এই সময়ের দুই বৎসরের মধ্যেই তিনি স্পেশ্যাল ডেপুটী কালেক্টর (Special Deputy Collector) পদে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। জলপাইগুড়ি অবস্থিতি সময়ে "স্বর্ণলতা" রচয়িতা তারক নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত পরিচয় এবং একটু সদ্ভাব হইয়াছিল। ইনি সে সময় সেখানে য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বাবু যদুনাথ ভট্টাচার্য্য সেই সময় জলপাইগুড়ির প্লীডার ছিলেন। তাঁহার সহিত ও বিশেষ সৌহার্দ্দ্য হইয়াছিল। বহুদিন পরে ইঁহার সুযোগ্য পুত্র অনুকূলের সঙ্গে আমার মধ্যম সহোদর দেবেন্দ্রনাথের প্রথমা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীর বিবাহ হইয়াছিল।

জলপাইগুড়ি হইতে রামপুর বোয়ালিয়ায় প্রত্যাগমনের পর একটা অভাবনীয় বিপদে পড়িয়া দুই এক মাস বড়ই মানসিক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। রাজসাহী জেলার এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিশালকায় পদ্মানদীর উভয় তীরে গভর্ণমেণ্টের অনেকগুলি খাসমহল ছিল। এই সকল খাস-

মহলের প্রজাবর্গের নিকট হইতে মালগুজারি আদায় করার ভার সদর কানুনগোর উপর ন্যস্ত ছিল। (আমিই সদর কানুনগো ছিলাম) ইহা ব্যতীত একবার বর্ষাকালে এবং আবার শীতকালে সদর কানুনগোকে সমস্ত খাসমহল এবং চরভূমি প্রদর্শন করিয়া রিপোর্ট দিতে হইত,—কোন খাসমহলের সংলগ্ন নূতন চর পড়িয়াছে, কোন খাসমহলের জমি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং কোথাও নূতন চর পড়িয়াছে কিনা। এই সময়ের তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি বর্ষা-কালের পরিদর্শন সময় একটী অনাবাদী ক্ষুদ্র চর দেখিতে পাই নাই ; পার্শ্ববর্ত্তী প্রজাগণের নিকটে শুনিয়াছিলাম, এই চরটী উদ্ভব হইবার দুই বৎসর পরেই অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। আমি এই মর্ম্মেই রিপোর্ট করিয়াছিলাম। ইহার তিন বৎসর পরে বিজয় কৃষ্ণ বসু নামক কলিকাতানিবাসী একজন ডেপুটী কালেক্টর খাসমহলের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কানুনগোদিগকে তাঁহারই অধীনে কাজ করিতে হইত। তাঁহাকেও সময় সময় মফঃস্বলে যাইয়া খাসমহল পরিদর্শন করিতে হইত। তিনি সেবার শীতকালে বাহির হইয়া দেখিয়াছিলেন যে, যে অনাবাদী খাস চর বর্ত্তমান নাই বলিয়া আমি রিপোর্ট দিয়াছিলাম, সেই চর বর্ত্তমান আছে। আর যাবে কোথা ? আমি প্রজাবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া মিথ্যা রিপোর্ট দিয়াছিলাম এই মর্ম্মে একটী সুদীর্ঘ রিপোর্ট একটিং কালেক্টর অপরিণত জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ভাউলের (Mr. Vowell I. C. S.) নিকট প্রেরণ করেন। তিনি আমার কোন কৈফিয়ৎ না চাহিয়াই সেই রিপোর্ট কমিশনার বাহাদুরের নিকট প্রেরণ

করিয়াছিলেন। মহামতি লর্ড ইউলিক সেই রিপোর্ট ফেরৎ পাঠাইয়া আমার কৈফিয়ৎ সহ পাঠাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। বন্ধুবর শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামলাল শীল, এবং কমিশনারের পার্সন্যাল য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট আশুতোষ গুপ্ত আমার পক্ষ হইতে একটী সুন্দর কৈফিয়ৎ খসড়া করিয়া দিয়াছিলেন। পদ্মানদীর বিচিত্র গতি, অর্থাৎ আজ যেখানে প্রবল স্রোত, এক বৎসর পরে সেই স্থানে প্রকাণ্ড চরভূমি; বর্ত্তমান বর্ষে যে মহাল নানাবিধ শস্যপূর্ণ এক বৎসর পরে সেই মহাল একেবারে বালুকাচ্ছাদিত হইয়া থাকে ইহা আবালবৃদ্ধবনিতার অগোচর নহে। ইহার কয়েকটী উদাহরণও কালেক্টরের রেকর্ড হইতে সংগ্রহ করিয়া আমার কৈফিয়তে সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল। যে সময় এই কৈফিয়ৎ পাঠান হয় সেই সময় স্থায়ী কালেক্টর সদাশয় মিঃ রডক ফিরিয়া আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আমার কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক হইয়াছে বলিয়া মন্তব্যসহ কমিশনারের নিকট প্রেরণ করেন। মহামতি কমিশনার বাহাদুর আমাকে নির্দ্দোষ বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আলিপুরদুয়ার, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে একটীং সব ডেপুটী কালেক্টরী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

যখন আফিসে এই ব্যাপারটী লইয়া হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল তখন অনেকেই ভাবিয়াছিলেন, আমার চাকরী যাইবে। আমিও এই সন্দেহে পরিবারবর্গকে দিগনগরে পাঠাইয়া নিজে একটী মেসের বাসায় এই দুই তিন মাস ছিলাম। অতঃপর

পরিবারবর্গকে কিছুদিন রামপুর বোয়ালিয়ায় আনা হয় নাই। রাজেন্দ্রনাথ সেই সময় আমার নিকট ছিল ও রামপুরের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে পদ্মার তীরে সরদহ নামক গ্রামে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কয়েক মাস পরে পরিবারবর্গকে পুনরায় রামপুরে আনিয়াছিলাম। রাজেন্দ্রনাথের পত্নীও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ প্রতি শনিবারে এবং সকল ছুটীতেই রামপুরে আসিতেন। এইভাবে কয়েকমাস অতীত হইবার পর আমাকে পাকা সব ডেপুটী পদে নিযুক্ত করিয়া নোয়াখালী জেলায় বদ্‌লী করা হইল।

নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভের পূর্ব্বে সাংসারিক দুই একটী কথা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। দেবেন্দ্র নাথ সেই সময় পুনরায় বি,এ পরীক্ষা দিবেন বলিয়া কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছিলেন, তাঁহার শারীরিক অবস্থাও ভাল ছিল না। তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য আমার নিকট হইতে কিছু মাসিক সাহায্য চাহিয়াছিলেন। তখন আমার বেতন পঁচাত্তর টাকা। বাড়ী ভাড়া মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, ঝির বেতন প্রভৃতি দিয়া ষাট টাকা আন্দাজ বাঁচিত। বাসায় আমি, রাজেন্দ্র, আমার স্ত্রী, রাজেন্দ্রের পত্নী সুকুমারী, শ্বশ্রূঠাকুরাণী এবং দুইটী শিশু ও ঝি। আবার অতিথি অভ্যাগতেরও অভাব ছিল না, একরূপ কষ্টেই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। সুতরাং দেবেন্দ্রকে মাসিক সাহায্য করা আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব এই কথা তাঁহাকে লিখিলাম। ঠিক সেই সময়ে আবার রাজেন্দ্রনাথের পত্রে উত্তেজিত হইয়া দেবেন্দ্র

একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। অতি পরুষভাবে আমাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন যে আমি নাকি নিতান্ত স্বার্থপর, নিতান্ত অবিবেচক, আমি নাকি রাজেন্দ্র ও তৎপত্নীর প্রতি নিতান্ত স্বার্থপরের ন্যায় ব্যবহার করি ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাহা হউক রামপুর বোয়ালিয়ায় কানুনগো পদ হইতে অবসর পাইয়া প্রথমে দিগনগরে আসার পর, আমাদের বংশের প্রকৃত বন্ধু ও হিতৈষী মথুরা মোহন ঘোষ, নন্দকুমার চক্রবর্ত্তী, রামলাল বিশ্বাস প্রভৃতি প্রাচীনদের চেষ্টায় ও সদুপদেশে এই ভ্রাতৃবিচ্ছেদ আশঙ্কা এবং মনোমালিন্য কতকটা দূর হইয়াছিল। তবে বৌদের মধ্যে বেশ সম্প্রীতি ও সহানুভূতি না থাকায় এবং প্রত্যেকেই একটু স্বাতন্ত্র্যভাব অবলম্বন করিয়া আপন আপন স্বার্থের প্রতি সমধিক দৃষ্টি রাখায়, সংসারে আশানুরূপ শান্তি ও শৃঙ্খলা কখনই হয় নাই। প্রধান কারণ বোধ হয়, আমরা প্রত্যেকেই আপন আপন স্ত্রী পুত্র লইয়া কর্ম্মস্থলেই থাকিতাম, ক্বচিৎ কখন পূজার সময় বা অন্য কোন উৎসব বা কার্য্য উপলক্ষে দুই চারিদিনের জন্য একত্র হইতাম। একত্রে এক সংসারে একজন কর্ত্তা এবং একজন গৃহিণীর তত্ত্বাবধানে সেকালে সকলেই থাকিতেন ; সময় সময় বাক বিতণ্ডা, বচসা হইলেও পরস্পরের মধ্যে স্নেহ, প্রীতি এবং সহানুভূতির অভাব হইত না। কিন্তু অবস্থা বিপর্য্যয়ে আমাদের সেরূপ সুবিধা ঘটে নাই।

—— * ——

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইংরাজী ১৮৮৫ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী অরুণোদয় সময়ে নোয়াখালী সহরে উপস্থিত হইলাম। তখন রেলরাস্তা বা ষ্টীমার সেদিকে হয় নাই। গোয়ালন্দ হইতে নৌকাযোগে বিশালকায়া পদ্মানদী এবং মেঘনা নদী প্রভৃতি বাঙ্গালা দেশের ভীষণ নদীবক্ষে প্রাণটী হাতে করিয়া নোয়াখালীর আঠার মাইল পশ্চিমে নৌকা ছাড়িয়া গোশকটে যাইতে হইত। রামপুর হইতে প্রথমে দিগনগরে যাইয়া সাংসারিক কতকগুলি বিষয়ের সুব্যবস্থা করা হয়, এবং যাহাতে আমার পত্নী ও শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ব্যবহারে দেবেন্দ্র ও রাজেন্দ্র কোনরূপে ক্ষুণ্ণ না হয়, সে সম্বন্ধে পত্নীকে বিশেষ সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম। যাত্রার দিন উপস্থিত হইলে বাটীতে একরূপ কান্নাকাটি পড়িয়া গেল, প্রতিবেশিনীগণে বাড়ী ভরিয়া গেল। হয়ত জলে ডুবিয়া প্রাণ হারাইব, দুইটী শিশু সন্তান লইয়া পত্নীর অবস্থা কি শোচনীয় হইবে, এই সকল চিন্তাতে তাহাদিগকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। আমি নিজেও কতকটা বিচলিত হইয়াছিলাম। যাহা হউক প্রাচীনবর্গের আশীর্ব্বাদ লইয়া, ভগবানের কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নোয়াখালী যাত্রা করিলাম। সঙ্গে চলিল বীরভূম জেলা নিবাসী রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটী সচ্চরিত্র

ব্রাহ্মণ যুবক এবং আমার সেই বিলমাড়িয়ার জগদান সিং। রাজকৃষ্ণ বাঙ্গালা লেখাপড়া বেশ এক রকম জানিত, ইংরাজীও সামান্যরূপ লিখিতে পড়িতে পারিত। চাকরীর উমেদারী উপলক্ষে রামপুরে আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হয়। খাস মহালের আদায় তহশীলের ভার আমার হাতে থাকায় চারি পাঁচজন চাপরাসী আমার অধীনে কাজ করিত। ইহা ব্যতীত সার্ভে (Survey) সংক্রান্ত কাজ আমাকে সর্ব্বদাই করিতে হইত বলিয়া দুইজন চেনম্যান ও (Chainman) থাকিত। ইহারা আমীন ও মোহরারের কাজ বেশ জানিত। তাহাদের মধ্যে কেহ বিদায় লইলে রাজকৃষ্ণকে সেই পদে নিযুক্ত করিতাম। তাহার আহারাদি আমার বাসাতেই হইত। এই রাজকৃষ্ণ ১৮৮৪ সাল হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত অতি অনুগত, বিশ্বাসী, অন্তরঙ্গের ন্যায় আমাদের সঙ্গে ছিল। জগদান সিং ছিল জাতিতে রাজপুত। সেই বিলমাড়িয়ায় আমার সঙ্গে পরিচয় হইবার পর হইতেই সে আমার এত অনুগত হইয়াছিল যে তথাকার কাজ শেষ করিয়া রামপুর বোয়ালিয়ায় আসিবার সময় সে আমার সঙ্গে আসিয়াছিল। সে ছিল তাহার পিতার একমাত্র পুত্র। পিতা রঘুবর সিং রবার্ট ওয়াটসন কোম্পানীর (Robert Watson & Co.) অধীনে নীলকুঠির জমিদারী করিয়া প্রায় ষাট সত্তর বিঘা উৎকৃষ্ট চাষের জমি করিয়াছিল, ইহা ব্যতীত মহাজনী কারবারেও বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিত। একমাত্র পুত্র জগদান বড় আদরের ছেলে, আমার সঙ্গে থাকিবার আব্দার ধরিয়াছে, সুতরাং বাপ,

মা আর কোন আপত্তি না করিয়া ছেলের কাপড়, জামা, জুতা, পকেট খরচের জন্য কিছু টাকা দিয়া আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছিল। জগদানকে বেতন দিতে হইত না। অথচ সে চাকরের ন্যায় হাসিমুখে সকল কাজই করিত। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে সে পক্ষী শিকার করা ও গান বাজনা একটু একটু শিক্ষা করিয়াছিল। আমার নিকটে আসিবার পর হইতেই সামান্যরূপ বাঙ্গালা লেখাপড়াও শিক্ষা করিয়াছিল। এই সময় ১৮৮৩ হইতে ১৮৮৯ সাল পর্য্যন্ত জগদান আমার সঙ্গে ছিল। জলপাইগুড়ি, আলিপুরডুয়ার, দার্জ্জিলিং এবং নোয়াখালি পর্য্যন্ত সে একান্ত অনুগত ভৃত্যের ন্যায় আমার পরিবারভুক্ত হইয়া ছিল। নোয়াখালি হইতে ১৮৮৯ সালে যখন আমি বর্দ্ধমানে বদ্‌লী হই, সেই সময় তাহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বাধ্য হইয়া তাহাকে দেশে যাইতে হইয়াছিল। তাহার পর প্রমথ নাথের বিবাহ উপলক্ষে (ইং ১৮৯৮ সালে) আর একবার দিগনগরে আসিয়াছিল। এইরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সকল কার্য্যে তৎপর প্রভুভক্ত বিশ্বাসী অনুচর খুব কমই দেখা যায়।

নোয়াখালি উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে নিজ ব্যয়ে বাসা প্রস্তুত করিতে না পারিলে থাকিবার স্থান নাই। অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাড়ী প্রস্তুত করিয়া ভাড়া দেওয়ার প্রথা প্রচলিত নাই। অনেক চেষ্টায় একখানি ক্ষুদ্র চালা ঘর মাসিক দুই টাকা ভাড়ায় পাইয়াছিলাম। নারিকেল গাছের গুঁড়ির খুঁটীর উপর চালার দুই প্রান্তে দুইটী বাঁশ, নারিকেল ও হোগলা পাতার চাটাই

আচ্ছাদিত দুইটী মাচান। দুইটী মাচানের মধ্যে ব্যবধান প্রায় আট হাত, সেই স্থানটী খালি থাকায় সেইখানে রাজকৃষ্ণ ও জগদান দুইটী উনুন প্রস্তুত করিয়া রন্ধনাদির বন্দোবস্ত করিয়াছিল। নানাবিধ মৎস্য ও দুগ্ধ, নানাজাতীয় উৎকৃষ্ট কদলী, অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইত, নারিকেলের ত কথাই নাই। পাঁচ পয়সায় বাইশটা বড় বড় কই মাছ, অর্দ্ধপোয়া ওজনের গল্‌দা-চিংড়ী পয়সায় দুইটা পাইতাম। এই সকল এখন উপকথার ন্যায় বোধ হইবে। আমি যে চালাখানি ভাড়া লইয়াছিলাম সেখানি কালেক্টারীর হেড ক্লার্ক বাবু চন্দ্রকুমার গুহ মহাশয়ের বাসার অতি সন্নিকটে। আরও অনেকগুলি আমলা সেই পাড়ায় থাকিতেন। দোলপূর্ণিমার পূর্ব্বদিন আমি নোয়াখালিতে উপস্থিত হই এবং প্রথমেই চন্দ্রকুমার বাবুর সহিত দেখা করিতে যাই। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি যে বিষম একটা প্রশ্ন লইয়া হুলস্থুল লাগিয়া গিয়াছে। ব্যাপার এই যে দোলযাত্রা উপলক্ষে আমলাবর্গ স্থানীয় ধনাঢ্য লোকের সাহায্যে প্রতি বৎসর উৎসব করিয়া থাকেন; ঢাকা হইতে বাইনাচ, খেমটা নাচ, যাত্রা ও নানাবিধ আমোদ প্রমোদের আয়োজন করেন। সুবিস্তৃত, সুসজ্জিত আসর নির্ম্মাণ করা হয়। শুনিলাম আসরে হাকিমবর্গ চেয়ার না পাইলে আসিবেন না, এইরূপ পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে যখন জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সাহেব ও অন্যান্য সাহেবগণ, এমন কি তাঁহাদের অধীন ফিরিঙ্গী কেরাণীগণও যখন চেয়ার পাইবেন, তখন তাঁহারা কখনই দেশীয় ফরাসে বসিবেন না। আমলাবর্গেরও

পণ, এই সামাজিক উৎসবে সমাজের নিয়মমত চলিতে হইবে। হাকিমদিগকে ফরাসের সম্মুখভাগে গালিচা পাতিয়া, তাকিয়া বালিস, পিকদানী প্রভৃতি সরঞ্জাম সাজাইয়া সসম্মানে বসাইতে হইবে।

অপরাহ্নে হাকিমবর্গের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে যাইয়া দেখিলাম, সেখানেও এই বিষয় লইয়া খুব আন্দোলন চলিতেছে। "মহাশয়ের মত কি ?" হাকিমমণ্ডলী হইতে আমার প্রতি এই প্রশ্ন হইল। আমি কহিলাম সহরে উপস্থিত হইয়াই যখন আমলা পাড়ায় বাসা লইয়াছি, এবং নিজেও সামান্য ডেপুটী মাত্র তখন ফরাসে বসিয়া নাচ তামাসা দেখিবার কোন আপত্তি নাই। প্রকৃতপক্ষে আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন সব ডেপুটীদের দুরবস্থার একশেষ ছিল। এজলাস বলিয়া বসিবার একটা স্থান ছিল না। কখন কেরাণীদের সঙ্গে, কখন মহাফেজ-খানায়, কখন বা সেটেলমেণ্ট বা খাসমহাল আফিসের এক কোণে বসিয়া কাজ করিতে হইত। অবশ্য সবডিভিসনের সেকেণ্ড অফিসার (second officer) পদে যে সকল ডেপুটী থাকিতেন তাঁহাদিগকে প্রায়ই তৃতীয় শ্রেণীর, সময় সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হইত বলিয়া তাহাদের একটা ছোট খাট এজলাস থাকিত। বর্ত্তমান সময়ের সব ডেপুটীগণ কার্য্যতঃ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী কালেক্টরদিগের ন্যায় এক এক ডিপার্টমেণ্টের ভার পাইতেছেন, দ্বিতীয় শ্রেণী, সময় সময় ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাও পাইতেছেন, আবার কখন কখন

অস্থায়ীরূপে সবডিভিসনের ভারও পাইতেছেন। বেতন ও আমাদের সময় অপেক্ষা তাঁহারা অধিক হারে পাইতেছেন।

হাকিমবর্গের সহিত একমত না হওয়ায় এবং তাঁহাদের ছাড়িয়া দোলের আসরে বসিয়া কয়েক দিন আমোদ প্রমোদ করায়, তাঁহারা আমার অযথা নিন্দা করিতে লাগিলেন। আমি এই সকল কথা শুনিয়া "পূর্ব্ববঙ্গবাসী" নামক স্থানীয় পত্রিকায় হাকিমবর্গকে আক্রমণ করিয়া নানারূপ প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলাম। সে সময় বাঙ্গালা ভাষায় একটু অধিকার জন্মিয়াছিল। নোয়াখালি পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সে চর্চ্চা একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। সুতরাং সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছিলাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দোলযাত্রার উৎসব সমাধা হইবার কয়েকদিন পরেই মফঃস্বলে যাত্রা করিতে হইল। প্রথমেই নৌকা যোগে সন্দ্বীপ নামক ইতিহাস প্রসিদ্ধ দ্বীপে গিয়াছিলাম। এটী একটী মনোহর দ্বীপ। চারিদিকে নারিকেল, সুপারি ও বন্য পুষ্প বৃক্ষ বেষ্টিত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন বাসভবন (মাটীর দেওয়াল, খড়ের চাল), পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ময়দান এবং স্থানে স্থানে কুঞ্জবনের ন্যায় স্বভাবজাত নানাজাতীয় বৃক্ষ শ্রেণী। অসংখ্য কোকিল, ডাহুক ও কুকো পক্ষীর কোলাহল। আশ্চর্য্যের বিষয় একটি পক্ষী ডাকিবা মাত্রই সকল পক্ষীই ডাকিয়া একটী ঐক্যতানের সৃষ্টি করিত। সন্দ্বীপের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। স্থানীয় মুন্সেফ, সবরেজিষ্টার, খাস তহশীলদার, জমিদারের নায়েব প্রভৃতি এবং দুই একটী উকীলের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায়

অবসর সময় তাঁহাদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে কাটাইতাম। কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট এবং গান বাজনায় একটু ঝোঁক ছিল বলিয়া কাহারও না কাহারও বাসায় সান্ধ্য ভোজের আয়োজন হইত; অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গান বাজনা চলিত। ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে পাঠ্যাবস্থা হইতেই বেশ ভঙ্গীসহকারে (কথক-দিগের ন্যায়) গল্প বলার অভ্যাস থাকায়, পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া পুরস্ত্রীগণ আমার গল্প শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। নিমন্ত্রণ প্রধানতঃ তাঁহাদের অনুরোধেই হইত।

চৈত্র সংক্রান্তি ও চড়কপূজার দিন মুন্সেফি কাছারীর সম্মুখে ও পার্শ্ববর্ত্তী ময়দানে একটী ছোট রকম মেলা বসিত। স্থানীয় এবং নিকটবর্ত্তী হাতিয়া নামক দ্বীপবাসী, এমন কি নোয়াখালি সহর এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতেও অনেক লোকের সমাগম হইত। মেলার কয়দিন জগদান বহুরূপী সাজিয়া কিছু পয়সা সংগ্রহ করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট তহশীলদারের এবং জমিদারের নায়েবের সাহায্যে স্থানীয় কয়েকটী লোকের জন্য একটী ছোট খাটো ভোজের আয়োজন করিয়াছিল। জগদানের ন্যায় চৌকস অনুচর অতি অল্পই দেখিয়াছি।

তাহার পর আরও দুই মাস সন্দ্বীপে অবস্থিতি করিবার পর, বর্ষা সমাগমে নোয়াখালিতে ফিরিয়া আসিলাম। কয়েকটী কেরাণী, শিক্ষক এবং অন্যান্য ভদ্রলোক লইয়া এক "থিওসফিক্যাল সমিতি" (Theosophical Association) সংস্থাপিত করা হইল। মফঃস্বল হইতেও অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটী সভাগৃহ

নির্ম্মিত হইল। একটী ক্ষুদ্র লাইব্রেরীও হইল, সন্ধ্যার সময়, ছুটীর দিনে তুই বেলাই এই সভার গৃহে যাইয়া সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সদালোচনা, সংকীর্ত্তন প্রভৃতি হইতে লাগিল। নোয়াখালিতে নগর সংকীর্ত্তনের প্রথা প্রচলিত ছিল না। "হরির লুট" প্রায় অনেক হিন্দুর বাড়ীতেই দেওয়া হইত; সেই সময় "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া তুলসী মঞ্চের চতুর্দ্দিকে সকলে নৃত্য করিত। তারপর নগর সংকীর্ত্তনের দল সংগঠিত করিয়া দশ পনর দিন শিক্ষা দিবার পর, ঝুলন পূর্ণিমার সন্ধ্যায় সকলকে বৈষ্ণবের বেশে সজ্জিত করিয়া হরিনাম লেখা পতাকা উড়াইয়া, নগর সংকীর্ত্তন প্রথম সহরে বাহির করা হইল। বলা বাহুল্য যে ঢাকায় লোক পাঠাইয়া চারি খানি খোল (মৃদঙ্গ), কয়েক জোড়া করতাল, পেটাঘড়ি, শিঙ্গা প্রভৃতি সংগ্রহ করা হইয়াছিল। এই নূতন ব্যাপার দেখিয়া আবালবৃদ্ধ সংকীর্ত্তনের দলে যোগ দিয়াছিল। একটা মহা আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়া সকলকে যেন পাগল করিয়া তুলিল। পূর্ব্ববঙ্গ বৈষ্ণবপ্রধান স্থান। প্রতি পূর্ণিমায় নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইতে লাগিল। আবার অবস্থাপন্ন অনেকগুলি গোঁড়া বৈষ্ণব নগর সংকীর্ত্তন শেষে লুচি, তরকারী, দধি, ক্ষীর, নানাবিধ ফলমূল এবং মিষ্টান্ন যোগে সভার সভ্যগণকে পরিতোষরূপে আহার করাইতে লাগিলেন।

আমি যে সময় নোয়াখালিতে উপস্থিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করি, সে সময় মিঃ আনন্দরাম বড়ুয়া আই,সি,এস, (Mr. A. Barooah I. C. S.) ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর ছিলেন। ইনি

বিবাহ করেন নাই ; অতি সুপণ্ডিত ও সুযোগ্য কর্ম্মচারী ছিলেন। স্বভাব অতি অমায়িক ছিল। হাকিমবর্গকে এবং সেই সঙ্গে আমাকেও মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া আহারাদি করাইতেন ; আহারান্তে দুই চারিটা গান না গাওয়াইয়া আমাকে ছাড়িতেন না। আনন্দরাম বড়ুয়া মহোদয়ের চেষ্টায় নোয়াখালি এবং সন্দ্বীপ ও হাতিয়া দ্বীপ দুইটাতে যাতায়াতের জন্য একখানি ষ্টীমার আসিয়াছিল। বড়ুয়া বাহাদুর একদিন এই ষ্টিমারে প্রচুর পরিমাণ ফলমূল, মিষ্টান্ন এবং হিন্দুয়ানী ও সাহেবী খাবারের বন্দোবস্ত করিয়া সহরের যাবতীয় হাকিম, উকীল, আমলাবর্গ এবং অন্যান্য প্রধান লোককে লইয়া সন্দ্বীপ, হাতিয়াদ্বীপ প্রভৃতি স্থান সমূহে বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন। ষ্টীমারে খেলা, গান বাজনা প্রভৃতিরও আয়োজন ছিল। বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি স্বর্গীয় নবীন চন্দ্র সেন মহাশয় সেই সময় নোয়াখালির অন্তর্গত ফেণী মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। নিমন্ত্রিত হইয়া তিনিও এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। প্রথম হইতেই তিনি আমাকে সুনজরে দেখিয়াছিলেন এবং যতদিন জীবিত ছিলেন, আমাকে পত্রাদি লিখিতেন। পরবর্ত্তী সময়ে যখন আমি বর্দ্ধমানে ছিলাম, সেই সময় তিনি নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। একটা ছুটীর সময় আমি ও তাঁহার অন্যান্য কয়েকটী বন্ধু নিমন্ত্রিত হইয়া রাণাঘাটে তাঁহার কুঠীতে দুই দিন নানারূপ আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া আসিয়াছিলাম।

মিঃ আনন্দরাম বড়ুয়া বাহাদুর পীড়িত হইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই ; সরস্বতীর বরপুত্র, সদাশয়, লোকপ্রিয় আনন্দরাম বড়ুয়া দিব্যধামে গমন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে মহামতি কর্ণেল অলকট (Col. Olcott) সাহেবকে থিওসফিক্যাল সভা হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া নোয়াখালিতে আনা হইয়াছিল। ছোট বড় সকলেই সাধ্যানুসারে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। মিঃ বড়ুয়া অগ্রণী হইয়া যাহাতে তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয় সে বিষয়ে যথেষ্ট যত্নবান হইয়াছিলেন। সেদিন সহরের সমস্ত রাস্তায় এরূপ জনতা হইয়াছিল যে তাঁহার গাড়ীখানি খালের নিকট হইতে মিঃ বড়ুয়ার কুঠী পর্য্যন্ত (প্রায় সিকি মাইল) লইয়া যাইতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। মিঃ বড়ুয়া তাঁহার কুঠীর একাংশ কর্ণেল মহোদয়ের থাকিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার আহারাদির বন্দোবস্তও তিনি করিয়াছিলেন। কর্ণেল নিরামিষাশী, রুটি, দুগ্ধ, ফলমূল সামান্য মিষ্টান্নই তাঁহার আহার্য্য ছিল বলিয়া, বড়ুয়া মহোদয় তাঁহার জন্য সেইরূপ আয়োজনই করিয়াছিলেন। মিঃ বড়ুয়া যে সময়ে কয়েক মাসের বিদায় লইয়া স্থানান্তরে গিয়াছিলেন সেই সময় মিঃ ওয়ালার (Mr. R. M. Waller. I. C. S.) তৎপদে ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর হইয়া আসিয়াছিলেন। মিঃ ওয়ালারের চেষ্টায় নোয়াখালিতে একটী কৃষি প্রদর্শনী হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে একটী থিয়াটারের দল গঠিত হইয়াছিল ও নাট্যশালাও প্রস্তুত হইয়াছিল। কর্ণেল

মহোদয়ের আগমন উপলক্ষে রচিত একখানি ক্ষুদ্র নাটকের অভিনয় এবং তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে "প্রহ্লাদ চরিত্রের" অভিনয়ও করা হইয়াছিল। কর্ণেল মহোদয় রঙ্গমঞ্চ হইতে অতি সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার একদিন পরেই কবিবর নবীন চন্দ্র সেন প্রমুখ চারি পাঁচজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য অনেকগুলি ভদ্রলোক থিওসফিক্যাল সোসাইটীর মেম্বর হইয়াছিলেন।

আমি রামপুর বোয়ালিয়া হইতে নোয়াখালিতে স্থানান্তরিত হইবার তিনমাস পরে প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ভূপতি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। দুই তিন বৎসর মাত্র জেলার সদরে কাজকর্ম্ম করিবার পর তাঁহাকে সব ডিভিসনের ভার দেওয়া হইয়াছিল। অনেক সময় তাঁহাকে অনেক দায়িত্বপূর্ণ বিশেষ কার্য্যে (special duty) নিযুক্ত করা হইত। ভূপতির সিংহভূম জেলায় অবস্থিতি সময়ে (১৮৯১) শ্রীপতি পুলিসের সবইনসপেক্টার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীপতি পরে পুলিস বিভাগে ডেপুটী সুপারিণ্টেডেণ্টের পদ পর্য্যন্ত পাইয়া পেন্সন লইয়াছেন। দেবেন্দ্র নাথ একেবারে বি,এ, এম,এ এবং আইন পরীক্ষায় পাশ করিবার প্রয়াস বিফল হইবার পর কয়েক বৎসর আর কোন চেষ্টা না করিয়া শিক্ষকতা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তারপর ঘরে পড়িয়া বি,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে দেবেন্দ্রনাথের বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ

বশতঃ চাকরী পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া অনেকগুলি শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের লইয়া নানাস্থানে পর্য্যটন করিতেন। নবদ্বীপে শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন এবং তাঁহার পত্নীও পিত্রালয়ে থাকিতেন। দেবেন্দ্র নাথের দুইটী পুত্র (কালীপদ ও কানাই) এবং অনেকগুলি কন্যাসন্তান হইয়াছিল। রাজেন্দ্র নাথ সেই সময় আসাম প্রদেশের কনট্রোলার আফিসে সব অডিটর পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরে যোগ্যতার সহিত কাজকর্ম্ম করিয়া দিল্লীতে একাউণ্টেণ্ট জেনারেল, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিসে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

তিন বৎসর নোয়াখালিতে অতিবাহিত হইবার পর, দুই মাসের বিদায় লইয়া বদলীর চেষ্টায় কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, কিন্তু আশা পূর্ণ হইল না। পুনরায় নোয়াখালিতেই ফিরিয়া যাইতে হইল। কিন্তু আর একটী প্রয়োজনীয় বিষয় এই সময় সম্পন্ন করা হইয়াছিল। আমরা ভূপতিদের সঙ্গে অনেক দিন পূর্ব্বে পৃথকান্ন হইয়াছিলাম, কিন্তু বিষয় সম্পত্তি তখন পর্য্যন্ত এজমালিতে ছিল। এইবার ভূপতিও পূজার সময় দেশে আসিয়াছিল। আমরা দুইজনে পরামর্শ করিয়া বিষয় সম্পত্তি ও ভদ্রাসন বাটী বিভাগ করিয়া একটী বণ্টননামা প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলাম। জ্যেষ্ঠতাত পার্ব্বতী চরণের ভ্রাতষ্পৌত্র রাধিকাপ্রসাদ এই সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কাজটী সমাধা করিয়া পুনরায় নোয়াখালি যাত্রা করিলাম। এক বৎসর পরে পূজার সময় পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া বদলীর চেষ্টায়

গভর্ণমেণ্টে দরখাস্ত পাঠাইয়া নোয়াখালি ফিরিয়া আসিলাম। এখানে উল্লেখের প্রয়োজন যে নোয়াখালির কৃষি প্রদর্শনী উপলক্ষে হাকিমবর্গের সহিত আমার মনোমালিন্য দূর হইয়া বিশেষরূপ সম্প্রীতি সংস্থাপিত হইয়াছিল। কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় স্পেশ্যাল সব রেজিষ্টার (Special Sub Register) ছিলেন হাকিমদলের নেতা। ইঁহার নিবাস হাওড়ার নিকটবর্ত্তী দক্ষিণ ব্যাঁট্রা গ্রামে। ইনি অতি সদ্‌বক্তা, সুরসিক এবং অনেকগুলি সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন। আমাদের মধ্যে বিদ্বেষভাব দূর হইবার পর হইতেই, ইনি আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ, যত্ন করিয়াছিলেন। কেদার বাবুই ছিলেন আমাদের নবপ্রতিষ্ঠিত থিয়াটারের প্রাণ স্বরূপ। আমি নোয়াখালি হইতে চলিয়া আসিবার পূর্ব্বেই ইঁহাকে চট্টগ্রামে বদ্‌লী করা হয়। ইহাতে আমাদের সকলেরই নিতান্ত ক্লেশ হইয়াছিল। বদ্‌লীর সংবাদ পাইবার পর, তাঁহার নোয়াখালি পরিত্যাগের দিন পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি বিদায়ী ভোজ, অভিনয়, অভিনন্দন প্রভৃতি চলিতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে কেদার বাবু সমাজ পরিচালিত করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিই ছিলেন, যাহাকে বলে "Born leader of men" মানুষের জন্মগত নেতা।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে নোয়াখালি হইতে বদ্‌লী হইবার জন্য দরখাস্ত পাঠান হইয়াছিল। এইবার মনোরথ পূর্ণ হইল। ডিসেম্বর মাসের (১৮৮৮) মধ্যভাগে গেজেটে দেখিলাম আমাকে বর্দ্ধমান সদরে বদলী করা হইয়াছে ; কি যে আনন্দ হইল

তাহা আর কি লিখিব। আমার নোয়াখালি পরিত্যাগ অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া থিয়াটারের মেম্বরবর্গ, থিওসফিক্যাল সভার সভ্যগণ এবং অপরাপর বন্ধুবর্গ বিদায়ী ভোজ, অভিনয়, অভিনন্দন প্রভৃতির প্রভূত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমার পদে একজন মুসলমান সব ডেপুটী বিহারের কোন জেলা হইতে নোয়াখালিতে আসিতেছিলেন। তাঁহার আসিতে বিলম্ব হওয়ায় বিদায়ী উৎসবের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। কলিকাতা, হুগলি, নদীয়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার অধিবাসীগণ যাঁহাদিগকে "বাঙ্গাল" বলিয়া কথায় কথায় বিদ্রূপ করিয়া থাকেন, সেই বাঙ্গালদিগের মহত্ত্ব, সদাশয়তা এবং হৃদয়ের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান, স্বজনানুরক্তি, একাগ্রতা, দৃঢ় সঙ্কল্প প্রভৃতি সদ্গুণগুলি মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসিগণের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। নোয়াখালি পরিত্যাগের দুইদিন পূর্ব্বে থিয়াটারের সুযোগ্য অভিনেতা দুর্গাপ্রসন্ন সেন, নোয়াখালির যে যে বিষয়ে আমার দ্বারা উন্নতি হইয়াছে এবং তাঁহাদের মতে যে সকল সদ্গুণ আমার ছিল সেই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র নাটক রচনা করিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়াছিলেন। সেদিন থিয়াটার গৃহে এত অধিক লোক সমাগম হইয়াছিল যে অনেকে বাহিরেই শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া ছিলেন। অভিনয় শেষে প্রত্যেক মেম্বর, প্রত্যেক অভিনেতা এবং অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক সজল নয়নে প্রীতিভরে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন। পুষ্পমাল্য, পুষ্পস্তবক প্রভৃতি এত অধিক উপহার দিয়াছিলেন যে

সেইগুলি একটী ঝুড়িতে বোঝাই করিয়া বাসায় আনিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের সেই দিনের সেই অকৃত্রিম প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস আমি কখনই ভুলিতে পারিব না।

প্রায় চারি বৎসরকাল নোয়াখালিতে থাকিতে হইয়াছিল। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, অনেক মুন্সেফ আসিয়াছিলেন এবং স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নামই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কুমারখালি নিবাসী পিতৃবন্ধু মোহিনী মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়, যিনি পরে কুষ্টিয়ায় সুবিখ্যাত "মোহিনী মিল" স্থাপন করিয়া ভারত বস্ত্র শিল্পের প্রভূত উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চন্দ্র ভূষণ চক্রবর্ত্তী, ইঁহার নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত নাকাসিপাড়ার নিকটবর্ত্তী পলাসডাঙ্গা গ্রামে, পরে ইনি (কৃষ্ণনগর) গোয়াড়িতে বাস ভবন প্রস্তুত করিয়া সেই স্থানেই বাস করিতেছেন। ইনি আমা অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের বড় ; এখনও বেশ সক্ষম আছেন, (১৯২৯ এপ্রিল) কেবল চক্ষের দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছে। ইঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান, নীরদ ভূষণ চক্রবর্ত্তী দুই বৎসর পূর্ব্বে টাটানগরে ক্যাটারিং ডিপার্টমেণ্টের অডিট্ ইনস্‌পেক্টার ছিলেন (Audit Inspector of Catering) সেই সময় চন্দ্রভূষণ বাবু কিছুদিন তাঁহার নিকটে ছিলেন। আমি নিকটে আছি শুনিয়া দুইবার সপরিবারে চক্রধরপুরে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছিলেন। এই মহোদয়ের কথা একটু বেশী করিয়া লিখিবার কারণ এই যে ইনি আমাপেক্ষা চারি পাঁচ বৎসরের

বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়াও এখনও সক্ষম অবস্থায় সংসারে রহিয়াছেন এবং পূর্ব্ব পরিচয় মনে করিয়া আমার এখানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য ডেপুটী ও কর্ম্মচারীদের কথা সংক্ষেপেই সারিব। চন্দ্রভূষণ বাবুর পরেই বাবু নগেন্দ্র নাথ ঘোষ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। ইহার নিবাস কোন্নগর ইনি আমার সোদরপ্রতিম অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, কার্য্যদক্ষতায় ইঁহার ন্যায় কর্ম্মচারী সে সময় অল্পই দেখা যাইত। পরবর্ত্তী সময়ে পুনরায় ইহার সঙ্গে বর্দ্ধমানে মিলিত হইয়াছিলাম। বহুমূত্র রোগে অল্প বয়সেই পুরুলিয়ায় ইঁহার মৃত্যু হয়। তখন আমি সিংহভূম জেলায় সেটেলমেণ্টের কাজে নিযুক্ত ছিলাম। ইঁহার পীড়ার সংবাদ পাইয়া পুরুলিয়ায় তাঁহার সহিত শেষ দেখা করিয়া আসিয়াছিলাম। তারপর বাবু সতীশ চন্দ্র বসু, ইঁহার নিবাস কলিকাতায়। ভূপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়া প্রথমেই নোয়াখালিতে আসিয়াছিলেন। তরুণ যুবক, অতি সরল প্রকৃতি ; আমার সঙ্গে অতি শীঘ্রই বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল। ডেপুটী মহাল হইতে একরূপ পলাইয়া আসিয়া অবসর সময় আমার সঙ্গে কাটাইতেন। অনেক সময় দুই জনের মফঃস্বলের কাজ একদিকে পড়িলেই একত্রে মফঃস্বলে যাইয়া আনন্দে কাটাইতাম। ইঁহার সঙ্গে শেষ দেখা হয় কটকে ১৯০৬ সালে ; তখন আমি আবগারি ও ইনকমট্যাক্সের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর। তারপর বাবু পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ইনি বেঙ্গল আফিসের তাৎসাময়িক Appointment and

Political ডিপার্টমেণ্টের হেড য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট জ্ঞান চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভ্রাতা। ইনিও অতি অল্পবয়সে পরলোক গমন করেন। তারপর বাবু কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, স্পেশ্যাল সব রেজিষ্টারের পদ হইতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। ইনি আমাদের অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও আমাদের সঙ্গে মিশিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন। চন্দ্রকুমার রায়, হরকুমার রায়, হরকুমার দাস মুন্সেফগণ, বিনোদ বিহারী পাল ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, রামলাল রায় এবং রাজকুমার মৈত্রেয় পাইকপাড়া রাজাদের নোয়াখালির অন্তর্গত ভুলুয়া পরগণার সুপারিণ্টেডেণ্ট, কালেক্টারীর হেডক্লার্ক চন্দ্রকুমার গুহ এবং জমিদার প্যারীলাল রায় চৌধুরী (ইনি পরবর্ত্তী সময়ে রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছিলেন)। ইনি আমার বর্দ্ধমানে বদলীর পর, বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া দুই চারি দিন আমার বাসায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে কয়েকমাস নোয়াখালিতে ছিলেন; তাঁহার সহিতও বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। আমি অবসর গ্রহণ করিয়া পরে যখন চক্রধরপুরে বাস করিতেছিলাম, সেই সময় তিনি ইনকম্‌ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্টের আসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং রাজকার্য্য উপলক্ষে দুই তিনবার এখানে আসিয়া আমার বাসাতেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইহার আকৃতি যেমন সুন্দর, প্রকৃতিও সেইরূপ মধুর; ইহার ন্যায় সুলেখক, সুরসিক এবং চিত্রকলায় পারদর্শী, চারি পাঁচটী ভাষায় অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী আর দেখিয়াছি

বলিয়া মনে হয় না। আমি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে যখন দিনাজপুরে অবস্থিতি করিতেছিলাম, সেই সময় ইনিও দিনাজপুরে বদলী হইয়া কয়েক মাস ছিলেন। ইনিও রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, শুনিয়াছি সম্প্রতি তিনি মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয়ের এষ্টেটের আসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত আছেন (১৯২৯ এপ্রিল)

এইস্থানে একটী কৌতুকজনক বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বেঙ্গল আফিসের Appointment এবং Political ডিপার্টমেণ্টের হেড আসিষ্ট্যাণ্ট জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ডেপুটী, মুন্সেফ, সবজজ, সব ডেপুটী প্রভৃতি কর্ম্মচারীবর্গের বদলী সম্বন্ধে ইহার অনেকটা হাত ছিল। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় বদলীর উমেদার কর্ম্মচারীগণ ইহার বাটীতে উপস্থিত হইতেন; নানারূপ গল্প গুজবের মধ্যে আপনাপন প্রার্থনা জানাইতেন। আমি যে সময় শেষবার বিদায় লইয়া নোয়াখালি হইতে দেশে আসিয়া বদলীর দরখাস্ত দিয়াছিলাম, সেই সময় একদিন জ্ঞান বাবুর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলাম। দেখিলাম বৈঠকখানাটী উমেদারে পূর্ণ। তাহার ভিতর বড় বড় ডেপুটী, সবজজ, মুন্সেফ প্রভৃতি রহিয়াছেন আমি সেই প্রকাণ্ড ফরাসের একপ্রান্তে বসিয়া নিবেদন জানাইবার উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সেই স্থান হইতে দেখিলাম, একটু দূরে আর একটী ছোট খাটো বৈঠকখানায় কয়েকটী যুবক খবরের কাগজ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন;

কেহ বা চুরুট, কেহ বা সিগারেট এবং কেহ বা থেলো হুঁকায় তাম্রকুট সেবন করিতেছেন। আমার জন্ম পল্লীগ্রামে ; বাল্যকালে কয়েক বৎসর পল্লীবাসী বালকদের সঙ্গে কটাইয়াছি ; শিক্ষা, সংস্কার, অভ্যাস একেবারেই পাড়াগেঁয়ে ধরণেরই হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় হইতেই (বার তের বৎসর বয়ঃক্রম) তাম্রকূট সেবনের অভ্যাস হইয়াছিল এবং সেই অভ্যাসটী ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিয়া এই সময় পর্য্যন্ত রহিয়াছে। ছোট বৈঠকখানায় তাম্রকূটের বন্দোবস্ত আছে দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। নিঃশব্দে বাহির হইয়া ছোট বৈঠকখানার দ্বারদেশে দাঁড়াইবা মাত্রই সকলের দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। তাহার মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় কি মনে ক'রে এখানে।" উত্তরে কহিলাম তামাক খাইবার ইচ্ছায় আসিয়াছি। বাবুরা একখানি চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে বসিতে বলিলেন এবং নূতন করিয়া এক ছিলিম তামাক সাজিবার জন্য একটী বালক ভৃত্যকে উপদেশ দিয়া আমার পরিচয় লইতে আরম্ভ করিলেন। আমি নোয়াখালি জেলায় একশত টাকা বেতনে চাকরী করি, প্রাণ হাতে করিয়াই সর্ব্বদা সমুদ্রের ন্যায় বিশাল নদ নদী বক্ষে বিচরণ করিতে হয়। কোটালের জোয়ারের মুখে পড়িয়া অনেকবার ডুবিয়া মরিতে মরিতে ভগবানের কৃপায় বাঁচিয়া গিয়াছি ; হাঙ্গর, কুম্ভীরের কবল হইতেও অনেক সময় রক্ষা পাইয়াছি। উপস্থিত যাহাতে সেই বিপদ সঙ্কুল স্থান হইতে উদ্ধার হইতে পারি সেই চেষ্টাতেই জ্ঞান বাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে আসা হইয়াছে,

প্রভৃতি বিষয় বেশ একটু রং লাগাইয়া বাবুদের নিকট বিবৃত করিলাম। নোয়াখালি কোথায় এই কথা লইয়া প্রথমে একটু তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হইল। তাঁহাদের মধ্যে একজনের বোধ হয় ভূগোল পাঠ ও মানচিত্র দেখায় ভালরূপ জ্ঞান ছিল। তিনি কহিলেন ;— "বুঝিয়াছি, নোয়াখালিটা Gangetic Deltaর নিকটে। নিশ্চয়ই সেই বিপদসঙ্কুল স্থানে একশত কেন, পাঁচশত টাকা পাইলেও বাবা, পৈতৃক প্রাণটা হারাইতে যাবনা। মহাশয় একটা সদ্‌যুক্তি দিতেছি। একশত টাকা বেতনের এ চাকরী ছাড়িয়া দিয়া ঐ মোড়ের মাথায়, পান, সিগারেট, লেমনেড প্রভৃতির একটী ছোট দোকান খুলিয়া বস্থন। আমরা গ্যারান্টি দিতেছি খরচ খরচা বাদে মাসে একশত টাকা তুলিয়া দিব। ক্রমে চা, বিস্কুট, কেক প্রভৃতিও আমদানি করিবেন। দেখিবেন আপনার এ চাকরী অপেক্ষা নিরাপদে কলিকাতায় বসিয়া অধিক টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। আপনি একটু লেখাপড়া জানেন, বুদ্ধি খাটাইয়া পরিশ্রমের সঙ্গে, লোকের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া দোকান চালাইতে পারিলে দেখিবেন, দশ বৎসরের মধ্যেই আপনার অবস্থা ফিরিয়া যাইবে।" সেই সময় (১৮৮৭) হইতে বর্ত্তমান সময়ের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভাবিতাম বাপ্, কি ফক্কড়দলের পাল্লাতেই পড়িয়াছিলাম। যাহার পূর্ব্বপুরুষগণ গভর্ণমেণ্টের অধীনে দায়িত্বপূর্ণ ভাল ভাল চাকরী করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরই একজন বংশধর একশত টাকা বেতনের চাকরী ছাড়িয়া অবশেষে পান, সিগারেট ও চায়ের দোকান করিবে। ইহা অপেক্ষা

লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে! এখন দেখিতেছি ছোকরাগুলা ঠিক কথাই বলিয়াছিল। দেখিতেছি বি,এ পাশ করিয়া অনেক গ্রাজুয়েট ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনের চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন। অপরদিকে দেখিতেছি সামান্য লেখাপড়া জানা অনেক ভদ্র সন্তান কেহ মনোহারী দোকান, কেহ দর্জ্জির (Tailoring) দোকান, কেহ খাবারের দোকান করিয়া প্রতি মাসে খরচ খরচা বাদে ষাট, সত্তর, আশি একশত টাকা নির্ব্বিরোধে, বিনা ঝঞ্ঝাটে উপার্জ্জন করিতেছেন। আর একদিকে দেখিতেছি সামান্য বাঙ্গালা, সামান্য ইংরাজী জানা অনেক পল্লীবাসী ভদ্র সন্তান চাষ আবাদের দ্বারা বেশ স্বচ্ছল-ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, এমন কি দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি ব্যয় বাহুল্য উৎসবেও বেশ দশ টাকা ব্যয় করিতেছেন। তবে তাঁহারা পরিশ্রমী, কোনরূপ বিলাসিতা বা বাবুগিরি তাঁহাদের নাই, শরীরও তাঁহাদের বেশ সুস্থ ও সবল। এই শ্রেণীর লোককে কখন আলস্যে, দিবানিদ্রায় বা তাস পাশায় সময় নষ্ট করিতে দেখি নাই। এই অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা সময়ের মূল্য বেশ বুঝিয়াছেন বাল্যকাল হইতে কৃষাণদের সঙ্গে সমানভাবে খাটিয়া বেশ কর্ম্মঠ হইয়াছেন। চাকুরে বাবুদের অবসর সময় হয় ঘুমাইয়া, অথবা থিয়াটার বায়স্কোপ দেখিয়া বা নভেল পড়িয়াই অতিবাহিত হয়। ইহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জানিনা, ভগবান কখনও এই শ্রেণীর লোকদের চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া সাংসারিক উন্নতির প্রকৃত পথ দেখাইবেন কিনা।

ইংরাজী ১৮৮৯ সালে নোয়াখালি হইতে বর্দ্ধমানে বদ্‌লী হইয়াছিলাম। আর আজ ১৯২৯ সালের ১৮ই এপ্রিল। এই সময়ের মধ্যে নানাস্থানে, নানারূপ কাজে থাকিতে হইয়াছিল, কতরকম বিভিন্ন প্রকৃতি লোকের সঙ্গে মিশিতে হইয়াছিল, কত রকম সৎশিক্ষা, অসৎশিক্ষা পাইয়াছিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। সে সকল বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিবার শক্তি আর নাই; বিশেষতঃ বিগত ফেব্রুয়ারী মাসের ৬ই তারিখ হইতে মার্চ্চ মাসের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত নানাবিধ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া একেবারে শয্যাশায়ী ছিলাম; সম্প্রতি একটু উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছি মাত্র। সুতরাং আমার নোয়াখালি পরিত্যাগের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্র জীবনের কথাগুলি অতি সংক্ষেপেই লিখিতে হইবে। জানিনা, ইহার মধ্যেই ভব-লীলা সাঙ্গ হইবে কিনা। তাহা হইলে আখ্যায়িকাটি অসমাপ্তই রহিয়া যাইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নোয়াখালি পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে দিগনগর উপস্থিত হইলাম। আমাদের পরম হিতৈষী বন্ধু বৃদ্ধ নন্দকুমার চক্রবর্ত্তী কিছুদিন পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তিনিই আমাদের ঘর বাড়ী ও সামান্য বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার অভাবে মাতুল মহাশয়ের পিসতুত ভাই লালবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর সমস্ত ভার দেওয়া হইয়াছিল। পরিবারদিগকে দিগনগরে রাখিয়া আমি একাই বর্দ্ধমানে যাত্রা করিয়া বাবু বিনোদ বিহারী সরকার, সব ডেপুটী কালেক্টর মহাশয়ের সঙ্গে থাকিবার বন্দোবস্ত করিলাম। তাঁহার পরিবারবর্গ তখন সেখানে ছিলেন না। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই আমাকে বর্দ্ধমান হইতে মেদিনীপুর জেলার সদরে পাঠান হইল। মেদিনীপুর আমার পরিচিত স্থান; সেখানে আমাদের পরিবারের বন্ধু বান্ধব অনেকেই আছেন; স্থানও বর্দ্ধমান অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর। এই সকল কারণে এই পরিবর্ত্তনে দুঃখিত না হইয়া বরং আনন্দিত হইয়াছিলাম। হঠাৎ এই বদলীর কারণটীও নিম্নে লিখিতেছি ঃ—

বাবু বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই সময় মেদিনীপুরে, খাসমহাল, সেটেলমেণ্ট, ল্যাণ্ডরেজিষ্ট্রেসন প্রভৃতি অনেকগুলি রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর হইয়া

আসিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী ভাষা একেবারেই জানিতেন না। অথচ সমস্ত কাজই ইংরাজীতে করিতে হয় বলিয়া ইংরাজী জানা একটী সবডেপুটীকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করিয়া দেওয়া প্রয়োজন বোধে কমিশনার বাহাদুর আমাকেই মেদিনীপুরে পাঠাইয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বর বাবু থাকবস্ত জরীপের আফিসে দশ টাকা বেতনের আমীনের মোহরার রূপে সরকারী কাজে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ যোগ্যতা বলে এবং ভগবানের কৃপায় ক্রমে ক্রমে ঐ আফিসের সর্ব্বোচ্চ পদ অর্থাৎ (Superintendent of Thakbast Survey) থাকবস্তের সুপারিন্টেডেন্টের পদ লাভ করিয়াছিলেন। এই কাজ শেষ হইবার পরে তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইনি অতি সরল, উদার প্রকৃতির সদাশয় লোক ছিলেন। একেবারে সাদাসিদা, হাকিমী চালচলন একেবারেই ছিল না। তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইয়া খুব আনন্দে, খুব উৎসাহে ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলাম। মেদিনীপুরে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় প্রায় এক সপ্তাহ কাল থাকিয়া তারপর একটী পৃথক বাসা করিয়াছিলাম। উপেন্দ্র বাবু সেকালের উকীল, জগদানন্দ বাবুর মধ্যম ভ্রাতা গঙ্গানন্দ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। জগদানন্দ বাবু গভর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি আমাদের ভূতপূর্ব্ব ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যে সময় যুবরাজ অবস্থায় ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, সেই সময় জগদানন্দ বাবু তাঁহাকে

এবং সেই সঙ্গে গভর্ণর জেনারেল, লেফট্‌ন্যাণ্ট গভর্ণর প্রভৃতি অনেক বড় বড় লোককে তাঁহার ভবানীপুরস্থ প্রাসাদতুল্য ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহাদেব পদোপযুক্ত আহারাদি এবং আমোদ প্রমোদের আয়োজন করিয়াছিলেন। পুরস্ত্রীগণ উলুধ্বনি ও মঙ্গল শঙ্খ বাজাইয়া যুবরাজের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতেই জগদানন্দ বাবুর মানমর্য্যাদা, পসার, প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। স্থানীয় বড় বড় সাহেববর্গকেও সময় সময় ভোজ দিতেন। প্রবাদ আছে একজন সাহেব (কোন চিফ সেক্রেটারী) বলিয়াছিলেন ঃ—(We ought to be grateful to the Babu for his Champagne, if for nothing else) অর্থাৎ "বাবু আমাদিগকে যে স্যাম্পেন পান করাইতেছেন অন্ততঃ সেজন্যও আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।" সেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ জগদানন্দ বাবুর সহোদর, গঙ্গানন্দ, বিমলানন্দ, শ্যামলানন্দ ও বগলানন্দ এবং পুত্র শ্যামাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ এবং তাহার পরে গঙ্গানন্দ বাবুর পুত্র উপেন্দ্র বাবু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটী গল্প বলিতে হইতেছে। জেলা বীরভূমের অন্তর্গত রাইপুরের জমিদার স্বর্গীয় প্রতাপ নারায়ণ সিংহ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পুত্র ব্রহ্ম প্রসাদ সিংহ আমাদের সহপাঠী ছিলেন। তাঁহার পিতৃব্য চন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয়ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। একদিন কোন একটা বিষয় সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক স্থলে উপেন্দ্র বাবু ব্রহ্ম প্রসাদকে বলিয়া-

ছিলেন ঃ—"Brahma Prosad you are proud of only two Deputy Magistrates, but half a dozen Deputy Magistrates are breeding in my family every morning." এই "নন্দ বংশীয়" সকলের সঙ্গেই পিতৃব্যদেব মহেন্দ্র নারায়ণের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। সেই কারণেই, বিশেষতঃ পাঠ্যাবস্থায় যখন বাঁকুড়ায় ছিলাম, তখনও তাঁহার সহিত বিশেষ পরিচয় থাকায় উপেন্দ্র বাবু আমাকে পরম যত্নে তাঁহার বাসায় স্থান দিয়াছিলেন এবং অকৃত্রিম বন্ধুর ন্যায় আমার তত্ত্বাবধান করিতেন।

আর একটী আমোদজনক বিষয়ের উল্লেখ করিতে ভুল হওয়ায় এই স্থানেই সেটী সংক্ষেপে লিখিতেছি। জগদানন্দ বাবু যুবরাজকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাটীতে লইয়া যাওয়া উপলক্ষ করিয়া কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটী বিদ্রূপাত্মক অথচ হাস্যোদ্দীপক সরল কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতাটীর মাত্র দুই এক লাইন এখন মনে পড়িতেছে। যথা ঃ—

"আঁকড়োধারী বাঁকড়োবাসী মুড়ী খান রাশি রাশি।"

"অবাক করলি মুখুয্যের পো ক্যাবাত ক্যাবাত।"
"রাণীর ছেলে ধরলো এসে হলুদ মাখা হাত।"

অর্থাৎ পুরস্ত্রীবর্গের সহিত যুবরাজকরমর্দ্দন করিয়া ছিলেন

সে সময় বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবি ছিলেন, মুড়িই তাঁহাদের প্রধান জলখাবার ছিল। অর্থাৎ কোন সময়ে পলাণ্ডু, কাঁচা লঙ্কা ও মরিচ সংযোগে শুষ্ক মুড়ি, কখন জলে ভিজাইয়া "ভিজান মুড়ি" কখনও বা গুড় মুড়ির উপরেই দরিদ্র এবং মধ্যশ্রেণীর কৃষিজীবিদের নির্ভর ছিল। আবার সেই সময় এবং তাহার পরবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকেই প্রতিদিন স্নানের সময় প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতেন। মেয়েলী ছড়ার মধ্যেও হরিদ্রার গুণ বর্ণনা থাকিত; যথা ঃ—"হলুদ মাখা গোরা গা, গরবে না পড়ে পা।" জগদানন্দ বাবুর আদি নিবাস বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ময়নাপুর গ্রামে; বর্ত্তমান সময়েও তাঁহাদের অনেক জ্ঞাতি, গোষ্ঠী সেখানে বাস করিতেছেন। সেই জন্যই কবিবর তৎসাময়িক বাঁকুড়া জেলার বিশেষত্বগুলি অবলম্বন করিয়া কবিতাটী লিখিবার সুযোগ লইয়াছিলেন।

মেদিনীপুরে প্রায় এক বৎসর ছিলাম। এই সময়টী উপেন্দ্র বাবু, বিশ্বেশ্বর বাবু ব্যতীত বাবু রাজেন্দ্র নাথ রায়, মৌলবী আব্দুল কাদের সাহেব, বাবু সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য (দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান) ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, বিনয় কৃষ্ণ বসু ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, রায় বাহাদুর বিপিন বিহারী দত্ত গভর্ণমেণ্ট উকীল বাবু অর্পণাচরণ দত্ত, কেদার নাথ মিত্র উকীল, সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় উকীল, ডাক্তার ভুবনেশ্বর মিত্র (পূর্ব্ব পরিচিত) ডাক্তার দুর্গানন্দ দাস আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন, বাবু কৃষ্ণ কিশোর আচার্য্য

জেলা বোর্ডের সেক্রেটারী প্রভৃতি অনেকগুলি হাকিম ও উকীল এবং চৌধুরী যামিনী নাথ মল্লিক এবং রাধা গোবিন্দ চৌধুরী জমিদার মহোদয়গণের সঙ্গে নানাবিধ আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত হইয়াছিল। মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের অধ্যক্ষ সে সময় ছিলেন বাবু নওরঙ্গী লাল মাড়োয়ারী। ইনি আমাদের সঙ্গে অবাধে মিশিয়া আহারাদি করিতেন, আমাদেরও নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। মাছ, মাংস খাইতেন না, খাওয়াইতেনও না। পরে ইনি রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছিলেন এবং জয়পুর রাজ্যের সমস্ত জেলখানার পরিদর্শনের ভার পাইয়া উচ্চ বেতনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাবু দেবেন্দ্র নাথ মজুমদার কোর্ট সব ইনসপেক্টার ভূপতির বিশেষ বন্ধু ছিলেন, সেই সূত্রে আমার সঙ্গেও আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। ইনি প্রগাঢ় ব্রাহ্ম ছিলেন, স্বভাব চরিত্র পবিত্র, স্বভাব অমায়িক এবং সকলের সহিত ব্যবহার অতি প্রশংসনীয় ছিল। পরে ইনি ইনসপেক্টর পদে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার সঙ্গে আরও দুইস্থানে চাকরী করিয়াছিলাম। জীবিত ও সক্ষম থাকিয়া যদি এই আখ্যায়িকা শেষ করিতে পারি তাহা হইলে উপযুক্ত স্থানে আবার দেবেন্দ্র বাবুর কথা উল্লেখ করিব।

মেদিনীপুরে এক বৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই আমাকে পুনরায় বর্দ্ধমান সদরে বদলী করা হইল। এই বদলীর কারণ, প্রিয় সুহৃদ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নগেন্দ্র নাথ ঘোষ, বর্দ্ধমানে বদলী হইয়া আসিয়াছিলেন। বাবু প্রাণকুমার দাস কমিশনারের পার্শন্যাল আসিষ্ট্যাণ্ট ছিলেন। জগমোহন ভট্টাচার্য্য (জগবন্ধু

বাবুর সহোদর), শ্যামাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, সত্যতারণ মুখোপাধ্যায় সুরেশ চন্দ্র সেন প্রভৃতি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ,ডাক্তার মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত বর্দ্ধমান রাজষ্টেটের ডাক্তার, বাবু নলিনাক্ষ বসু উকীল, বাবু বামাচরণ প্রামাণিক আসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, গিরীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ইনসপেক্টার প্রভৃতি অনেক-গুলি গণ্যমান্য ভদ্রলোক সেই সময় সন্ধ্যার সময় সম্মিলিত হইতেন, এবং নানাবিধ আমোদে কাটাইতেন। আমাকে বর্দ্ধমানে আনিতে পারিলে গান বাজনা করিবার একটা লোকের যোগাড় হয়, এই জন্যই নগেন্দ্র নাথ ও প্রাণ কুমার বাবুর চেষ্টায় আমি পুনরায় বর্দ্ধমানে বদ্‌লী হইয়াছিলাম। মেদিনীপুরের বন্ধুবর্গ আমার এই অপ্রত্যাশিত বদ্‌লীতে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া-ছিলেন। উপেন্দ্র বাবু কহিলেন "যোগেন, You say Nagen wants you at Burdwan, but many a Nagen wanted you here." যাহা হউক বর্দ্ধমান যাত্রা করিবার পূর্ব্বে যে কয়দিন মেদিনীপুরে ছিলাম, সে কয়দিন একবেলাও বাটীতে আহার করিতে হয় নাই ; বিদায়ী ভোজ খাইয়াই এ কয়টা দিন কাটিয়াছিল। মেদিনীপুর অবস্থিতি সময়ে আমার পিতৃব্য কন্যা প্রভাবতীর সহিত, পত্নীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পরেশ নাথ ভট্টাচার্য্যের বিবাহ হইয়াছিল এবং তাহার কিছুদিন পরেই শ্বশুর মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

ইংরাজী ১৮৯০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বর্দ্ধমানে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। পূর্ব্বোল্লিখিত হাকিম, উকীল,

ডাক্তার এবং রাজকর্ম্মচারীবর্গ বাদে স্বনাম খ্যাত রাজা বনবিহারী কাপুর তাঁহার শ্বশুর বাবু বংশগোপাল নন্দে, বংশগোপাল বাবুর পুত্রগণ, বাবু প্রহ্লাদ দাস বর্ম্মণ, বাবু দ্বারিকা নাথ মিত্র জমিদার, বাবু কালিদাস মল্লিক রাজ কলেজের প্রফেসার, বাবু উমেশ চন্দ্র গোস্বামী আবগারী সব ডেপুটী (পরে আবগারীর ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছিলেন) ; বাবু সতীশ চন্দ্র চৌধুরী, দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি জুনিয়ার উকীলবর্গের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম। প্রথমে নগেন বাবুর বাসার সন্নিকটেই একটী বাসা ভাড়া লইয়াছিলাম, কিন্তু আফিস হইতে অনেক দূর বলিয়া আফিসের কতকটা নিকটে আর একটী বাসায় উঠিয়া গিয়াছিলাম। এই পাড়ায় উঠিয়া আসিবার পর গভর্ণমেণ্ট উকীল বাবু সত্য কিঙ্কর সেন, তাঁহার ভ্রাতা রাজষ্টেটের Legal member বাবু আশুতোষ সেন, বাবু সজনী কান্ত মুখোপাধ্যায়, বাবু বেনোয়ারি লাল হাতি এবং রায় বাহাতুর নলীণাক্ষ বসুর পুত্র বাবু শরৎ চন্দ্র বসু উকীলবর্গের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলাম। এই শরৎ বাবু আজকাল একজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যবহারাজীব হইয়াছেন। শুনিতেছি ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে মক্কেল আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে এবং তাঁহার ওকালতির আয় নাকি বার্ষিক লক্ষাধিক মুদ্রার উপর উঠিয়াছে। বাবু সতীশ চন্দ্র চৌধুরী অতি সুচতুর, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন উকীল হইলেও ভাগ্যদোষে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাবু বেনোয়ারি লাল হাতি উত্তরকালে গভর্ণমেণ্টের উকীল হইয়া

"রায় বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছিলেন। বাবু দেবেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক কালনার অন্যতম জমিদার বংশ সম্ভূত। ইঁহার পিতা স্বর্গীয় উপেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক মহাশয়, সবজজ ছিলেন। তিনি কলিকাতায় শিয়ালদহে একখানি সুন্দর পাকা বাড়ী ক্রয় করিয়া অবসর লইবার পর সেইখানেই বাস করিতেন। দেবেন্দ্রকে বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিয়া হাইকোর্টে ওকালতিতে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন। দেবেন্দ্র চন্দ্র ক্রমে ক্রমে কলিকাতায় অনেকগুলি বাড়ী ক্রয় করিয়া যথেষ্ট আয় করিয়াছেন এবং ওকালতি অপেক্ষা লেখাপড়ায় ও ইংরাজীতে প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি লিখিবার দিকে সমধিক একাগ্রতা থাকায় এবং দুর্ভাগ্য ক্রমে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় ওকালতি ব্যবসায় বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার দুইটী পুত্র, ভূপতি ও পশুপতি। ভূপতির স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায়, তাহাকে লইয়া দেবেন্দ্র বিশেষ মনোকষ্টে আছেন। ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে ভূপতির মৃত্যু হয়। পশুপতি ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে কাজকর্ম্ম করিতেছেন। দেবেন্দ্র সিমুলতলাতেও সুন্দর বাড়ী, বাগিচা প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া অনেক সময় সেখানেও অতিবাহিত করেন। পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু-বর্গের মধ্যে আমাকে সেই পূর্ব্বের ন্যায় আদর যত্ন করিবার যে তিন চারিটী বন্ধু এখনও বর্ত্তমান আছেন, তাহার মধ্যে দেবেন্দ্র একজন। কলিকাতায় যাইয়া যে কোন স্থানেই থাকা হউক, দেবেন্দ্র সংবাদ পাইলেই আমাকে দুই চারি বেলা তাঁহার বাটীতে আহারাদি না করাইয়া ছাড়েন না। কখন কখন তাঁহার বাটীতেও অবস্থিতি করিয়া থাকি।

বৰ্দ্ধমানের পরিচিত গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগের কথায় বৰ্দ্ধমান নগরের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। রাজবংশের কীর্ত্তি লইয়াই বৰ্দ্ধমানের গৌরব। প্রসস্থ, সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত প্রাসাদ ও অট্টালিকা শ্রেণী, সুন্দর সুবিশাল বৃক্ষরাজি শোভিত সরোবর, শত শত দেবালয়, রমণীয় উদ্যান, পশুশালা, অতিথিশালা, কলেজ, লাইব্রেরী প্রভৃতি দেখিয়া এই প্রাচীন রাজবংশের শ্রীসমৃদ্ধি, লোকপরতা এবং দয়া দাক্ষিণ্যাদির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য সমাজের শিক্ষা, দীক্ষা, নীতি প্রভৃতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৰ্ত্তমান মহারাজাধিরাজ, মহারাজ কুমার এবং মন্ত্রী ও পরিষদবর্গের আচার ব্যবহার, রীতি নীতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কে বলিতে পারে যে কালে আরও পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। এখানে একটী মাত্র উদাহরণ দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৯০০ সালে বৰ্ত্তমান মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয় চন্দ্র মহতব বাহাদুরের নাবালক অবস্থায় ষ্টেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীনে ছিল। রাজা বনবিহারী ছিলেন ষ্টেটের ম্যানেজার। আমি সেই সময় ডেপুটী কালেক্টর পদে বৰ্দ্ধমানে ছিলাম। আমার জন্মভূমি দিগনগর গ্রামের স্কুলগৃহাদি সংস্কার জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করায় রাজা বনবিহারী পঞ্চাশ টাকা ষ্টেটের তহবিল হইতে দান করিয়াছিলেন। পরে আমার অবসর গ্রহণের পর ১৯১৬ সালে চক্রধরপুরের শ্রীশ্রী৺কালীমাতার মন্দির ফাণ্ডের অর্থ সংগ্রহ জন্য বাহির হইয়া বৰ্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া ছিলাম এবং একখানি লিখিত আবেদন পত্র

মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের নিকট পাঠাইয়া ছিলাম। অর্থ সাহায্য ত দূরের কথা, কোন প্রত্যুত্তর পর্য্যন্ত পাই নাই। রাজা বনবিহারীকে এই কথা বলায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন "ওসকল কথা আর আমায় বলিবেন না।" রাজা বনবিহারী নিজ তহবিল হইতে পঁচিশ টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন।

তিন মাস মাত্র বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করিবার পর আমাকে কয়েক মাসের জন্য রাণীগঞ্জে বদলী করা হইয়াছিল। রাণীগঞ্জ স্থানটী বেশ মনোনীত হওয়ায় এবং তথাকার গণ্যমান্য ভদ্রলোকগুলির সঙ্গে অল্পদিনেই সম্প্রীতি স্থাপন হওয়ায় রাণীগঞ্জ হইতে শীঘ্র বদলী হইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বন্ধুবর নগেন্দ্র নাথ ঘোষ, প্রাণকুমার দাস এবং ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর খ্যাতনামা রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়গণের চেষ্টায় কয়েক মাস পরেই আমি পুনরায় বর্দ্ধমান সদরে আনীত হইয়াছিলাম। রাণীগঞ্জে অবস্থিতিকালে শিয়াড়সোলের প্রসিদ্ধ জমিদার গোবিন্দ প্রসাদ পণ্ডিত মহাশয়ের দৌহিত্র বাবু দক্ষিণেশ্বর মালিয়া মহাশয়ের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। ইঁহার জমিদারীর মধ্যে অনেক স্থানে কয়লার খনি ছিল। আমাকে একটী কয়লার খাদ বন্দোবস্ত দিতেও চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময় গভর্ণমেণ্টের চাকরীতে রাণীগঞ্জে ছিলাম বলিয়া লইতে সাহস হয় নাই; বেনামী করিয়াও লইতে পারিতাম, পরে অন্য জেলায় বদলী হইলে নিজ নামে করিয়া লইলে হইতে পারিত কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বিষয় বুদ্ধি হয় নাই। সে সময় সদাশয় দক্ষিণেশ্বর বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলে, আজ পুত্র

প্রমথ নাথকে তাহার বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কোন চিন্তাই করিতে হইত না। অন্য অন্য স্থানেও কিছু বিষয় সম্পত্তি করিবার সুযোগও ঘটিয়াছিল, কিন্তু সেই সকল সুযোগ হেলায় হারাইয়া এই শেষ সময়টায় কেবল পরিতাপ করিতে হইতেছে।

রাণীগঞ্জ হইতে বর্দ্ধমানে আসিয়াই শুনিলাম নগেন্দ্র বাবু বালেশ্বর জেলায় ভদ্রক মহকুমার ভার পাইয়া বদলী হইয়াছেন। তাঁহার বদলীতে যৎপরোনাস্তি মনোকষ্ট হইয়াছিল। ইঁহার ন্যায় প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু জীবনে দুই চারিটী মাত্র পাইয়াছিলাম। নগেন্দ্র বাবুর বিদায় উপলক্ষে কয়েকদিন ধরিয়া বিদায়ীভোজ এবং তদানুসঙ্গিক নাচ তামাসা চলিয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে আমি দুইবার উপর্য্যুপরি কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হইয়াছিলাম। পরিবারবর্গ সে সময় প্রায় দিগনগরেই থাকিতেন। সুতরাং বন্ধুবান্ধব বর্গের অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষার গুণে কোন অসুবিধা হয় নাই। শেষবার পীড়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বন্ধুবর সত্যতারণ মুখোপাধ্যায় দিগনগরে টেলিগ্রাম করিয়া আমার পরিবারবর্গকে বর্দ্ধমানে আনাইয়া ছিলেন। এই সময়ের কয়েকমাস পরেই গেজেটে দেখিলাম আমাকে চট্টগ্রাম জেলায় আসিষ্ট্যাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। শুনিলাম আমার সে সময়ের বেতন একশত পঞ্চাশ টাকা বাদে, মাসিক পঞ্চাশ টাকা এলাউয়েন্স (allowance) এবং বারবরদারি বাবদও মাসিক প্রায় দেড়শত টাকা পাইব। এ সংবাদে কাহারই বা আনন্দ না হয়। যথাকালে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনী কান্ত

পাল এবং শ্যামাচরণ উপাধ্যায় নামক পাচক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া ১৮৯১ সালের নভেম্বর মাসে চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম। পরিবারবর্গকে শান্তিপুরে রাখিয়া গিয়াছিলাম। একটী জীর্ণ পাকা বাড়ী অন্যূন দুই শত টাকা ব্যয়ে সংস্কার করাইয়া ১৮৯২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পরিবারবর্গকে চট্টগ্রামে আনাইয়াছিলাম। সেই সময় স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীর পিসতুত ভাই গৌর মোহন গোস্বামী চট্টগ্রামে পাবলিক ওকার্ক ডিপার্টমেণ্টে কেরাণীগিরি করিতেন এবং তাঁহার সহোদর পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী কণ্ট্রাক্টরের কাজ করিতেন। আমি একটা বড়লোক হইয়াছি, অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেছি। সুতরাং পূর্ণচন্দ্রের আত্মীয়তা হঠাৎ খুবই বাড়িয়া উঠিল। আর একদিকে কনিষ্ঠা শ্বশ্রূমাতা-ঠাকুরাণী, শ্যালক পরেশ নাথ, তৎপত্নী প্রভাবতী এবং পূর্ণচন্দ্রের পত্নী ও শিশু কন্যা আমার পরিবারবর্গের সঙ্গে চট্টগ্রামে আসিয়া আমার বাসাতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরেশ নাথ মাতা ও পত্নী সহ ৺চন্দ্রনাথ ও আদিনাথ তীর্থ দর্শন করিয়া দুই মাস চট্টগ্রামে অবস্থিতি করিয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান চাকরীটী পাইয়া মনে কতই আশা কতই কল্পনা করিয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম চারি বৎসরকাল এই কাজে থাকিতে হইবে এবং যোগ্যতার সহিত কাজ করিতে পারিলে সত্বরই ডেপুটী কালেক্টরী পদে উন্নতি লাভ করিতে পারিব। বোধ হয় তাহা হইতেও পারিত ; কারণ প্রথম হইতেই কর্তৃপক্ষ আমার কার্য্যে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমনকি

আমার নিজের প্রবর্ত্তিত দুই একটি attestation ফরম অন্যান্য আসিষ্ট্যাণ্টদের আফিসেও প্রচলিত করা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত সেটেলমেণ্ট অফিসার বাহাদুর (Mr. F. A. Slacke I. C S.) "Soil map" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—"Those prepared by Mr. Allan and Babu J. N. Chakrabarthy were very fair." আমি সর্ব্ব প্রথমেই যে একটী Village note প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে সাহেব বাহাদুর লিখিয়াছিলেন ঃ—"This is very creditable for a first report" বর্ষার সময় অন্যান্য আসিষ্ট্যাণ্টগণকে কয়েক মাসের জন্য অবসর দিয়া, কেবল আমাকেই সাতটী ক্যাম্পের আফিস সংক্রান্ত (office work) কার্য্য পরিদর্শনে রাখিবেন বলিয়া আফিস অর্ডার বুকেলিখিয়া রাখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ পাঁচ মাস পরেই সাংঘাতিকরূপ পীড়াক্রান্ত হইয়া বিদায় লইতে বাধ্য না হইলে খুব সম্ভব ১৮৯১বা ১৮৯২ সালেই ডেপুটী কালেক্টর পদে উন্নতি লাভ করিতে পারিতাম। আমি যে ভারি উপযুক্ত কর্ম্মচারী ছিলাম, সেই গর্ব্বে যে এই সকল বিষয় লিখিতেছি তাহা যেন কেহ মনে না করেন। এইটী বংশধরদিগের গোচর করার অভিপ্রায়েই বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করা হইল। এই Mr. Slacke পরে কিছুদিনের জন্য বাঙ্গালার লেফট্‌ন্যাণ্ট গভর্ণর হইয়া তার পরেই অবসর গ্রহণ করেন। আর এই Mr. Allan I. C. S. পরে Derector of Land Records and Agriculture এবং তারপরে Calcutta কর্পোরেশনের চেয়ার

ম্যান হইয়াছিলেন। অল্প বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে না হইলে ইনি আরও উচ্চপদ লাভ করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

চট্টগ্রামের প্রধান তীর্থ চন্দ্রনাথ। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে এই তীর্থটী এই সময়, এবং ১৮৯৮ সালে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে যখন পুনরায় চট্টগ্রামে গিয়াছিলাম, তখনও দর্শন হয় নাই। চট্টগ্রাম জেলা এবং পার্ব্বতীয় চট্টগ্রাম (Hill tracts) জেলার সন্ধি-স্থলে কোন একটী গ্রামে মনে হয় চৈত্র সংক্রান্তির সময় "মহামুনির" মেলা বসিত। পত্নীর একান্ত আগ্রহে সেই মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। আমার ক্যাম্পের একটী আমীনের বাস ছিল সেই গ্রামে। আমরা মেলা দেখিতে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি জানিতে পারিয়া তিনি নিজ বাটীতেই আমাদিগের বাসা নির্দ্দিষ্ট করিলেন। আমরা যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া পরম সমাদরের সহিত আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। দেখিলাম তাঁহারা বেশ অবস্থাপন্ন বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ। অনেকটা স্থান জুড়িয়া ভবন, সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ, অন্দরে বাহিরে অনেকগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তৃণাচ্ছাদিত বড় বড় ঘর, গোশালা, ধানের গোলা প্রভৃতি রহিয়াছে। আমাদিগকে দুইবেলা অতি যত্নের সহিত নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্যের দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকদিগকে বাটীর ভিতরে লইয়া যাইয়া, তাঁহার বাটীর পরিজনবর্গ তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়াছিলেন। নানা-বিধ মিষ্টান্নের দ্বারা জলযোগের কাজ সম্পন্ন হইলে, প্রত্যেকের সম্মুখে এক, এক ডিবা পানের খিলি এবং সুগন্ধি তামাক সাজা

কলিকাসহ এক, একটী বাঁধান হুকা দেওয়া হইয়াছিল। সেখানকার স্ত্রীলোকের মধ্যে তাম্রকূট সেবন প্রচলিত থাকায় অথবা সম্মান প্রদর্শনের জন্য ও এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। মহামুনির মেলায় দেখিলাম, স্বাধীন ত্রিপুরা, আরাকাণ, ব্রহ্মদেশ এবং পার্ব্বতীয় নানাস্থান হইতে কতরকম পণ্যদ্রব্য, সেই সমস্ত দেশজাত নানাবিধ বস্ত্র, কৌটা, ছাতা, ছড়ি, শীতল পাটী প্রভৃতি বিক্রয় হইতেছে। আমরা কেবল কয়েকটা কৌটা এবং অনেক-গুলি শীতলপাটী ক্রয় করিয়াছিলাম।

চট্টগ্রামের অন্য একটী থানায় কাজ করিবার সময় একদিন ক্যাম্প উঠাইয়া এক গ্রাম হইতে চারিক্রোশ দূরবর্ত্তী আর একটী গ্রামে যাওয়া হইয়াছিল। তাম্বুগুলি আনিতে এবং খাটাইতে বিলম্ব হইবে বলিয়া সেই গ্রামবাসী একটী সঙ্গতিপন্ন বৈষ্ণব পরিবার সেদিন তাঁহাদের নিজ বাটীতে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা তিন সহোদর, সকলেই প্রবীন, সকলেরই মাথায় সুদীর্ঘ শিখা, সকলেরই মুণ্ডিত মস্তক, পরিধানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাদা ধুতি; গলায় তিন চার ফের তুলসীমালা, কপালে তিলক, সর্ব্বাঙ্গে রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত ছাপ। সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গনের একদিকে হরিমন্দির, তাহার মধ্যে নানাবিধ বিগ্রহ মূর্ত্তি। অন্দরের দিকে দ্বিতল পাকা কোঠা, বাহিরের সকলগুলিই কাঁচাঘর; কিন্তু সুপ্রশস্ত, সুদৃশ্য এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বৈঠকখানা ঘরেই প্রথমে আমাকে এবং আমার কর্ম্মচারীবর্গকে লইয়া যাওয়া হইল। দেখিলাম দেওয়ালে

দশাবতারের ছবি, ভগবানের গোকুল ও বৃন্দাবনের লীলার যথা,—"যমলার্জ্জুন ভঙ্গ" "পূতনা বধ," "বকাসুর বধ," "কালীয় দমন," "গোবর্দ্ধন ধারণ," "কৃষ্ণকালী" "কলঙ্ক ভঞ্জন" প্রভৃতি আর্ট স্কুলের নানাবিধ সুদৃশ্য চিত্র সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। আমরা হাত মুখ ধুইয়া বসিতে বসিতেই সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইল। কর্ত্তারা, ছেলেরা, ছোট ছোট মেয়েগুলি পর্য্যন্ত "গললগ্নীকৃতবাসে" যুক্ত করে মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আরতি দর্শনান্তর বৈষ্ণবদিগের প্রথামত সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া উঠিলেন। আমরাও ভদ্রতার খাতিরে, হয়ত সাময়িক উত্তেজনা বা সংক্রামক মনোবৃত্তিবশে প্রায় সেইরূপ ভাবেই আরতি দর্শন এবং প্রণিপাত আদি সমাধা করিয়াছিলাম। তারপর নানাবিধ ফলমূল. ক্ষীর, ছানা, নানা-প্রকার সরবৎ এবং সন্দেশাদি প্রসাদ পাইয়া গল্প গুজব আরম্ভ করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই হরিমন্দিরের সম্মুখে পুনরায় মৃদঙ্গ ও করতালের শব্দ এবং হরিধ্বনি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন আবার কি হইতেছে? উত্তর হইল, "বলিদান হইতেছে।" আমি ত অবাক্। জিজ্ঞাসা করিলাম, এই বৈষ্ণব পুরীতে হরি-মন্দিরের সম্মুখে খোল, করতাল বাজাইয়া হরিধ্বনি সহ জীব-হিংসা কিরূপে হইতেছে। মধ্যম কর্ত্তা ঈষৎ হাসিয়া একখানি পুস্তক বাহির করিলেন। চশমার সাহায্যে কিছুক্ষণ পাতা উল্টাইয়া পরে একটী স্থান পড়িয়া শুনাইলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে খাসীরা ভগবানের নিকট সকরুণ স্বরে কাঁদিয়া কহিতেছে, হে ভগবান্! ছাগকুল (পাঁঠা) মায়ের সম্মুখে বলিপ্রাপ্ত হইয়া

একেবারে উদ্ধার হইয়া যাইতেছে ; কিন্তু আমাদের ইতিপূর্ব্বেই মুস্কচ্ছেদ হইয়াছে, আমরা ত অপবিত্র হইয়াছি। আমাদের ত আর মায়ের সম্মুখে বলি দিবে না ; অতএব আমাদের উদ্ধারের উপায় কি ? এই কথা শুনিয়া ভগবান হরি খাসীদিগকে আশ্বাস প্রদান করিলেন যে তোমাদিগকে আমার মন্দিরের সম্মুখে বলিদান দেওয়া হইলেই তোমরা উদ্ধার হইয়া যাইবে। হরি মন্দিরের সম্মুখে খাসী বলিদানের এই কারণটী ইতিপূর্ব্বে শুনি নাই। যাহা হউক, আমাদের শাস্ত্র সমুদ্র বিশেষ, বিধি বিধানের সংখ্যা করা যায় না। এইরূপ শাস্ত্র, পুরাণ বা বিধি থাকিতেও পারে।

ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া আমার উন্নতির আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া দেশে আসিয়াছিলাম। দেশের তৎসাময়িক অবস্থা, গ্রাম্য সমাজের ও সংসারের অবস্থা এস্থলে লিখিতে হইলে অনেক কথাই লিখিতে হয়। অনেকটা সময় অপব্যয় হয়, অথচ আমার আর শক্তি সামর্থ্য নাই। সময়ও বোধ হয় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। স্নুতরাং সে সকল বিষয় এস্থলে লেখা হইল না। বংশধরগণের মধ্যে কাহারও যদি সেই সকল বিষয় জানিবার জন্য কৌতূহল ও আগ্রহ জন্মায়, তাহা হইলে তিনি আমার সেই সময়ের লিখিত জীবনীর ১ম খণ্ডের ১৪০ হইতে ১৪৬ পাতা পর্য্যন্ত পাঠ করিবেন।

বিদায় শেষে পুনরায় ভগবানের কৃপায় বর্দ্ধমান সদরেই আমাকে বদ্‌লী করা হইয়াছিল। কমিশনারের আসিণ্ট্যাণ্ট বাবু

প্রাণকুমার দাস এবং বেঙ্গল আফিসের জ্ঞান বাবুর প্রযত্নেই আমি পুনরায় বর্দ্ধমানে আসিতে পারিয়াছিলাম। পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধুবর্গ আমাকে পাইয়া অতীব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার বাল্যকালের সহপাঠী অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সময় কালেক্টরীর হেড ক্লার্ক ছিলেন। ইনি শেষদিন পর্য্যন্ত সমান-ভাবে আমার সহিত সৌহার্দ্দ্য বজায় রাখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে ইনি মেদিনীপুর কালেক্টরীর সেরেস্তাদারী পদে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। আমিও সেই সময় ডেপুটী কালেক্টরী পদে কিছু-দিন মেদিনীপুর সদরে, তারপর তমলুক মহকুমার ভার পাইয়া প্রায় সাড়ে তিন বৎসর তমলুকে ছিলাম। মাসে অন্ততঃ একবার করিয়াও সদরে আসিতে হইত। সেই সকল সময় প্রায়ই অনুকূলের আতিথ্য গ্রহণ করিতাম। চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করার পূর্ব্ব হইতেই অনুকূল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিজেই ঔষধাদি প্রস্তুত করা আরম্ভ করিয়াছিলেন। অবসর গ্রহণের পর নিজে একটী আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় খুলিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। আমি অবসর লইয়া চক্রধরপুরে অবস্থিতি করা সময়ে অনুকূল চিকিৎসা ব্যপদেশে দুই তিন বার সেখানে আসিয়াছিলেন। চিরদিনের প্রকৃত হিতৈষী বন্ধুকে পাইয়া কি যে আনন্দ হইত তাহা আর কি লিখিব। এই-বার বর্দ্ধমানে আসিবার পর আরও অনেকগুলি নূতন নূতন কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় এবং সৌহার্দ্দ্য হইয়াছিল। প্রথমেই

বাবু সুকুমার হালদার ডেপুটী কালেক্টরের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি সে সময় বর্দ্ধমান রাজষ্টেটের সেটেলমেণ্ট অফিসার পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার ন্যায় উন্নত চরিত্র, সদাশয়, অমায়িক, স্বাধীনচেতা, সুলেখক এবং নির্ভীক কর্ম্মচারী অতি অল্পই দেখা যাইত। ইঁহার সহিত আমার অবসর গ্রহণের পর, চক্রধরপুরে অবস্থিতি সময়ে পুনরায় দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইনি সেই সময় কিছুদিনের জন্য চাইবাসায় সদর সবডিভিসনাল অফিসার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। চক্রধরপুরে ইঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎটী বড়ই কৌতুকাবহ; সংক্ষেপে না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। একদিন মধ্যাহ্ন আহারের পর কি একটা কাজের জন্য কোন একটী প্রতিবেশী ভদ্রলোকের বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, একটী সাহেব আমার বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া কি লিখিতেছেন। আমি তথায় উপস্থিত হইয়া কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই, তিনি মাথার টুপিটা (hat) সম্মুখ দিকে টানিয়া মুখমণ্ডলের ঊর্দ্ধভাগ প্রায় ঢাকিয়া ফেলিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, Are you Mr. Chakrabartty? I was in service, but I am now without employ and looking for a job. Can you accommodate me somewhere for a day or two? আমি দেখিলাম মহা বিপদ; এ ফিরিঙ্গিকে বাসায় কোথায় রাখিব, কি খাওয়াইব? আমরা শাক, সুক্তা, ডাল, অম্বল খাইয়াই জীবন ধারণ করিতেছি। সেই সময় আমার

বাসাবাটীর অনতিদূরেই একটী ছোট পাকা বাড়ী ছিল, হঠাৎ মনে পড়ায় সেই বাড়ীটীর কথা সাহেবকে কহিলাম। তখন তিনি মাথার হ্যাট্ নামাইয়া আমাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক বাহু বেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "দাদা চিনিতে পারিলেন না, আমি যে সেই সুকুমার।" আমি বড়ই অপ্রতিভ হইলাম। কিন্তু আমারও যে বড় একটা দোষ ছিল তাহাও বলা যায় না। বাইশ বৎসর পরে ভায়াকে দেখিলাম, তাহার আকৃতির তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; আমারও চক্ষের দৃষ্টি খুব হীন হইয়াছে। যাহা হউক, অতি আনন্দে কতকটা সময় বেশ কাটিয়া গেল। তারপর অনেকবার তাঁহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে; এখন পর্য্যন্ত চিঠিপত্র লেখালেখি হইতেছে। (১৯২৯ এপ্রিল) আজকাল সুকুমার বাবু একটী কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অনুপালিত রাজার গার্জ্জেন (Guardian) পদে নিযুক্ত আছেন। রাঁচিতে তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব রাখাল দাস হালদার মহাশয় কিছু ভূসম্পত্তি এবং একটী পাকা বাড়ী করিয়া গিয়াছিলেন। সুকুমার বাবু সেই সম্পত্তির কতকটা উন্নতি সাধন করিয়া সেইখানেই বাস করিতেছেন। তাঁহার বাস ভবনের নাম "Samlong Farm".

দ্বিতীয় ব্যক্তি হইতেছেন, বাবু বসন্তকুমার রাহা, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। ইনি স্বর্গীয় ভুবন মোহন রাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনিও সুখ্যাতির সহিত অনেকদিন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী করিয়া অবসর গ্রহণান্তর এখন বাঁকুড়ায় ওকালতি করিতেছেন। ইঁহার মধ্যম সহোদর রায় বাহাদুর হেমন্ত কুমার রাহা এখন বাঙ্গালার

পোষ্টমাষ্টার জেনারেল এবং কনিষ্ঠ সহোদর শরৎ চন্দ্র রাহা বাঙ্গালার আবগারী কমিশনার (Commissioner of Excise and Salt, Bengal)। এরূপ ভাগ্যবান পরিবার খুব অল্পই দেখা যায়। যোগ্যতা না থাকিলে এরূপ উচ্চপদ লাভ কদাচ হয় না। সর্ব্বোপরি ভগবানের কৃপা।

এইবার বর্দ্ধমানে আসিবার কয়েকমাস পরেই পুত্র প্রমথ নাথের উপনয়ন দিবার আয়োজন করিবার জন্য হেমাঙ্গিনী এক মাস পূর্ব্বেই দিগনগর গিয়াছিলেন। এস্থলে উল্লেখ প্রয়োজন যে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ আদি সমস্ত কাজই তিনি বর্ত্তমানে দিগনগরেই নির্ব্বাহ হইত। বলিতেন, তাঁরা (অর্থাৎ স্বর্গগত পূর্ব্বপুরুষগণ) এক গণ্ডূষ জল পাইবেন বলিয়া প্রত্যাশা করিতেছেন, বংশধরদিগকে কত আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। দেশের লোকও আশা করে, তোমরা দাদাশ্বশুর, শ্বশুর এবং গ্রামবাসী অন্যান্য ভদ্রলোকের পদানুসরণ করিয়া দেশে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ কর, দশজনকে খাওয়াও, তবেই ত পিতৃপুরুষের নাম থাকিবে। এই সকল বিষয়ে মাথা ঘামাইতাম না; পত্নীর পরামর্শ মতই কলের ন্যায় পরিচালিত হইতাম। সুতরাং পত্নী তাঁহার নিজের ইচ্ছানুসারে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া পুত্রের উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। উপনয়ন উপলক্ষে কয়েক দিন বিদায় লইয়া দেশে গিয়াছিলাম। কনিষ্ঠ সহোদর রাজেন্দ্র নাথও বিদায় লইয়া আসিয়াছিলেন এবং তিনি উপবাসী থাকিয়া বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ, নান্দীমুখ ও উপনয়ন কার্য্য সমাধা করিলেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ,

দুলে, বাগ্দী, ডোম প্রভৃতি লইয়া বোধ হয় ছয় শত লোককে ভোজ দেওয়া হইল। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বলিতে লাগিল, "ভাই, পাঁপর ভাজা আর কপির তরকারী যোগী বাবুই প্রথম আমাদিগকে খাওয়াইলেন।" বৰ্দ্ধমানে প্রত্যাগমনের পর তথাকার অনেকগুলি বন্ধুবান্ধবদিগকেও কালিয়া, পোলাও, মিষ্টান্ন দ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করান হইয়াছিল। সে সময়ে দিগনগরে ও বৰ্দ্ধমানে দ্রব্যাদি অনেক সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইত। চারিদিক হইতে বন্ধুবান্ধবগণ নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া কেহ বা প্রমথ নাথের জন্য রুমাল, বোতাম, কার্পেটের জুতা, কেহ বা বস্ত্র এবং অনেকেই লৌকিকতা স্বরূপ নগদ টাকাও পাঠাইয়াছিলেন। নগদ টাকাগুলি সমস্তই ব্যয় করিয়াও অন্যূন তিনশত টাকা দেনা করিতে হইয়াছিল।

বৰ্দ্ধমান সমাজের তদানীন্তন অবস্থা সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা এইস্থানে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক বিবেচনায় অতি সংক্ষেপেই সেটুকু লিখিতেছি। দেখিলাম, হাকিমবর্গ এই সময় হইতেই সর্ব্বত্রই যেন নিজেদের একটা উচ্চ রকমের শ্রেণীভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন; সামাজিক বিষয়েও তাঁহারা আমলা, উকীলদের সঙ্গে মিশিতেন না। বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি কাজে উকীল বা আমলাবর্গের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া একবার পদার্পণ করিয়াই ভাবিতেন, নিমন্ত্রণ রক্ষা হইল, আপ্যায়িত করা হইল; অতঃপর চল, আর কেন এ সংসর্গে? আমি বাল্যকালে দেখিয়াছি, পিতৃব্য মহেন্দ্রনারায়ণ, সবজজ

ভূপতি বাবু, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কালী কিঙ্কর সেন, আশুতোষ গুপ্ত, চন্দ্রনারায়ণ সিংহ, প্রতাপ নারায়ণ সিংহ প্রভৃতি নামজাদা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ আমলাদের বাটীতে ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং উকীল, আমলাদের সঙ্গে একত্র বসিয়া আহারাদি করিতেন। এই বর্দ্ধমান সমাজের আর একটী দোষ দেখিলাম। সম্মুখে যাঁহাকে পরম বন্ধু বলিতেছি, তাঁহার কত সদ্‌গুণের পরিচয় দিতেছি, পরোক্ষে তাঁহারই অযথা নিন্দাবাদ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছি। পাঁচজনের সাক্ষাতে বলিতেছেন, "এরূপ ভদ্রলোক দেখা যায় না", পরোক্ষে বলিতেছেন লোকটা ভয়ানক পাজি (A veritable scoundrel) ইত্যাদি। সমাজের নেতাস্বরূপ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের এরূপ ব্যবহার এবং এই অদ্ভুত প্রকৃতি দেখিয়া অবাক হইয়া থাকিতে হইত। এ কি কৃত্রিমতার যুগ আসিয়া পড়িয়াছে ; যেদিকে দৃষ্টিপাত করি সেইদিকেই প্রত্যেক বিষয়েই কৃত্রিমতা এবং ভ্যাজাল। ঘৃতের সঙ্গে সাপের চর্ব্বি ও লার্ড ; ময়দার সঙ্গে সাদা মাটীর (white clay) গুঁড়া, চাউল ও ডাউলের সঙ্গে কাঁকড় ও মাটী, দুধের সঙ্গে খড়িমাটী ও জল, চিনির সঙ্গেও নাকি কি একটা মিশাইতেছে। পরিধেয় বস্ত্র ও জামার কাপড় প্রভৃতিও নাকি কার্পাসের সূতার সহিত পাট, রেশমের সহিত কি একটা গাছের ছালের সূতা, পশমের সহিত ঘোড়া, গাধা, কুক্কুর প্রভৃতির লোম মিশাইয়া সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে। সোণাও Chemical Gold রূপে পরিণত

হইয়াছে। সেইরূপ মানুষের প্রকৃতিও একেবারে artificial হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাউক এ বিষয় লইয়া আর পুঁথি বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। সকলেই এই সকল দেখিতেছেন, বুঝিতেছেন এবং সময়ের গতি বুঝিয়া স্রোতে ভাসিতেছেন। সমাজের এই শোচনীয় অবস্থা আমার একেবারেই ভাল লাগিত না। আমি সরলভাবে সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গেই মিশিতাম। সেই জন্যই হাকিম বাহাদুরদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেন, "He must be either a fool or a rogue". "অর্থাৎ লোকটা হয় মহা বোকা অথবা বদমায়েস।"

এই সময়ে হঠাৎ আমাকে তমলুকে বদলী করা হইল। যথারীতি বিদায়ীভোজের ধূম পড়িয়া গেল। অনেকগুলি বন্ধু-বান্ধব প্রকৃতই আমার বদলীতে আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছিলেন। যথাকালে বর্দ্ধমান পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে কলিকাতা পর্য্যন্ত রেল এবং তথা হইতে ষ্টীমার যোগে ১৮৯৩ সালে ২৮শে আগষ্ট তারিখে তমলুকে উপস্থিত হইয়া ৩০শে আগষ্ট তারিখে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মেদিনীপুরের পরিচিত বাবু দেবেন্দ্র নাথ মজুমদার সেই সময় তমলুকের কোর্ট সব ইন্‌স্‌পেক্টার পদে নিযুক্ত ছিলেন। পূর্ব্বেই তাঁহাকে পত্র লিখিয়া একটী বাসা ঠিক করা হইয়াছিল। প্রথমে তাঁহার বাসাতেই উঠিলাম। বেলা তখন আড়াইটা। কারণ কলিকাতা হইতে গেঁওখালি পর্য্যন্ত জোয়ারের বেগ এবং গেঁওখালি হইতে তমলুক পর্য্যন্ত ভাঁটা ঠেলিয়া Steam Navigation কোম্পানীর "উর্ব্বশী" নামক গাধাবোট সদৃশ ষ্টীমারখানির আরও পূর্ব্বে তমলুকে উপস্থিত হইবার শক্তি ছিল না। দেখিলাম রূপনারায়ণ নদের মধ্যস্থানে ষ্টীমার দাঁড়াইল। তমলুকের যাত্রীদের ষ্টীমার হইতে লইয়া যাইবার জন্য তিন চারিখানি নৌকা আসিয়া ষ্টীমারের গায়ে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। তল্পি, তাল্পা ও নানা রকমের মালপত্র, ছেলে পুলে লইয়া যাত্রীর দল নৌকায় নামিবার জন্য মহা হৈ চৈ আরম্ভ করিল। আমার সঙ্গে পত্নী, শ্বশ্রূমাতা ও নাবালক শিশু দুইটী, পাচক ব্রাহ্মণ, চাকর ও একটী ঝি এবং সেই সঙ্গে অনেকগুলি বাক্স, পেটরা, ও অন্যান্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ছিল। যাত্রীর দল নামিয়া যাইবার পর নামিবার পথও পরিষ্কার হইল এবং দৃষ্টিপথও পরিষ্কার হইল। দেখিলাম একখানি বেশ বড় রকমের নৌকার উপর একটী

চাপরাসধারী, পাগ্‌ড়ি বাঁধা, দাড়িগোপ বিশিষ্ট লোক আমাদের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, বন্ধুবর দেবেন্দ্র নাথ আমাদের লইয়া যাইবার জন্য এই নৌকাখানি পাঠাইয়াছেন। তখন সেই নৌকায় উঠিয়া তমলুক নগরে উপস্থিত হইলাম। দেবেন্দ্র নাথের পত্নী নিজের তত্ত্বাবধানে পাচক ব্রাহ্মণের দ্বারা নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া, সেদিনটা গল্প গুজবে কাটিল। জিনিষ পত্র নিজেদের নির্দ্দিষ্ট বাসায় পাঠান হইল। কিন্তু সেই দিন ও তৎপরদিনও ভায়া আমাদিগকে নিজের বাসাতেই রাখিলেন। ইতিমধ্যে শ্বশ্রূমাতা এবং পত্নী, চাকর ও ঝিকে সঙ্গে লইয়া নূতন বাসায় সমস্ত গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন। বাসাটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,তবে মাটির দেওয়াল এবং তার উপর খড়ের ছাউনী চাল ; একদিকে একটী আমবাগান, অপরদিকে একটী পুষ্করিণী, আর একদিকে একটী ভদ্রলোকের বাসা, সম্মুখটী খোলা। অনেকগুলি ঘর, পায়খানা, স্নানের ঘর, ভাঁড়ার ঘর প্রভৃতি সমস্তই ছিল। মাসিক ভাড়া মাত্র আট টাকা। বর্দ্ধমানে দ্বিতল পাকা বাড়ীতে ছিলাম ; মাসিক ভাড়া একুশ টাকা। সে সময় তমলুকে চাউল, ডাউল, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই বর্দ্ধমান অপেক্ষা অনেক সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইত। ঐতিহাসিক-গণ এই তমলুককেই প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগর বহুদিন হইতে নদীগর্ভে নিহিত হইয়াছে। তাহার আর কোন চিহ্নই পাওয়া

যায় না। তবে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শ্রীশ্রী৺ বর্গভীমা দেবীর মন্দির সেই প্রাচীন যুগেরই নিদর্শন স্বরূপ বর্ত্তমান আছে। যাহা হউক এ সকল ব্যাপার ঐতিহাসিকগণের গবেষণার বিষয়।

সে সময় খড়দহের প্রসিদ্ধ বিশ্বাস বংশ সম্ভূত কেদার নাথ বিশ্বাস মহাশয় তমলুকের সব ডিভিসনাল অফিসার ছিলেন। তিনজন মুন্সেফ, একজন সব রেজিষ্টার, পুলিশ থানা একজন ইন্‌স্‌পেক্টার, একজন সব-ইন্‌সপেক্টার, একজন আসিণ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন প্রভৃতি কর্ম্মচারীবর্গ এবং অনেকগুলি উকীল ও মোক্তার থাকায় সমাজটী বেশ বড় রকমেরই ছিল। একটী এণ্ট্রান্স স্কুল এবং বালিকা বিদ্যালয়ও ছিল। এণ্ট্রান্স স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন, পূর্ব্বোল্লিখিত বাবু বিপিন বিহারী গুপ্ত মহাশয়ের জ্ঞাতি ভ্রাতা রাজেন্দ্র নাথ গুপ্ত। ইতিহাস প্রসিদ্ধ বীর প্রবল পরাক্রান্ত কানু ভুঁইয়ার বংশধর সুরেন্দ্র নারায়ণ রায় ছিলেন তমলুকের রাজা। এই রাজ উপাধি স্থানীয় লোকেই তাঁহাকে দিয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহাকে "বাবু" বলিয়াই সম্বোধন করা হইত। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার সামান্য জমিদারীর আয় বার্ষিক আট দশ হাজার টাকার অধিক ছিল না। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম। তবে ভালুকা নিবাসী বাবু ক্ষেত্র নাথ সিংহ মুন্সেফ, ডাক্তার অভয় কুমার সেন আসিণ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন এবং বন্ধুবর দেবেন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয়-দিগের সঙ্গেই বিশেষ সদ্ভাব হইয়াছিল। কেদার বাবু ছিলেন অতি উদার প্রকৃতির, সদাশয় এবং আমোদপ্রিয় সামাজিক লোক।

প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই তাঁহার বাংলোয় আমাদের একটা মজলিস বসিত। সকল শ্রেণীর ভদ্রলোকই (অবশ্য বাছা বাছা) সেই মজলিসে উপস্থিত হইয়া গান বাজনা ও নানারূপ গল্প গুজব ও সদালোচনায় দুই তিন ঘণ্টা অতিবাহিত করিতেন। উকীল কিশোরী লাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন উচ্চদরের গায়ক। ইনি ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি ব্যতীত সাধারণ থিয়াটার, পাঁচালি প্রভৃতির গানও ওস্তাদী ধরণে গাহিতে পারিতেন। মোক্তার উমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের বিদূষক। ইনি অনেক রকম ভাঁড়ামি করিয়া এবং হাস্যরসোদ্দীপক গান গাহিয়া সকলকে আমোদিত করিতেন।

এই সময়ের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নিয়ম হইয়াছিল যে সব-ডেপুটীগণ ডিপার্টমেণ্ট্যাল (Departmental) পরীক্ষা দিতে পারিবেন না এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পদেও উঠিতে পারিবেন না। কিন্তু এ সময় বাঙ্গালার লেফট্ন্যাণ্ট গভর্ণর ছিলেন সার চার্ল্স এলফ্রেড ইলিয়ট (Sir Charles Alfred Elliot K. C. S. I.)। ইনি এই অন্যায় নিয়মটী উঠাইয়া দেওয়ায়, তখন আমাদের ডিপার্টমেণ্ট্যাল পরীক্ষা দেওয়ার সুবিধা হইল। বন্ধুবর ক্ষেত্র নাথ সিংহ মুন্সেফ, ডাক্তার অভয় কুমার সেন এবং দেবেন্দ্র নাথের পীড়াপীড়িতে আমি ঐ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া যথা-কালে পরীক্ষা দিয়াছিলাম। এটী Lower Standard পরীক্ষা। দুই তিন মাস পরে পরীক্ষার ফল বাহির হইল, দেখিলাম পাশ হইয়াছি। বড়ই আনন্দ হইল, বন্ধুত্রয়ও বিশেষ

আনন্দিত হইয়াছিলেন। ইহার পর Higher Standard পরীক্ষার জন্য নানা কারণে শীঘ্র প্রস্তুত হইতে পারি নাই। ভূপতি এই সময় উলুবেড়িয়ায় সবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন। সপরিবারে একদিন তমলুকে আসিয়া আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছিলেন। তমলুকে আসিবার পর হইতেই সৎসঙ্গ ও বায়ু পরিবর্ত্তনের গুণে শারীরিক স্বাস্থ্যের অনেকটা উন্নতি হইয়াছিল। বেতনের মধ্য হইতে মাসে মাসে কিছু বাঁচিতেও লাগিল। এই সময় কেদার বাবুকে বাঁকুড়ায় এবং তৎপদে নন্দলাল বাগ্‌চি নামক কলিকাতাবাসী একটী যুবক ডেপুটীকে তমলুকে পাঠান হইয়াছিল। কয়েক দিনেই বুঝিলাম নন্দলাল বাবু বেশ উপযুক্ত কর্ম্মচারী হইলেও জনপ্রিয় (popular) ছিলেন না। তিনি সেকেণ্ড অফিসার ও সব-ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটকেও যে সম্মানটুকু দেখান প্রয়োজন, তাহাও দেখাইতেন না। আবার আফিসের হেড ক্লার্ক সেরেস্তাদার মহাশয় আফিস সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতেছি যে কলিকাতা, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থান হইতে তাঁহার আত্মীয় স্বজন বা কোন বড়লোকের দল তাঁহার নিকট বেড়াইতে আসিলে, তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য ভালরূপ আহারাদির আয়োজন করিয়া আমাকেও নিমন্ত্রণ করিতেন এবং সেই সময়টার জন্য আমাকে নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। কিন্তু অফিসিয়াল ব্যাপারে তিলকে তাল করিয়া নিতান্ত উপদ্রব করিতেন। অবশেষে তাঁহার ব্যবহার এতই

অসহ্য হইয়া উঠিল যে তমলুকে থাকা অসম্ভব বিবেচনায় বন্ধুবর প্রাণকুমার দাস (কমিশনারের পার্শন্যাল আসিণ্ট্যাণ্ট) মহাশয়কে সমস্ত বিষয় জানাইলাম এবং তমলুক হইতে অন্য কোন স্থানে আমাকে বদ্‌লী করিয়া দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলাম। সেই সময় বীরভূম জেলার রামপুর হাট সবডিভিসনের সব-ডেপুটী কালেক্টর বিদায় লওয়ায় প্রাণকুমার বাবুর চেষ্টায় আমি রামপুর হাটে বদ্‌লী হইতে পারিয়াছিলাম। মা বর্গভীমার কৃপাতেই একটী স্বাস্থ্যকর স্থানে বদ্‌লী হইতে পারিয়াছিলাম এবং সেই সময় প্রার্থনাও করিয়াছিলাম, যদি কখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে উন্নতি লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও যেন তমলুকের সবডিভিসনাল অফিসার পদে আসিতে পারি। আমার প্রকৃত হিতৈষী বন্ধুবর্গ এবং বাবু রামসত্য মুখোপাধ্যায়, সব-রেজিষ্টার, ও দুই একজন মুন্সেফ এবং হেড মাষ্টার রাজেন্দ্র বাবু আমার এই কামনার কথা শুনিয়াছিলেন। রামসত্য বাবু প্রভৃতি কয়েকজন বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন যে এটা আমার দুরাশা মাত্র। সেই ধারণায় প্রকারান্তরে এক একটু ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেও ছাড়েন নাই। যাহা হউক এই সময়ের বহু বৎসর পরে আমার এই বাসনা মা ভীমা পূর্ণ করিয়াছিলেন। মোক্তার সম্প্রদায় আমাকে একটী বিদায়ী ভোজ দিয়াছিলেন। নন্দলাল বাবু, মুন্সেফগণ ও অন্যান্য কর্ম্মচারী ব্যতীত প্রধান প্রধান উকীল এবং স্থানীয় গণ্যমান্য অনেকেই নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে মোক্তার উমেশ চন্দ্র চট্টোপাধায় মহাশয়ের স্বরচিত একটী

গান কিশোরী লাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক গীত হইয়াছিল। মোক্তারগণ সেই সময় আমাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়াছিলেন। তারপর আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন ডাক্তার অভয় কুমার সেন মহাশয় তাঁহার বাসায় আমার বিদায় উপলক্ষে একটী ভোজ দিয়াছিলেন। এই পরিবারের সঙ্গে আমার বিশেষ সম্প্রীতি হইয়াছিল। অভয় বাবু স্বয়ং অতি উদার ও উচ্চ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও স্বামীর উপযুক্ত পত্নী ছিলেন। পুত্রকন্যাগুলিও অতি নম্র, শান্ত প্রকৃতি এবং স্নেহপরায়ণ ও বুদ্ধিমান ছিল। আমাকে তাহারা "কাকাবাবু" বলিয়া সম্বোধন করিত এবং আমার গান শুনিতে বড়ই ভালবাসিত। ডাক্তার বাবুর মধ্যম পুত্র সুরেন্দ্র কুমার দুই তিন বার বিলাত যাইয়া ডাক্তারীতে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্র কুমারের সঙ্গে পরে আরও দুইবার দেখা হইয়াছিল। বন্ধুবর দেবেন্দ্র নাথ, ক্ষেত্রনাথ এবং মোক্তার উমেশ চন্দ্র ভঞ্জ মহাশয়ও আপন আপন বাটীতে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, আরও দুই চারিটী ভদ্রলোকও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মোক্তার মিঃ তরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও একদিন সন্ধ্যায় সাহেবী ধরণের ভোজে আমাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। ইঁহার একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ব্যারিষ্টারী পাশ করিবার জন্য বিলাত গিয়াছিলেন; অকৃতকার্য্য হইয়া দেশে প্রত্যাগমনের পর মোক্তারী পাশ করিয়া তমলুকে প্র্যাক্টিস আরম্ভ করেন। অল্পদিনেই বেশ পশার প্রতিপত্তি হইয়াছিল। আমি যে সময় তমলুক হইতে রামপুর-

হাটে বদ্‌লী হই সে সময় তাঁহার মাসিক আয় ছিল প্রায় বারশত টাকা।

১৮৯৪ সালের ১লা জুলাই তারিখে সপরিবারে তমলুক পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে কলিকাতায় একদিন ভূপতির বাসায় অবস্থিতি করিবার পর রামপুরহাটে গিয়াছিলাম। ভূপতি সে সময় একটা বিশেষ কাজে সপরিবারে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিল। ভূপতি ও তৎপত্নী আমাদিগের যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিল। মিঃ এন্‌স্‌লি (Mr. Ainsly) তখন রামপুরহাটের সবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন। চাল, চলন, ধরণ, ধারণ প্রায় সিভিলিয়ানদের ন্যায় ছিল। কেবল ইঁহার বলিয়া নয়, ইতিপূর্ব্বে এবং পরবর্ত্তী সময়েও দেখিয়াছি সব-ডিভিসনের ভার প্রাপ্ত সাদা চামড়ার ডেপুটীই হউন আর মেটে ফিরিঙ্গীই হউন, চাল, চলনগুলি একেবারে খুব উঁচুদরের করিয়া ফেলিতেন। আরও দেখিয়াছি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এই সকল মহাপুরুষদিগকে দেশী ডেপুটী অপেক্ষা অনেক অধিক খাতির করিতেন। অন্যান্য সবডিভিসনের ন্যায় এখানেও মুন্সেফ ছিলেন দুইজন, সবরেজিষ্টার, পুলিশ ইন্‌সপেক্টার, সব-ইন্‌সপেক্টার প্রভৃতি সকল কর্ম্মচারীই ছিলেন। উকীল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতির ত কথাই নাই। ডাক্তার চন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের বিশেষরূপ সম্প্রীতি হইয়াছিল। সর্ব্বদা মফঃস্বল যাইতে হইত বলিয়া ষ্টেশন মাষ্টার মিঃ ডি, কষ্টা (Mr. D. Costa) সাহেবের সঙ্গেও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। নবদ্বীপ-

বাসী বাবু রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন স্কুলের হেডপণ্ডিত। ইনি অতি সুগায়ক ছিলেন ; অনেক সময় নানারূপ গান গাহিয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। এখানে ব্রাহ্ম ও হিন্দুদিগের দুইটী পৃথক দল ছিল। আমার কোন বিশেষ দলের সঙ্গে সহানুভূতি ছিল না, উভয় দলেই মিশিতাম। রামপুরহাটে অবস্থিতি সময়ে নলহাটীতে ৺কালীমাতা এবং চণ্ডীপুর গ্রামে তারাপীড়ে ৺তারামায়ের মন্দির আদি দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। মিঃ এন্স্‌লী দুই মাসের বিদায় লওয়ায় মিঃ ক্রেভেন ঐ সময়ের জন্য রামপুরহাটের সবডিভিসনাল অফিসার হইয়া আসিয়াছিলেন। ইনি তরুণবয়স্ক হইলেও বেশ শান্ত প্রকৃতি ও অমায়িক লোক ছিলেন। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসায় জানিলাম তিনি রাজসাহী বিভাগের কমিশনারের ভূতপূর্ব্ব পার্শনাল আসিষ্ট্যাণ্ট মিঃ ক্রেভেনের পুত্র। আরও শুনিলাম তাঁহার পিতা সাঁওতাল পরগণার সেটেলমেণ্ট কাজ সমাধা করিয়া শীঘ্রই সিংহভূম জেলার "কোলহান" নামক গভর্ণমেণ্ট ষ্টেটের সেটেলমেণ্ট অফিসার নিযুক্ত হইয়া যাইতেছেন এবং দুমকা হইতে আসিবার সময় রামপুরহাট হইয়াই যাইবেন। আমি তাঁহার পরিচিত এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "তাহা হইলে অবশ্যই আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।" কয়েকদিন পরে দুমকা হইতে তিনি রামপুরহাটে উপস্থিত হইলে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার দুইজন আসিষ্ট্যাণ্টের প্রয়োজন ; তাহার মধ্যে একজন দুম্‌কা হইতে লইয়া যাইতেছেন। আমি সার্ভে

সেটেলমেণ্টের কাজে কতকটা অভিজ্ঞ এবং দেবনাগরি অক্ষর পড়িতে পারি জানিয়া আমাকেই দ্বিতীয় আসিষ্ট্যাণ্টের পদে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করেন। আমিও সম্মত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। গভর্ণমেণ্টের আদেশ পাইবা মাত্রই চাইবাসা যাত্রা করিবার উপদেশ দিলেন। রামপুরহাটে অবস্থিতি সময়ে Higher Standard Departmental পরীক্ষা দিবার জন্য বর্দ্ধমানে যাইয়া কয়েকদিন বন্ধুবর সত্যতারণ মুখোপাধ্যায় ডেপুটী কালেক্টর মহাশয়ের বাসায় অতি যত্ন ও সমাদরের সঙ্গে অতি-বাহিত করিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই। যথাকালে গভর্ণমেণ্ট হইতে তারযোগে সংবাদ পাইলাম যে আমাকে আসিষ্ট্যাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং কালবিলম্ব না করিয়া চাইবাসায় যাইবার আদেশ পাইলাম। পরিবারদিগকে বাটীতে রাখিয়া রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (পাচক) এবং রজনীকান্ত পালকে সঙ্গে লইয়া ১৮৯৫ সালের ১৯শে জানুয়ারী চাইবাসায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে বাবু ভগবতী চরণ চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় দুই তিন দিন থাকিয়া তাহার পর একটী পৃথক বাসা ভাড়া করিয়াছিলাম। ভূপতি ও শ্রীপতি ইতিপূর্ব্বে চাইবাসায় অবস্থিতি সময়ে ভগবতী বাবুর সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব ছিল। সেই সূত্রেই ভগবতী বাবু অতি যত্নের সহিত আমাকে কয়েকদিন তাঁহার বাসায় রাখিয়াছিলেন।

চাইবাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একজন কানুনগো, দুইজন সেটেলমেণ্ট ইন্‌সপেক্টার এবং কয়েকটী চাপরাসী আমার

পূর্ব্বেই সেখানে তাম্বু, চেয়ার, টেবিল এবং সার্ভে সংক্রান্ত সমস্ত সরঞ্জাম লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। দুই তিন দিনের মধ্যেই মিঃ ক্রেভেনের একখানি পত্র পাইলাম। জানিলাম, তাঁহার নিজের আসিতে প্রায় এক মাস বিলম্ব হইবে এবং দ্বিতীয় আসিষ্ট্যাণ্ট আরও বিলম্বে আসিবেন। গভর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন, লেখা-পড়া জানা লোকদিগকে আমীনের কার্য্য শিখাইয়া, তাহাদের দ্বারা জরীপের কাজ সমাধা করিতে হইবে। ষ্টেটের মধ্যে এই মর্ম্মে নোটীশ জারি করা হইল। দলে দলে কোল এবং তদ্দেশ-বাসী তামারিয়া, তাঁতি প্রভৃতি সামান্য হিন্দি লেখাপড়া জানা লোক আসিতে লাগিল। কানুনগো (বাবু বৈদ্যনাথ রায়) এবং ইনস্‌পেক্টার দুইজনকে লইয়া তাহাদিগকে জরীপ ও খানাপুরির কাজ শিক্ষা দিতে লাগিলাম। দুই চারি দিনের মধ্যে বুঝিলাম, তাহাদের মধ্যে দুই চারিজন কাজ শিখিতে পারিবে। অপর-গুলির মাথায় ব্যাপারটা প্রবেশ করান দুষ্কর হইয়া উঠিল। মিঃ ক্রেভেনকে এই বিষয় পত্র লিখিয়া জানান হইল। বাঙ্গালা দেশ হইতে কতকগুলি অভিজ্ঞ আমীন না আসিলে কাজ চলিবে না, তাহাও লিখিলাম। কারণ ষ্টেটের পরিমাণ ১৯০০ বর্গ মাইল। অন্ততঃ ১৫০ জন আমীন নিযুক্ত করিতে হইবে। ডেপুটী কমিশনার মিঃ বেডফোর্ড মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকেও এই বিষয় জানাইলাম। তিনি একটু হাসিয়া কহিলেন, "Perhaps you have got some needy relatives to provide for." অর্থাৎ "বোধ হয় আপনার দরিদ্র কুটুম্ব

সাক্ষাৎও আপনার লোকদিগের চাকুরী করিয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছে।” কথাটা শুনিয়া একটু দুঃখিত হইলাম, একটু রাগও হইল। উত্তরে কহিলাম :—“No, Sir, my relatives have no ambition for being appointed Amins ; some of them are Deputy Magistrates and Moonsiffs and others holding offices of trust and responsibility under Government.” অর্থাৎ “আমীনের কাজ করিবার উচ্চাভিলাষ আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কাহারও নাই। তাঁহারা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ এবং গভর্ণমেণ্টের অধীনে দায়িত্বপূর্ণ অন্যান্য কাজে নিযুক্ত আছেন।” সাহেব বাহাদুর বেশ ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক। আমার এই প্রত্যুত্তর শুনিয়া বুঝিলেন, যে তাঁহার সেই অযথা মন্তব্য প্রকাশ করা ভাল হয় নাই। আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কহিলেন :—“Babu, I meant no offence. I will consider your proposal for importing foreign Amins in consultation with Mr. Craven.” “আপনার মনে কষ্ট দেওয়া আমার অভিপ্রায় ছিল না। ক্রেভেন সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আপনার প্রস্তাব সম্বন্ধে আমি বিবেচনা করিব।” সাঁওতাল পরগণার সুশিক্ষিত আমীনদলকে লইয়া আসিবেন প্রথম হইতেই মিঃ ক্রেভেনের এই অভিপ্রায় ছিল। কেবল গভর্ণমেণ্টের আদেশানুসারেই স্থানীয় কোল, সাঁওতালদিগকে আমীনের কাজ শিখাইয়া তাদের দ্বারাই কাজ সমাধার চেষ্টা

করিয়াছিলেন। এখন আমার রিপোর্ট এবং ডেপুটী কমিশনার বাহাদুরের চিঠি পত্র পাইয়া সমস্ত অবস্থা গভর্ণমেণ্টের গোচর করায় অবশেষে সেই সুশিক্ষিত আমীনের দলকেই আনা হইল। সেই সঙ্গে আরও চারিজন ইন্‌সপেক্টার এবং আর একজন কানুনগোও আসিলেন। বাবু শ্যামাচরণ সেন নামক একটী তরুণ বয়স্ক গ্রাজুয়েট অস্থায়ীরূপে দ্বিতীয় আসিষ্ট্যাণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। মিঃ ক্রেভেনও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ সকল আমীন, ইন্‌সপেক্টার, কানুনগো প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া পাঁচমাস কাল মফঃস্বলের নানাস্থানে পাহাড়, পর্ব্বত এবং বাঘ, ভালুক প্রভৃতি নানবিধ হিংস্র পশুসঙ্কুল জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিয়া চাইবাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

মধ্যে মধ্যে অন্যান্য প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকিলেও আমার চাকরীর কথাই যেন এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার প্রধান বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা জোড়াসাঁকো নামক পল্লীতে মাসিক চারি টাকা বেতন, হোটেলে ভোজন এবং জলযোগের ব্যবস্থায় গোপ-নন্দনের গৃহ-শিক্ষকতা হইতে কিরূপে ক্রমে ক্রমে গভর্ণমেণ্টের চাকরীতে প্রবেশ করিয়া কি উপায়ে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া-ছিলাম এবং এই চাকরী উপলক্ষে, অর্থাৎ উদরান্নের জন্য, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর প্রদেশের নানাস্থানে যাইয়া কোথায় চাকরীতে সুখ্যাতি পাইয়াছি, কোথায় অপদস্থ হইয়াছি, কোথায় সমাজের অবস্থা দেখিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি, কোথায় বা বর্ত্তমান সমাজের বিশেষতঃ সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের

একটা অদ্ভুত রকমের আচার ব্যবহার দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছি ;—এই সকল বিষয়ই একটু বাহুল্যভাবেই লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। নিজের বাহাদুরি বা চলিত কথায় বড়াই করার অভিপ্রায়ে এসকল লিখি নাই। একজন পূর্ব্বপুরুষ নানা অবস্থায় পড়িয়া নানারূপ ঝড় ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়া কিভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন বংশধরদিগের অবগতির জন্যই নানা বিষয়ের প্রসঙ্গে নানা কথার অবতারণা করা হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় বন্ধু গণিত বিদ্যা-বিশারদ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক রায় বাহাদুর বিপিন বিহারী গুপ্ত মহাশয় কবিবর নবীন চন্দ্র সেনের "আমার জীবন" নামক আত্ম-জীবনীর সমালোচনায় একস্থানে বলিয়াছিলেন,—"ডেপুটীরূপ বিন্দুর উপর নবীনচন্দ্র একটী পিরামিড গড়িয়াছেন।" আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাটুকুকে পাছে কেহ "বিন্দুর উপর পিরামিড" নির্ম্মাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি বিবেচনা করেন, সেই আশঙ্কাতেই এই কৈফিয়ৎটুকু দিতে হইল। চাকরীর মধ্যাহ্ন সময়ে সিংহভূম জেলায় আসিয়াছিলাম। তখনও চাকরীর অনেক বাকী ; চাকরী সংক্রান্ত অনেক কথাই এখনও লিখিতে হইবে বলিয়া এখন হইতে উল্লিখিত কৈফিয়ৎটুকু দিয়া রাখিলাম। ধর্ম্ম জানেন, "বিন্দুর উপর পিরামিড" উঠাইবার অভিপ্রায় একেবারেই নাই।

কন্যা নীলনলিনী বিবাহযোগ্যা হইয়াছে। পত্নী দিগনগরে থাকিয়া আত্মীয়স্বজনের দ্বারা পাত্র অনুসন্ধান করাইতেছেন, মনোমত পাত্র পাওয়া যাইতেছে না। বিদায় লইয়া নিজে দেশে

যাইয়া পাত্র অনুসন্ধানের জন্য বার বার পত্র লিখিতেছেন। অবশেষে দুই মাসের বিদায় লইয়া শান্তিপুর কাশ্যপপাড়া নিবাসী স্বর্গীয় তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র সুরেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ দেওয়া হইল। সুরেন্দ্র কুমার প্রথম শ্রেণীতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া আই, এ পড়িতেছিলেন। তাঁহাকে বরাভরণ, উপযুক্তরূপ দান সামগ্রী, কন্যাভরণ এবং নগদ পাঁচশত টাকা বাদে আমার ব্যয়ে বি,এ পর্য্যন্ত পাশ করাইতে হইবে, এই সর্ত্তে বিবাহ দেওয়া হইল। জামাতা কলিকাতায় থাকিয়া বি,এ পড়িতে লাগিলেন। আমিও পরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া চাই-বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। এই বিবাহে অন্যূন দুই হাজার দুই শত টাকা বিবাহ সময়েই ব্যয় হইয়াছিল। চাইবাসায় ফিরিয়া প্রায় দুই মাস আফিসের কাজেই নিযুক্ত ছিলাম। আমার অনুপস্থিতি সময়ে দ্বিতীয় আসিষ্ট্যাণ্ট বাবু বলরাম দাসগুপ্ত চাই-বাসায় আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কন্যার বিবাহের পর যখন দুইমাস সহরে ছিলাম সেই সময় গণ্যমান্য ভদ্রলোক-দিগের সহিত আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। নিম্নলিখিত ব্যক্তি-গণের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উকীল রাখাল চন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়, মোহিনী মোহন ঘোষ, শশীভূষণ সরকার, হরিনাথ রায়, ভগবতী বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, মাখন লাল শীল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বিপিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবী নেজাম উদ্দীন আহম্মদ, মিঃ হেমেন্দ্র লাল খাস্তগীর, শরৎ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টর, গিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিষ্ট্রিক্ট

ইঞ্জিনিয়ার জ্ঞানেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেডমাষ্টার কেদার নাথ সেন, মোক্ষদা চরণ সরকার পোষ্ট মাষ্টার, গোপাল চন্দ্র ঘোষ ও গোবিন্দ বাবু ডাক্তার। বাবু ভুবনেশ্বর গুপ্ত, ডেপুটী ইন্‌স্‌পেক্টার অব স্কুল, এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে চাইবাসায় বদলী হইয়া আসিয়াছিলেন। আমি রামপুর বোয়ালিয়ায় যখন কানুনগো পদে ছিলাম, সেই সময় ইনি সেখানে ডেপুটী ইন্‌সপেক্টার আফিসের কেরাণী ছিলেন। এই সময় সহরবাসী ভদ্রলোক এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গকে একদিন ভোজ দেওয়া হইয়াছিল। লোকের সঙ্গে ভালরূপ পরিচিত হইবার এইটীই সেকালে ছিল সহজ উপায়।

অনেকগুলি লোক লইয়া সহর হইতে অনেক দূরে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, এবং অনেক অস্বাস্থ্যকর স্থানে সর্ব্বদা থাকিতে হইত। দুই চারিজন প্রায়ই পীড়ায় শয্যাগত হইত। সেই জন্য এলো-প্যাথি ঔষধের একটী বাক্স, একটী হোমিওপ্যাথি বাক্স, কতকগুলি পেটেণ্ট ঔষধ, ক্যাষ্টর অয়েল এবং গৃহ চিকিৎসার দুই চারিখানি পুস্তক ও সাগু, এরারুট, বার্লি, মিছরি প্রভৃতি সর্ব্বদাই সঙ্গে রাখিতাম। রামকিষন সিং নামক সেটেলমেণ্টের ইন্‌সপেক্টার এবং রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিখাইয়া পড়াইয়া কম্পাউণ্ডার করিয়া লইয়াছিলাম। সহরে আসিয়াও নিজের অধীনস্থ কর্ম্মচারী ব্যতীত পাড়ার গরীব দুঃখী লোকদিগকে ঔষধ বিতরণ আরম্ভ করিলাম। ক্রমে ভদ্র সমাজেও এই বিষয় প্রচারিত হওয়ায়, সেখানে চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ

হেমেন্দ্রলালের মাতাঠাকুরাণীর অর্শের পীড়া, রেভারেণ্ট লুথার সিংহের কন্যার মূর্চ্ছা (fit) পীড়া, বন্ধুবর হরিনাথ রায় উকীলের একটী কন্যার লিভারের দোষযুক্ত বহুদিনের জ্বর এবং গুরুনাথ বাবুর একটী চাকরের কলেরা রোগ ভগবানের কৃপায় আরোগ্য হওয়ায়, সহরে আমার নামটা খুব জাহির হইয়া গেল। চিকিৎসাতে রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপে সকল রকমেই আমার পসার প্রতিপত্তি বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে Higher Standard Departmental পরীক্ষা দিবার জন্য রামপুরহাট হইতে বর্দ্ধমানে গিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। চাইবাসা হইতেও একবার ঐ পরীক্ষা দিবার জন্য পুরুলিয়ায় গিয়াছিলাম। এবারও ফৌজদারী সংক্রান্ত আইনের (Criminal Laws) পরীক্ষায় বার নম্বরের জন্য ফেল হইয়াছিলাম। সেটেলমেণ্ট অফিসার মিঃ ক্রেভেনকে এই বিষয় জানাইলাম এবং তিনি একটু কৃপা করিলেই পাশ হইবার সম্ভাবনা আছে বলায় মহামতি ক্রেভেন তৎক্ষণাৎ ডেপুটী কমিশনার মিঃ বম্পাসের যোগে গভর্ণমেণ্টে লিখিলেন যে সেটেলমেণ্টের কাজে দিবারাত্রি লিপ্ত থাকায় পরীক্ষার জন্য ভালরূপ প্রস্তুত হইতে পারে নাই; ইহাকে পাশ করিয়া দেওয়া হউক। গভর্ণমেণ্ট ইঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া আমাকে পাশ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার কয়েক মাস পরে আমি পত্নী ও কন্যাকে সঙ্গে লইয়া যখন জগন্নাথপুর

নামক স্থানে তাম্বুতে বাস করিতেছিলাম, সেই সময় সংবাদ পাইলাম যে গভর্ণমেণ্ট অতঃপর আমাকে এবং এই সঙ্গে আরও নয়জন সবডেপুটীকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। মিঃ ক্রেভেন সেই সময় আমার কার্য্য পরিদর্শনের জন্য জগন্নাথ-পুরে আসিয়াছিলেন। আমার পদোন্নতির সংবাদে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এক সপ্তাহ মধ্যে বিদেশস্থ বন্ধুবর্গের নিকট হইতেও অন্যূন ত্রিশখানি পত্র পাইয়াছিলাম। সকলেই আমার এই উন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পদে উন্নতি লাভ করায় আমার সেটেলমেণ্ট এলাউয়েন্স মাসিক পঞ্চাশ টাকা স্থলে একশত টাকা এবং দৈনিক ভাতা তিন টাকার স্থলে সাড়ে চার টাকা হইল। জীবনাভিনয়ের প্রায় শেষভাগে ডেপুটী পদে উন্নতি লাভ করায় বিশেষ কিছু লাভ না হইলেও প্রাণ খুলিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। অতঃপর ডেপুটী মহোদয়গণ যে আমাকে একটা নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী বিবেচনা করিবেন না ; এখন আর "কি মহাশয়," "হাঁ মহাশয়" সম্বন্ধ রাখিতে পারিবেন না, এটা ভাবিয়াও একটু আনন্দ হইল। অবশ্য ডেপুটী শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই সদাশয় ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন ; তাঁহারা ডেপুটী, সব-ডেপুটীর মধ্যে প্রভেদ আছে বলিয়া সব-ডেপুটীদিগকে দূরে রাখিতেন না। কয়েক মাস পরে সেটেলমেণ্টের কাজ শেষ হওয়ায় আমাকে আপাততঃ চাইবাসাতেই রাখা হইয়াছিল।

এই সময় মেঘনা নদীর বক্ষস্থিত একটা প্রকাণ্ড চরভূমি

লইয়া গভর্ণমেণ্ট এবং একটী জমিদারের মধ্যে নোয়াখালির জজ আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমা চলিতেছিল। নোয়াখালি অবস্থিতিকালে আমি এই চর সম্বন্ধে নানারূপ তদন্ত করিয়া একখানি নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিলাম। সেইজন্য আমাকে গভর্ণমেণ্ট পক্ষে সাক্ষী মানা হইয়াছিল। আমি নোয়াখালি উপস্থিত হইয়া দেখিলাম মোকদ্দমাটী আপোষে মীমাংসা হইবার কথাবার্ত্তা হইতেছে। সেই সময় সূর্য্য কুমার অগস্তী নোয়াখালির ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর ছিলেন। ইঁহার সহিত দেখা করিতে যাইলে খুব যত্ন ও সমাদর করিলেন। আমি ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু বিনোদ বিহারী পাল মহাশয়ের বাসায় উঠিয়াছিলাম। অগস্তী সাহেব একবেলা আমাদিগকে সাহেবী খানায় আপ্যায়িত করিয়া আমার আগমন উপলক্ষে নূতন পাকা থিয়াটার ঘরে একটী ক্ষুদ্র নাটক অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন। কহিলেন, "আপনাদের সেই কাঁচা রঙ্গমঞ্চের স্থলে আমরা কেমন পাকা ঘর প্রস্তুত করিয়াছি দেখুন।" প্রকৃতপক্ষে অগস্তী সাহেব নোয়াখালি সহরের এবং জেলার মধ্যে বহু অর্থ ব্যয়ে অনেকগুলি সাধারণের হিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। একদিন মাত্র নোয়াখালিতে থাকিয়া চাইবাসায় ফিরিয়া আসিলাম। পথে একদিন কলিকাতায় অবস্থিতিকালে শ্রীরামপুরে মিঃ ক্রেভেনের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম। ইনি সিংহভূম জেলার সেটেলমেণ্টের কাজ শেষ করিবার পর শ্রীরামপুরের সব ডিভিসনাল অফিসার হইয়া আসিয়াছিলেন। এই শ্রীরামপুরেই সদাশয় ক্রেভেনের মৃত্যু হয়।

সেটেলমেণ্টের সমস্ত কর্ম্মচারীকে বিদায় দিয়া আমাকে রাখা হইল খসড়া, খতিয়ান, জমাবন্দী, ভিলেজ নোট, নক্সা প্রভৃতি মৌজাওয়ারী গুছাইয়া নম্বর দিয়া মহাফেজাখানায় প্রেরণের জন্য। এই কার্য্যের সাহায্যের জন্য আমার অধীনে একজন ইন্‌সপেক্টার, পেস্কার এবং চারিজন আমীন মোহরারকেও রাখা হইল। এই সময় আমাকে ফৌজদারী মোকদ্দমা এবং বাকী খাজনার (Rent Suits) মোকদ্দমার বিচারও করিতে হইত। প্রায় ছয়মাস কাল এই কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া, সমস্ত সমাধা হইলে দুই মাসের বিদায় লইয়া দেশে আসিবার আয়োজন করিতেছি, এমন সময় মিঃ অগস্তী এবং ডিরেক্টর অব ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ (Director of Land Records) মহাশয়দিগের নিকট হইতে টেলিগ্রাম এবং রেভিনিউ বোর্ড হইতে চিঠি পাইলাম যে আমাকে নোয়াখালি জেলার সেটেলমেণ্ট অফিসার হইয়া শীঘ্রই সেখানে যাইতে হইবে। প্রস্তুত হইয়া থাকিবার আদেশও ছিল। মিঃ বম্প্যাসকে টেলিগ্রাম ও চিঠি পত্র দেখাইয়া জানাইলাম যে, যখন বিদায় মঞ্জুর হইয়াছে, তখন প্রথমে দেশেই যাইব এবং সেখান হইতে নোয়াখালি যাত্রা করিব। দূরদর্শী বম্পাস কহিলেন, গভর্ণমেণ্ট হইতে পাকা আদেশ না পাইলে আপনার নোয়াখালি যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমি তাঁহার সেই পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া সমস্ত দ্রব্যাদি ময়ূর, কুক্কুর প্রভৃতি জীবজন্তু, সিংহভূম জেলার নদীগর্ভ হইতে সংগৃহীত নানা-আকারের, নানাবর্ণের প্রস্তরখণ্ড পূর্ণ কতকগুলি বাক্স, এবং প্রচুর পরিমাণ অনাবশ্যক দ্রব্যাদিসহ দিগনগর যাত্রা করিলাম।

সেটেলমেণ্ট অফিসার হইয়া নোয়াখালি যাইতে হইবে এটা স্থির নিশ্চয় বিবেচনায় সেখানে যাইয়া ব্যবহারোপযোগী অনেক আসবাব রেল ও ষ্টীমারযোগে ফেণী ষ্টেশনে পাঠান হইল। সেই সময়ের কিছুপূর্ব্বে চাঁদপুর হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত রেল খুলিয়াছিল। নোয়াখালির ফেণী মহকুমায় একটী ষ্টেশন হইয়াছিল। নোয়াখালি আমার প্রিয় কয়েকটী স্থানের অন্যতম। পরিচিত বন্ধুবান্ধব অনেকেই সে সময় সেখানে ছিলেন। জেলার কালেক্টর আপনার লোক বলিলেও হয়। আবার আর্থিক অবস্থাও ভাল হইবে, এই সকল বিবেচনা করিয়া কয়টা দিন মহা স্ফুর্ত্তিতে কাটিল। দিগনগরে উপস্থিত হইয়া গভর্ণমেণ্টের আদেশ জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম। কয়েকদিন পরে চীফ্ সেক্রেটারীর নিকট হইতে উত্তর আসিল, "Your services are not required at Noakhali." অর্থাৎ "আপনার নোয়াখালি যাইবার প্রয়োজন নাই।" আমিও একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলাম। বিদায় শেষে চাইবাসায় ফিরিয়া যাইবার আদেশ হইল। কন্যার বিবাহের ঋণ তখন পর্য্যন্ত পরিশোধ হয় নাই। ভ্রাতুষ্পুত্রী হিরণ্ময়ীর বিবাহ উপলক্ষেও দেনা করিয়া দুইশত টাকা পাঠাইয়াছিলাম। তার উপর অনর্থক কতকগুলি টাকা ব্যয় হইয়া যাওয়ায় বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। কোন উপায় নাই। সকলকে দিগনগর রাখিয়া কেবল পুত্র প্রমথনাথ এবং পাচক ব্রাহ্মণ, চাকর এবং রাজকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় চাইবাসায় উপস্থিত হইলাম। মিঃ বম্পাস দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, তাঁহার পরামর্শ মত

কাজ করিলে অনর্থক কতকগুলি অর্থ ব্যয় হইত না। যাহা হউক আবার ক্রমে ক্রমে পূর্ণ উৎসাহে চাকরী করিতে লাগিলাম।

এই সময়ে আমাদের সাংসারিক ও পারিবারিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা উল্লেখ করা এখানে প্রয়োজন। বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন অবস্থায় প্রতিপালিত, এবং বিভিন্ন রূপ আচার, ব্যবহার, শিক্ষা ও সংস্কার লইয়া আমাদের ভ্রাতৃবর্গের সহধর্ম্মিণীগুলি, ক্রমে ক্রমে আমাদের সংসারে আসিয়াছিলেন, মাতাঠাকুরাণী স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, পিতৃব্য পত্নী পৃথকান্নবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন ; আমাদের সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। তিন ভ্রাতার মধ্যে আমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ; কনিষ্ঠদের অন্যায়াচরণ দেখিলে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া, সমস্ত ঝড়, তুফান মাথায় লইয়া সংসারে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে আমারই কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ আমার সহিষ্ণুতা বা স্থির বুদ্ধি কখনই ছিল না। সুতরাং যতদিন পৈতৃক স্থান পরিত্যাগ করিয়া, দূরদেশে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া, সকলের সঙ্গে প্রকারান্তরে সমস্ত সংশ্রব পরিত্যাগ না হইয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্তই এই অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। দেশত্যাগী হইয়াও যে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিয়াছিলাম তাহাও বলিতে পারি না। চক্রধরপুরে সামান্যরূপ তৃণ, কাষ্ঠ, খোলা খাপরার দ্বারা নির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র মেটে বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিবার কয়েক বৎসর পরেও দেবেন্দ্র পত্নী এবং তাদের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান কালীপদের সঙ্গে

পৈতৃক সামান্য তৈজস পত্রের বিভাগ লইয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত চিঠি পত্র লেখালেখি হইয়াছিল। আমাদের ত ক্ষুদ্র সংসার, ধনাঢ্য জমিদার পরিবারেও অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা তুচ্ছ সম্পত্তির বিভাগ লইয়া এইরূপ করিয়া থাকেন, তাহাও দেখিয়াছি।

এইবার বিদায় শেষে চাইবাসায় আসিয়া দেখিলাম বাবু সুরেশ চন্দ্র সেন এবং শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার ডেপুটী কালেক্টরদ্বয় চাইবাসায় বদ্‌লী হইয়া আসিয়াছেন। এই শ্রীশ বাবু "বিশ্বনাথ or Robin Hood of Bengal," "ফুলজানি" প্রভৃতি অনেকগুলি সুন্দর ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। হেডমাষ্টার কেদার বাবুর স্থলে নলিনীকান্ত সান্যাল, এবং ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার জ্ঞানেন্দ্র বাবুর বদলীতে বাবু যতীন্দ্র নাথ পালিত আসিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সিভিল মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার রমণ কৃষ্ণ দে, কানুনগো বাবু রজনী কান্ত সেন প্রভৃতি ভদ্রলোকদিগের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। বাবু সুরেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে বর্দ্ধমানেও আমার বেশ সৌহার্দ্দ্য হইয়াছিল।

চাইবাসায় প্রত্যাগমনের কয়েক সপ্তাহ পরেই গেজেটে দেখিলাম আমাকে মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি মহকুমায় বদলী করা হইয়াছে। কাঁথি স্বাস্থ্যকর স্থান এবং সদাশয় জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেখানে তখন পর্য্যন্ত সব ডিভিসনাল অফিসার ভাবিয়া আনন্দিত হইলাম। কিন্তু শুনিলাম কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে

তিনি কাঁথি হইতে স্থানান্তরে গিয়াছেন এবং তাঁহার স্থলে তমলুকের নন্দলাল বাগচি মহাশয় কাঁথিতে আসিয়াছেন। তাঁহার সেকেণ্ড অফিসার হইয়া যাইতে একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, বদ্‌লী রহিতের চেষ্টাও করা হইল। কিন্তু কোন ফল হইল না। সমস্ত দ্রব্যাদি কয়েকখানি গরুর গাড়ীতে করিয়া রাজকৃষ্ণ এবং একটী চাকরকে সঙ্গে দিয়া মেদিনীপুর হইয়া কাঁথি পাঠাইয়া দেওয়া হইল। আমি প্রথমে দিগনগরে আসিলাম, তুই তিনদিন পরে কেবল প্রমথ নাথ এবং ব্রাহ্মণ ও একটী চাকর সঙ্গে লইয়া কাঁথি যাত্রা করিলাম। কলিকাতা পর্য্যন্ত রেল, কলিকাতা হইতে গেঁওখালী পর্য্যন্ত বড় ষ্টীমার, গেঁওখালী হইতে মুশাখাঁ নামক গ্রাম পর্য্যন্ত ক্যানেলগামী ছোট ষ্টীমার এবং তথা হইতে নৌকাযোগে কাঁথি উপস্থিত হইয়া ১৮৯৭ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখে কাঁথি মহকুমার সেকেণ্ড অফিসারের কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পিতৃব্য মহেন্দ্র নারায়ণ কিছুদিনের জন্য কাঁথিতে মুন্সেফি করিয়াছিলেন। সেই সময় গুপ্তিপাড়া নিবাসী উপেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার উকীল মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার সৌহার্দ্দ্য হইয়াছিল। আমি সেই সূত্রেই উপেন্দ্র বাবুর বাটীতেই প্রথমে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। উপেন্দ্র বাবু অতি পরোপকারী, সদাশয় ও নির্ম্মল চরিত্রের লোক ছিলেন। আতিথেয়তার জন্য তাঁহার নাম সে অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি অতীব যত্ন সহকারে আমাকে ও প্রমথকে আপন বাটীতে রাখিলেন। বাবু সুরেশ চন্দ্র সরকার, সব ডেপুটী কালেক্টর, তখন কাঁথিতে ছিলেন। ইঁহার সহিত পূর্ব্বে সামান্য পরিচয় ছিল। আমার একটী বাসা ঠিক করিবার জন্য চাইবাসা হইতে ইঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি দুই তিনটী বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গনের মধ্যস্থিত, আফিসের নিকটবর্ত্তী, একটী সুন্দর গভর্ণমেণ্টের বাংলোই আমি মনোনীত করিলাম। মাসিক ভাড়া মাত্র কুড়ি টাকা দিতে হইত। আমার পুর্ব্ববর্ত্তী দুই তিনজন সেকেণ্ড অফিসার এই বাংলোয় ছিলেন; সেই জন্য ইহার নাম হইয়াছিল Second Officer's Quaters। আমি প্রমথকে লইয়া যেদিন কাঁথিতে উপস্থিত হই, সৌভাগ্যক্রমে আমার সেই মাল বোঝাই গাড়ীগুলিও সেইদিন কাঁথিতে উপস্থিত হওয়ায় পরদিন

উপেন্দ্র বাবুর বাটী হইতে নিজের বাসায় উঠিয়া আসিলাম। কিন্তু সেদিনও উপেন্দ্রবাবু আমাদিগকে দুইবেলা আহারাদি না করাইয়া ছাড়িলেন না। নূতন বাসা বাটীর সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইলে পরিবারবর্গকেও কাঁথিতে আনা হইল। কাঁথিতে ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা খুব অধিক ছিল। তাহা ব্যতীত ট্রেজারি (Sub-Treasury), সার্টিফিকেট ডিপার্টমেণ্ট প্রভৃতি আমার হাতে থাকায় একবারেই মফঃস্বলে বাহির হইতে হইত না। সন্ধ্যার পর আমার বাসাতেই গান বাজনা, গল্পগুজব এবং নানাবিধ আমোদ প্রমোদের আয়োজন হইত। সিনিয়র মুন্সেফ অক্ষয় কুমার সেন অতি সুরসিক ও সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। পি, ডবলিউ ডিপার্টমেণ্টের ক্যাসিয়ার বাবু অতি সুন্দর সেতার বাজাইতেন। আরও অনেকগুলি সঙ্গীতজ্ঞ আমোদপ্রিয় লোকও প্রতিদিন আমার বাসায় আসিতেন। নন্দলাল বাবু এক একদিন আসিয়া আপ্যায়িত করিতেন। সমুদ্র তীর হইতে কাঁথি মাত্র পাঁচ মাইল ব্যবধান। সামুদ্রিক হাওয়ায় ও মনের স্ফুর্ত্তিতে শরীর একটু হৃষ্টপুষ্ট হইল, লাবণ্যও বৃদ্ধি হইল। কিন্তু দুই চারিমাস পরেই নন্দলাল বাবুর ব্যবহার এরূপ হইয়া উঠিল যে কাঁথিতে আর থাকা যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনায় বিদায় লইয়া স্থানান্তরে বদলীর চেষ্টা করা কর্ত্তব্য কিনা তাহাই তখন চিন্তার স্থল হইয়া দাঁড়াইল। নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণে আমার প্রতি তাঁহার মনোভাব অত্যন্ত খারাপ হইয়া উঠিল।

(১) তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সবডিভিসনাল অফিসার সর্ব্বলোক

প্রিয় দেবপ্রকৃতি সদাশয় জগবন্ধু বাবুকে তিনি অভদ্রোচিত আখ্যায় অভিহিত করিতেন। আমি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতাম।

(২) অতি অল্পদিনের মধ্যেই ভগবানের কৃপায় আমি নগর-বাসী সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলাম। আমার বাটী হইয়াছিল সকল প্রকার আমোদ প্রমোদ, হাস্য কৌতুকের কেন্দ্রস্থল।

(৩) জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর Mr. C. I. S. Faulder I. C. S. মহোদয় পরিদর্শন উপলক্ষে আসিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ঃ—

"I find S. D. O is in the habit of transfering all cases involving intricate questions of land dispute to the second officer. He ought to try these cases himself"

আমার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ঃ—"I see much of this officer's work on appeal and I have always found it conscientious and careful. I thought, I recommended him for first class powers, but he has not yet got them."

(৪) সর্ব্বগুণান্বিত, সঙ্গীতজ্ঞ, সদাশয় সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয় নন্দলালের পরেই তমলুকের সবডিভিসনাল অফিসার পদে আসিয়াছিলেন। এই সর্ব্বলোকপ্রিয়, আদর্শচরিত্র রাজকর্ম্ম-

চারী সম্বন্ধে তিনি নানারূপ প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। আমি তখনই প্রতিবাদ করিতাম।

বিদায় না লইয়া বদ্‌লী হইবার উপায় নাই বুঝিয়া, আড়াই মাসের বিদায় লইয়া দিগনগরে আসিলাম। কাঁথি অবস্থিতি সময়ে উপেন্দ্র বাবু উকীল এবং অক্ষয় কুমার বাবু মুন্সেফ ব্যতীত আরও অনেকগুলি কর্ম্মচারী, উকীল এবং অন্যান্য ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাবু সুকুমার ভট্টাচার্য্য, তারাপদ চট্টোপাধ্যায় এবং দেবেন্দ্র নাথ সেন, মুন্সেফ। সুকুমার বাবুর একটী নিকট সম্বন্ধের ভাগিনেয় অনুকূল ভট্টাচার্য্যের সহিত আমার মধ্যম সহোদর দেবেন্দ্র নাথের প্রথমা কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং আমরা উভয়েই পরস্পরের বৈবাহিক ছিলাম। খাস মহালের সব-ম্যানেজার জ্ঞানদা প্রসাদ বসু, ইনি দাঁতন স্কুল হইতে আমার হেডমাষ্টারীর সময় পাশ করিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত আমাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন এবং আমার একজন প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন। আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন ডাঃ যাদব কৃষ্ণ সেন, সব-রেজিষ্টার কালীপদ মিত্র, হেড মাষ্টার তারক গোপাল ঘোষ, উকীল মানিক চন্দ্র ভড়, শিবরাম বসু ও অঘোর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের দিগনগর গ্রামের প্রায় পাঁচ মাইল উত্তর পশ্চিমে মদ্দই শ্রীরামপুর নিবাসী স্বর্গীয় রাজ নারায়ণ সিংহ মহাশয় কাঁথিতে খাস মহালের জমি বন্দোবস্ত লইয়া বেশ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র শ্রীনাথ ও

জানকীনাথ কাঁথিতে পাকা বাড়ী প্রস্তুত করিয়া কনিষ্ঠ জানকী ওকালতি আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং জ্যেষ্ঠ শ্রীনাথ বিষয় বিভবের তত্ত্বাবধান করিতেন। শ্রীনাথ নন্দলালের অযথা খোসামোদ করিতেন ; নন্দলালের প্ররোচনায় তিনিও আমাকে অপদস্থ করিবার নানারূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। নন্দলালের সুপারিসে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদও পাইয়াছিলেন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাকে পদটী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। প্রমথ নাথ এই বৎসর কাঁথির স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কাঁথি নিবাসী বীরেন্দ্র নাথ শাসমল প্রমথের সহপাঠী ছিলেন ; ইনি আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। উত্তরকালে ইনি একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার, মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং স্বদেশবৎসলদিগের অন্যতম নেতা হইয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ছয়মাসের জন্য কারাদণ্ডও অম্লান বদনে ভোগ করিয়াছিলেন।

আমার বিদায় মঞ্জুর হইবার পর যে কয়দিন কাঁথিতে ছিলাম, সে কয়দিনই হাকিম, উকীল, অন্যান্য কর্ম্মচারীবর্গ এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক অনেকেই আমাকে বিদায়ী ভোজ দিয়াছিলেন। ১৮৯৯ সালের মে মাসে সপরিবারে কাঁথি পরিত্যাগ করিয়া দিগনগরে উপস্থিত হইলাম। এই অবকাশ সময়ের মধ্যে মহেশপুরের (তখন নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল, পরে যশোহরের অন্তর্ভূক্ত হয়) অন্যতম জমিদার প্রতাপ নারায়ণ রায় চৌধুরী

মহাশয়ের পুত্র দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী নলিনীবালা দেবীর সহিত প্রমথ নাথের বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। আত্মীয়স্বজন, কুটুম্ব এবং অনেক-গুলি বন্ধুবান্ধব এই উপলক্ষে দিগনগরে আসিয়াছিলেন। পাশা-পাশি দুইটী বাড়ী (বড় বাড়ী ও ছোট বাড়ী) তখন বেশ সৌষ্ঠব সম্পন্ন থাকায় আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধববর্গের কোন অসুবিধা হয় নাই। কনিষ্ঠ সহোদর রাজেন্দ্র নাথই যথারীতি নান্দীমুখ, বৃদ্ধি শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচিত সঙ্গীতজ্ঞ শশী বাবু ও কালো বাবু নামক দুইটী যুবক কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র রাধিকা প্রসাদের (জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র স্বর্গীয় কেশব চন্দ্রের একমাত্র পুত্র) বাটীতে, যাহাকে সকলে বড়বাড়ী বলিত সেখানে, তাঁহাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। দুই তিন দিন সন্ধ্যার পর হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ ছয় ঘণ্টা তাঁহাদের গান হইয়াছিল। সেই গানের সুখ্যাতি প্রচার হইয়া পড়ায় শেষের দুইদিন পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতেও প্রায় চারি পাঁচশত লোকের সমাগম হইয়াছিল। প্রমথ নাথের বিবাহ উপলক্ষে মধ্যম সহোদর দেবেন্দ্র নাথ সপরিবারে, রাজেন্দ্র নাথ সপরিবারে, আমার জামাতা সুরেন্দ্র কুমার, দেবেন্দ্রের জামাতা অনুকূল ও কন্যা হিরণ্ময়ী, শ্যালক পরেশনাথ মাতা ও পত্নীসহ, বিদেশস্থ কয়েকটী বন্ধুবান্ধবদিগের পরিবারবর্গ এবং দেবেন্দ্র, রাজেন্দ্র ও রাধিকা প্রসাদের দুই চারিজন বন্ধুর সমাগম হইয়াছিল। পূজনীয়া পিতৃব্য পত্নী ও দেবেন্দ্র পত্নী রেষারেষি,

দ্বেষাদ্বেষী ভুলিয়া এই উৎসবে পূর্ণ উৎসাহে ও পূর্ণ মাত্রায় যোগ-দান করিয়াছিলেন। রাধিকা প্রসাদের মাতাঠাকুরাণী, রাধিকা প্রসাদ, তাহার মাতুল পূর্ণচন্দ্র, আমাদের মাতুল লালবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী, রামগোবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি স্বগ্রাম বাসী সমস্ত ভদ্রলোকই পরমাত্মীয়ের ন্যায় অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পরলোকগতা ভগ্নী সৌদামিনী দেবীর স্বামী ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই উৎসবে উপস্থিত হওয়ায় বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। সৌদামিনীকে মনে পড়ায় দুই এক বিন্দু অশ্রুপাতও করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, কাজটী বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ হইয়াছিল। তবে অবস্থার অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। পত্নীর হাতে কয়েক শত টাকা সঞ্চিত ছিল বলিয়া অধিক দেনা করিতে হয় নাই। বিশেষতঃ সে সময় দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, মৎস্য, তরিতরকারী, তৈল ও সন্দেশ প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই সুলভ থাকায় অনেকটা সাহায্য হইয়াছিল। তবে পূর্ব্বে যেখানে ঢেঁকিশাল ছিল, সেইস্থানে একটী পাকাঘর মায় দালান এবং প্রস্রাবাদি করিবার একটী নিভৃত স্থান ও উঠানটী পাকা করিয়া লইতে প্রায় পাঁচ ছয় শত টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইট, কাঠ কতকগুলি মজুত ছিল বলিয়াই এত অল্প ব্যয়ে ঐ কাজগুলি সমাধা হইয়াছিল।

প্রমথ নাথের বিবাহের কয়েকদিন পরেই রাধিকা প্রসাদের কন্যা বিভাবতীর বিবাহ অতি সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ হইয়া-ছিল। নাত্‌নীর বিবাহে একটু নূতন করিয়া আমোদ করিতে

ইচ্ছা হইল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে আমাদের দুইটী বাড়ী (বড়বাড়ী ও ছোটবাড়ী) পরস্পর সংলগ্ন। দুই বাড়ীর সদর দরজা এবং খিড়কি দুয়ার দিয়া যাতায়াতের পথ ব্যতীত ছাদের উপর উঠিয়া এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যাওয়া আসা হইত। উৎসব উপলক্ষে আমাদের বাটীর সকলেই সেদিন অতি প্রত্যুষেই রাধিকা প্রসাদের বাটীতে গিয়াছিলেন। কেবল পিতৃব্যপত্নীর বয়িয়সী মাতাঠাকুরাণী এবং একটী কিশোরী পরিচারিকাকে সকলে বাটীতে রাখিয়া গিয়াছিলেন। পরিবারের মধ্যে আমিই সর্ব্বোজ্যেষ্ঠ; সুতরাং আমাকেই সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে হইতেছিল। ইহার মধ্যেই একটু অবসর পাইলেই এক একবার নিজ বাটী দেখিয়া যাইতেছিলাম। পূর্ব্বোল্লিখিত বৃদ্ধা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে যোগী, আমাকে কি বাসর ঘরে নিয়ে যাবিনে?" আমি কহিলাম "নিশ্চয় লইয়া যাইব। তবে তোমাতে আমাতে বহুরূপীর ন্যায় সাজিয়া যদি একটা সং দিতে রাজী হও, তাহা হইলে পেট ভরিয়া ভাল সন্দেশ ও রসগোল্লা খাওয়াইব, এমন কি তাহা হইলে তুই একটা টাকাও পাইতে পারিবে।" বৃদ্ধা বড়ই সন্দেশ ও রসগোল্লার ভক্ত ছিলেন, এবং কেহ যদি তাঁহাকে রসগোল্লা কিনিয়া খাইবার জন্য চারি আনা বা আট আনা দিতেন, তাহা হইলে আনন্দের সীমা থাকিত না; দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। বৃদ্ধার চেহারাটীও আমার মতলব সিদ্ধির অনুকূল ছিল। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, ধপ্‌ধপে পাকা চুলগুলি খুব ছোট

করিয়া ছাঁটা, চক্ষের দৃষ্টি উজ্জ্বল, দাঁত তখন পর্য্যন্ত একটীও পড়ে নাই ; তবে শ্রবণ-শক্তি অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল। শরীরের গঠন বেশ হৃষ্টপুষ্ট এবং একটু দীর্ঘায়তন ছিল। বৃদ্ধাকে কহিলাম "আইমা, সকাল সকাল স্নান করিয়া পূজা আহ্নিক সারিয়া লও, তারপর ইচ্ছা হয় চারিটী ভাত খাইও।" বৃদ্ধা মহা খুসি, তখনই তৈল মর্দ্দন করিয়া দীঘি হইতে স্নান করিয়া আসিলেন এবং নিত্য নৈমিত্তিক পূজা আহ্নিকে বসিলেন। ইত্যবসরে আমিও স্নান করিয়া খালি পায়ে রাধিকা প্রসাদের বাটি হইতে প্রায় তিনপোয়া সন্দেশ এবং অর্দ্ধসের পরিমাণ উৎকৃষ্ট দধি আনিয়া বৃদ্ধার সম্মুখে রাখিয়া দিলাম। আমার পায়ের শব্দ পাইয়া চক্ষু উন্মোচন করিয়াই সম্মুখে অতি লোভনীয় প্রিয় খাদ্য দেখিয়া মালা জপের সময়টা একটু সংক্ষেপ করিয়া লইলেন। খুব একদম হাসিয়া আমাকে কতই আশীর্ব্বাদ করিলেন। কহিলেন, "যোগী বল্‌ত আমাকে কি করিতে হইবে ? তুই যা বল্‌বি তাই করিব।" আমি কহিলাম, "আগে এগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া লও, যাহা করিতে হইবে পরে বলিব।" জলযোগান্তে বৃদ্ধাকে কহিলাম "আইমা, তোমাকে সাহেব সাজিতে হইবে, আর আমি সাজিব তোমার মেমসাহেব।" "আর পাঁচি (পূর্ব্বোলিখিত কিশোরী পরিচারিকা) হইবে আমাদের বালক ভৃত্য।" দুই চারিটা কথা যাহা বলিতে হইবে তাহাও শিখাইলাম। সেটেলমেণ্টে চাকরী করিবার সময় দুই তিন রকমের সাহেবী পোষাক প্রস্তুত করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর তাহারই মধ্যে এক স্যুট পছন্দ করিয়া

বুড়ীকে পরাইলাম। হ্যাট মাথায় দিতে কোনমতে রাজী না হওয়ায় একটা সাহেবী স্মোকিং ক্যাপ (Smoking cap) মাথায় পরাইলাম। কিন্তু জুতা মোজা পরিতে কোন ক্রমেই সম্মত করিতে পারিলাম না। নিজে মেয়েদের সাড়ি একখানি ঘাঘরার মত পরিয়া গায়ে একটা বডিস (Bodice) দিয়া, মাথায় ছোট একটি হ্যাট এবং জুতা মোজা পরিয়া একটি অদ্ভুত রকমের মেমসাহেব সাজিলাম। বৃদ্ধার মুখে ও হাতে গাউডার মাখায় রংটা দুইজনেরই বেশ সাহেবী রকমই হইল। বস্তুতঃ রাত্রিকালে বুড়ীকে একটি ফিরিঙ্গী এবং আমাকে নবীনা দেশী মেম বলিয়াই মনে হইতেছিল। পাঁচিকে মালকোঁচা ধরণে কাপড় পরাইয়া, আমার নিজের একটা হাতকাটা জামা পরাইলাম এবং একখানি সাদা চাদরে মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া তাহার খোপাটী ঢাকিয়া দিলাম। এইভাবে সাজিয়া গুজিয়া আমরা শয়ন ঘরের সম্মুখস্থ দালানে বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় বাড়ী ঘর দেখিয়া শুনিয়া তালা বন্ধ করিয়া যাইবার অভিপ্রায়ে পত্নী হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুযোগ বুঝিয়া আমিও দুই একটা ইংরাজী বুলি বিকৃত সুরে কহিয়া দিলাম। অপরিচিত কয়েকটা সাহেব মেম প্রভৃতিকে দেখিয়া পলাইবার চেষ্টা করিবা মাত্র আমি তাঁহাকে ডাকিয়া সমস্ত বুঝাইয়া দিলাম এবং ব্যাপারটা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলাম। তারপর পাঁচিকে একবার পাঠাইয়া যখন সংবাদ পাইলাম যে বাসর ঘর বেশ সরগরম হইয়াছে, বর ক'নে আসিয়া বসিয়াছে, চিরপ্রচলিত প্রথামত গান, গল্প,

হাস্য কৌতুকের তরঙ্গ উঠিয়াছে, সেই সময় ছাদের পথে আমরা তিনজন যাইয়া বাসর ঘরের দুয়ারে উপস্থিত হইলাম। এই অভাবনীয় একটা দৃশ্য দেখিয়া গান বাজনা, হাস্য কৌতুক একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। উপস্থিত মহিলাদিগের মধ্যে দুই একটী সহর ঘেঁসা, একটু লেখাপড়া জানা তরুণী বলিয়া উঠিলেন, "ভাই, ইহারা বহুরূপী।" প্রাচীনারা একেবারে ভয়ে আড়ষ্ট। পূর্ব্বশিক্ষা মত ছদ্মবেশী বালিকা পাঁচি প্রথমেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বর কন্যাকে এবং উপস্থিত মহিলাবৃন্দকে খুব লম্বা সেলাম করিয়া কহিল:—"হাম্‌রা সাহেব, মেমসাহেব বর সাহেবকো, উনকা মেমসাহেবকো সেলাম কর্‌নে আয়া।" আদেশের প্রতীক্ষা না করিয়াই বৃদ্ধার হাত ধরিয়া বাসর ঘরে প্রবেশ করিলাম। শিক্ষামত বুড়ী কহিল, "দেখিয়ে সাহেব, হাম্‌রা তিনঠো মেম আগাড়ি ফৌত হুয়া, এই নয়া মেমকো সাদি করকে বহুৎ হায়রাণী মে গিরা হ্যায়। হামেসা বোলতেহেঁ চলা যাঙ্গে, চলা যাঙ্গে, আবি একশো রূপেয়া দেনেসে রহেগা।" এই কথা শেষ হইবামাত্র আমি বামহস্তে বৃদ্ধার কোমর বেষ্টন করিয়া একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া সাহেবী ধরণে নৃত্য করিলাম। এতক্ষণে অনেকে বুঝিলেন আমরা কে, মহাহাস্য কোলাহল উঠিল। নূতন জামাই কহিলেন, কাল তোমাদের বখ্‌সিস দিব। পরদিন অন্যান্য খরচের সঙ্গে সাহেব মেমের ও তাদের বালক ভৃত্যের খানা পিনার জন্য কয়েকটী টাকা দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, বুড়ীকে পেট ভরিয়া রসগোল্লা, দধি ও সন্দেশ খাওয়ান হইয়াছিল এবং নগদ দুটী টাকাও দেওয়া হইয়াছিল।

আমি কাঁথি হইতে বিদায় লইয়া দেশে আসিবার কিছু পূর্ব্বে রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর হইয়া কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত মার্টিন কোম্পানী একটী ছোট (N. G.) রেললাইন খুলিয়াছিলেন, তাহা ইতি-পূর্ব্বে লিখিতে ভুলিয়াছিলাম। দিগনগরে একটী ষ্টেশন হইয়াছিল। এই রেল লাইনটী হওয়ায় আমাদের গ্রামের এবং লাইনের পার্শ্ববর্ত্তী অনেকগুলি গ্রামবাসীর অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। পূর্ব্বে যাঁহারা দিগনগর ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে দক্ষিণে বা পশ্চিম অঞ্চলে যাইতেন, তাঁহাদিগকে রাণাঘাটে আসিয়া ট্রেণ ধরিতে হইত এবং যাঁহারা উত্তর বা পূর্ব্বাঞ্চলে যাইতেন তাঁহাদিগকে বগুলা ষ্টেশনে যাইতে হইত। কিন্তু এই সুবিধা সত্ত্বেও চূর্ণি নদীর উপর পুল না হওয়ায় স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ ও পীড়িত যাত্রীদিগের সমূহ কষ্ট হইত। রাণাঘাট হইতে বড় গাড়ীতে প্রায় দুই মাইল আসিয়া নদীর তীর হইতে অনেকটা দূরে যাত্রীদিগকে নামাইয়া দেওয়া হইত। সেই স্থান হইতে ক্রমশঃ ঢালু পথে নদীর তীরে আসিয়া খোলা খেয়ার নৌকায় নদী পার হইয়া ক্রমশঃ উপর-দিকে অনেকটা রাস্তা হাঁটিয়া যাইয়া "আঁইসতলা ঘাট" নামক ষ্টেশনে ছোট গাড়ীতে উঠিতে হইত। কয়েক বৎসর পরে যখন রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগর হইয়া লালগোলা ঘাট পর্য্যন্ত বড় লাইন প্রস্তুত হয়, সেই সময় নদীর উপর একটী পুল হইয়াছিল এবং তাহারও কয়েক বৎসর পরে রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর পর্য্যন্ত বড় লাইন যতদিন না হইয়াছিল, ততদিন নদী পারাপারের কষ্ট দূর হয় নাই।

প্রমথ নাথের বিবাহ হইল, বিভাবতীর বিবাহ হইল, আমারও বিদায় কাল শেষ হইয়া আসিল। কাঁথিতে যাহাতে না যাইতে হয়, সেই চেষ্টায় কলিকাতায় যাইয়া বেঙ্গল আফিসের হেড আসিষ্ট্যাণ্ট জ্ঞান বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করায় জানিলাম যে আমাকে পুনরায় কাঁথিতেই যাইতে হইবে, গভর্ণমেণ্ট এইরূপ আদেশ পূর্ব্বেই লিখিয়া রাখিয়াছেন। মহা বিপদে পড়িলাম। ভূপতি সেই সময় চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের পার্শনাল আসিষ্ট্যাণ্ট ছিলেন। তাহার একখানি পত্রে জানিলাম, চট্টগ্রামে একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রয়োজন হইয়াছে; আমি যদি যাইতে সম্মত হই, তাহা হইলে কমিশনার বাহাদুরের দ্বারা গভর্ণমেণ্টে লিখিতে হইবে। অগত্যা আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম এবং অনতিবিলম্বে চট্টগ্রাম যাত্রা করিবার জন্য তারযোগে আদেশ পাইলাম। পরিবারবর্গকে দিগনগরে রাখিয়া আমি চাকর, ব্রাহ্মণ লইয়া চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম। প্রথমে দুই চারিদিন ভূপতির বাসায় থাকিয়া পরে একটী পৃথক্ বাসা ভাড়া করিয়াছিলাম। পূজার ছুটীতে দেশে আসিয়া পরিবারবর্গকে চট্টগ্রামে লইয়া গিয়াছিলাম। আমার পূর্ব্ব পরিচিত দুই তিনটী বন্ধুকেও এই সময় চট্টগ্রামে পাইয়াছিলাম। প্রথমেই কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিতেছি। ইঁহার সঙ্গে নোয়াখালিতে একত্রে কয়েক বৎসর ছিলাম; ইনি চট্টগ্রামেও স্পেশ্যাল সব-রেজিষ্টার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তারপর বাবু অভয় চরণ বল। আমার নোয়াখালি

অবস্থিতিকালে ইনি তথাকার কালেক্টারীর নাজীর ছিলেন ; পরে চট্টগ্রামে কালেক্টরীর সেরেস্তাদার পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। পরিশেষে বাবু দেবেন্দ্র নাথ মজুমদার। ইঁহার সহিত তমলুকে এবং মেদিনীপুরে একত্রে ছিলাম এবং বন্ধুত্ব হইয়াছিল। ইনি চট্টগ্রামে সে সময় রেলওয়ে পুলিশের ইনস্‌পেক্টার পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই তিনটী পুরাতন বন্ধু পাইয়া এবং পিতৃব্য পুত্র ভূপতি সেখানে থাকায় মনে বেশ একটা আনন্দ হইয়াছিল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন সদাশয় মিঃ লি (Mr. J. H. Lea I. C. S.)। ইনি প্রথম হইতেই আমাকে সুনজরে দেখিয়াছিলেন। অনেক গুরুতর এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার আমাকে দিতেন। বিশেষতঃ সেটেলমেণ্ট ও রাজস্ব সংক্রান্ত কোন বিশেষ বিশেষ চিঠি পত্র গভর্ণমেণ্টে পাঠাইতে হইলে, একজন পৃথক সেটেলমেণ্ট ডেপুটী কালেক্টর থাকা সত্ত্বেও সাহেব বাহাদুর আমাকেই সেই সকল চিঠিপত্র ড্রাফট (Draft) করিবার আদেশ দিতেন। এই সকল কাজ ও ফৌজদারী মোকদ্দমা ব্যতীত আবগারী এবং ইনকম-টাক্সের ভারও আমার হাতে ছিল।

চট্টগ্রাম একটী বৃহৎ জেলা। ভারতবর্ষে মুসলমান অধিকার স্থাপনের সময় হইতে কয়েক শতাব্দী এই জেলা এবং ইহার সংলগ্ন পার্ব্বতীয় ভূভাগ আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল। অধিকাংশ স্থানই নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ এবং মগ ও ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের আবাসভূমি ছিল। নবাব সায়েস্তা খাঁই অনেক প্রয়াসে এই ভূভাগ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই

ক্রমশঃ স্থানটীর উন্নতি সাধন হইতে থাকে। বিশেষতঃ জল-দস্যুদের অমানুষিক অত্যাচার নিবারণের পর হইতেই চট্টগ্রাম পূর্ব্ব-দক্ষিণ বঙ্গের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল এবং স্থানটী বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। পরে ইংরাজাধিকার সময়ে ইহার সমধিক উন্নতি হইয়াছে। সহরটী বেশ বড়। সমস্ত সরকারী আফিস এবং সম্পত্তিশালী অনেক লোকের বাংলো সহরের মধ্যস্থিত পরস্পর বিচ্ছিন্ন, ছোট ছোট পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ ভূমিতে নির্ম্মিত হইয়াছে। দেখিতে বড়ই সুন্দর। মফঃস্বলে যাইবার সময় আমাকে সন্দীপ প্রণালী (Sundip Channel) হইয়া নৌকাযোগে জেলার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত কক্‌স্‌ বাজার সব-ডিভিসান পর্য্যন্ত যাইতে হইত। ঝড় তুফান উঠিলে কখন কখন প্রাণ সংশয় হইয়া উঠিত। সে সময় চট্টগ্রামে খুব খাদ্যসুখ ছিল। উৎকৃষ্ট চাউল, খাঁটী দুগ্ধ, প্রায় তিন পোয়া একসের ওজনের এক একটা গল্‌দা চিংড়ী, রুই, মিরগাল, কাতলা এবং নানারূপ সুখাদ্য সামুদ্রিক মৎস্য সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইত। আমি চিরদিনই একটু উদর-পরায়ণ, আহার বিষয়ের পারিপাট্য চিরদিনই ছিল; সুতরাং ঐ সকল মৎস্যের নানাবিধ উপাদেয় ব্যাঞ্জনাদি প্রস্তুত করাইয়া আহারের ব্যবস্থা করা হইত। এইরূপে কিছুদিন বেশ কাটিয়া গেল। পরিবারদিগকে চট্টগ্রামে আনিবার জন্য পূজার বন্ধে যে সময় দিগনগর যাই, তাহার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে ভূপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজকুমারীর জ্বর হইয়াছিল দেখিয়া আসিয়া-

ছিলাম। সপ্তমী পূজার দিন আমরা পূজার আমোদে ব্যস্ত আছি এমন সময় দেখিলাম ভূপতির একটী চাকর বিষণ্ণ মুখে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসায় কহিল, "দিদিমণি মারা গিয়াছেন, বাবু, মা ও ছেলেরা ষ্টেশনে আছেন; শীঘ্রই পাল্কী বা গরুর গাড়ী লইয়া যাইতে হইবে।" এই সংবাদে আমাদের পূজার আমোদ বন্ধ হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ দুইখানি ভাল গরুর গাড়ী লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াই দেখিলাম, ট্রেণ হইতে নামিয়াই ভূপতি-পত্নী প্লাটফরমে পড়িয়া লুটাইতেছেন এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। ভূপতি নিকটে বসিয়া অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। নানারূপ সান্ত্বনা দিয়া কোনপ্রকারে তাহাদিগকে বাটিতে আনা হইল। মেয়েটি সর্ব্বগুণসম্পন্না এবং বাপ মায়ের বড়ই প্রিয় সন্তান ছিল। বয়স মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। এই কন্যার বিবাহে ভূপতি অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্তও হইয়াছিল। পূজার ছুটী শেষ হইলে আমি পরিবারদিগকে লইয়া চট্টগ্রাম যাত্রা করিলাম। ভূপতি তাহার পরিবারবর্গকে দিগনগরে রাখিয়া আমাদের সঙ্গে চট্টগ্রামে আসিয়াছিল এবং কয়েকদিন আমাদের সঙ্গে থাকিয়া দেড় মাসের বিদায় লইয়া যায় এবং তার পরেই দার্জ্জিলিংয়ে বদলী হইয়াছিল।

একটী বিশেষ তদন্ত উপলক্ষে আমাকে শ্যামা পূজার দিনই মফঃস্বলে যাত্রা করিতে হইয়াছিল। অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিবার পর রাত্রির আহারাদি নির্ব্বাহের জন্য একটী পুলিশ থানায় উঠিয়াছিলাম। হঠাৎ জ্বর ও গলার বেদনায় আক্রান্ত

হইয়া চট্টগ্রামে ফিরিয়া আসিতে হইল। জ্বর ও গলার বেদনা খুব বাড়িতে লাগিল। প্রথমে আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন চিকিৎসা আরম্ভ করেন। বন্ধুবর দেবেন্দ্র প্রথম হইতেই সন্দেহ করিয়াছিলেন যে আমি সাঙ্ঘাতিক "ডিপ্‌থিরিয়া" (Dyptheria) রোগে আক্রান্ত হইয়াছি। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি সিভিল সার্জ্জেনকে আনাইলেন। মাসাবধি চিকিৎসার পর আমার জীবনের আশা হইল; রোগমুক্তও হইলাম। কিন্তু কণ্ঠস্বর একেবারে নষ্ট হইয়াছিল। অতি বিকৃত, অতি অস্পষ্ট নাকি সুরে প্রায় দুই মাসের উপর কথা কহিতে হইয়াছিল। এই পীড়ার সময় দেবেন্দ্র নাথ, রেলওয়ে পুলিসের সব-ইন্‌স্‌পেক্টার অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আবগারী সব-ইন্‌সপেক্টার ভুবন মোহন বসু, জামাতা সুরেন্দ্র কুমার (ইনি সেই সময় চট্টগ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলেন) এবং পরিচারক রজনীকান্ত পাল আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অকাতর পরিশ্রমে আমার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। একটু সুস্থ হইবা মাত্রই তিন মাসের বিদায় লইয়া দেশে আসিয়াছিলাম। দেবেন্দ্র বাবুর সহিত মেদিনীপুর ও তমলুকে বন্ধুত্ব স্থাপন হয়; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের প্রকৃত মহত্ত্ব, তাঁহার পরদুঃখকাতরতা, সুমার্জ্জিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং ঈশ্বরানুরক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় আমার এই পীড়ার সময়ই পাইয়াছিলাম।

শীতের প্রারম্ভেই দিগনগর আসিয়াছিলাম। সমস্ত শীতকালটাই এবার দিগনগরে কাটাইলাম। এই সময় মাগুর, কই, সিঙ্গি (জিওল), বড় বড় তোড়া প্রভৃতি রোগীর পথ্য নানাবিধ

সুস্বাদু মৎস্য এবং তরিতরকারী, নির্জ্জলা খাঁটী দুগ্ধ প্রভৃতি সমস্তই পাওয়া যাইত। সকালে বিকালে নিয়মিতরূপ ভ্রমণ এবং সকল বিষয়ে বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে থাকিবার ফলে শরীরটা শীঘ্রই সারিয়া উঠিল। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আমাকে পাঠাইবার জন্য গভর্ণমেণ্টে দরখাস্ত পাঠাইয়াছিলাম। তাহার ফলে এবং জ্ঞানবাবুর কৃপায় আমাকে বর্দ্ধমান সদরে বদলী করা হইল। ১৯০০ সালে ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম। প্রথমতঃ বন্ধুবর আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন ডাক্তার অভয় কুমার সেন মহাশয়ের বাসায় দুই একদিন থাকিয়া, পরে প্রতাপপুর নামক পল্লীতে একটী পৃথক বাসা ভাড়া লইয়াছিলাম। সব-ডেপুটী পদে ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার বর্দ্ধমানে থাকিবার সময় আমলাবর্গ এবং স্থানীয় অন্যান্য অনেক ভদ্রলোকই আমার পরিচিত ছিলেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, সবজজ প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ একস্থানে অধিক দিন থাকেন না। পূর্ব্ব পরিচিত উমেশচন্দ্র গোস্বামী আমার পূর্ব্বেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পদে উন্নতি লাভ করিয়া এই সময় বর্দ্ধমানে আবগারী ও ইন্‌কমট্যাক্সের স্পেশাল ডেপুটী কালেক্টর পদে নিযুক্ত ছিলেন। এবার আসিয়া কুমার রমেন্দ্র কৃষ্ণ দেব (পরে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন), রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব বসু, শশীভূষণ সেন, পূর্ণচন্দ্র মৌলিক এবং মৌলবী আব্দুল কাদেরকে বর্দ্ধমানে ডেপুটী পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম। শান্তিপুর নিবাসী বাবু হরিদাস পাল ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। যে বাসাটী প্রথমে লইয়া-

ছিলাম, তথায় নানারূপ অসুবিধার জন্য বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ উকীল বাবু তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী একটী ছোট খাট সুন্দর দ্বিতল বাটীতে উঠিয়া আসিয়াছিলাম। তারাপ্রসন্ন বাবু, তাঁহার ভ্রাতা গুরুপ্রসন্ন বাবু এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। এই বাসায় আসার পরেই পরিবারবর্গকে বর্দ্ধমানে আনা হইয়াছিল। জামাতা সুরেন্দ্র কুমার বি,এ পাশ করা পর্য্যন্ত কলেজে অধ্যয়ন না করিয়া সত্বরেই একটা চাকরীতে প্রবিষ্ট হইবার অভিপ্রায়ে বর্দ্ধমানে আসিয়াছিলেন। পুলিসের সব-ইন্‌সপেক্টার হইবার বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া, চেষ্টা করিয়া তাহাতেই জামাতাকে প্রবেশ করাইয়াছিলাম। সে সময় জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন মিঃ বি, ফলে, আই, সি, এস (Mr. B. Foley I. C. S.)। তিনি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। প্রধানতঃ তাঁহার কৃপাতেই জামাতা সহজেই পাশ করিয়া পুলিস সব-ইন্‌সপেক্টারী পাইয়াছিলেন।

কন্যা নীলনলিনীর এই বিবাহ সুখের হয় নাই। পত্নী শাসনের মাত্রা জামাই বাবাজীর প্রায় সীমা ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। কন্যাও সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে তর্কবিতর্ক করিত। এক একদিন সুরেন্দ্র কুমার বড়ই উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেন। গতিক মন্দ দেখিয়া, বন্ধুবর উমেশ চন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া জামাতাকে কিছুদিনের জন্য বাটী পাঠান হইয়াছিল। তাহার কিছুদিন পরে কন্যাকে নিজে সঙ্গে লইয়া জামাতার বাটীতে রাখিয়া আসিয়াছিলাম।

এই সময়ে দিগনগরে কয়েকটী যুবক কিছু কিছু লেখাপড়া শিখিয়া নিশ্চেষ্টভাবে কাল কাটাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে দেখিলাম আমার মাতুল চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতৃব্য পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র যতীন্দ্র, এবং রামলাল বিশ্বাস মহাশয়ের পুত্র রাঘব চন্দ্রের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল। কোনরূপ একটা চাকরী করিয়া দিবার জন্য বার বার আমাকে পত্র লেখায় তাদের দুজনকেই বর্দ্ধমানে আনিয়াছিলাম। আমার বাসাতেই তাহাদিগকে রাখিয়া চাকরীর চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম। রাঘব চন্দ্র ম্যাট্রিক পাশ করিয়া আই, এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। যতীন্দ্র সামান্যরূপ ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিল। মিঃ ফলেকে ধরিয়া রাঘবকে কালেক্টরীর মধ্যে কেরাণীগিরি পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বন্ধুবর উমেশ চন্দ্র গোস্বামীর চেষ্টায় যতীন্দ্র রাণীগঞ্জে একটী বর্দ্ধিষ্ণু মাড়োয়ারীর আড়তে সামান্য একটী চাকরী পাইয়াছিল।

বর্দ্ধমানে অবস্থিতি সময়ে কিছুদিনের জন্য কালনা সব-ডিভিসনের ভার পাইয়া সেখানে যাইতে হইয়াছিল; বোধ হয় স্থায়ীভাবেই থাকিতে পারিতাম। তাহা হইলে সর্ব্বদাই দিগনগরে যাইয়া বাড়ীঘর দেখাশুনা করিতে পারিতাম এবং জন্মভূমির উন্নতিকল্পে কিছু না কিছু করিতে পারিতাম, কিন্তু অদৃষ্ট দোষে তাহা ঘটিল না। ইতিপূর্ব্বে চট্টগ্রাম, সিংহভূম এবং বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে সেটেলমেণ্টের কাজে একটু অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। সেইজন্য সিংহভূম জেলার পোড়াহাট ষ্টেটের সেটেলমেণ্ট আরম্ভ

হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট প্রথমে আমাকে আসিষ্ট্যাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কয়েক মাস পরেই আমাকে "রেণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার" (Rent Settlement Officer) পদে নিযুক্ত করেন। এলাউয়েন্স (Allowance) বার বরদারী প্রভৃতি লইয়া এই পদে আয় প্রায় বেতনের দ্বিগুণ ছিল। তারপর চক্রধরপুরে আমাদের হেড কোয়াটার হইবে শুনিয়া খুব আনন্দ হইল। কারণ চক্রধরপুর স্বাস্থ্যকর স্থান এবং চাউল, ঘৃত, দুগ্ধ, মাংস, ডিম, দেশী তরিতরকারী, মাখন, তৈল প্রভৃতি সে সময় সেখানে খুব সুলভ ছিল। সেটেলমেণ্ট অফিসার ছিলেন মিঃ জে, টেলর (Mr. J. Taylor)। ইনি সেটেলমেণ্টের কাজে বিশেষরূপ পাকা ছিলেন। বেশ শান্ত প্রকৃতি ও সদ্বিবেচক বলিয়া তাঁহার নিকট কাজ করিতে কোন অসুবিধা হয় নাই। দ্বিতীয় আসিষ্ট্যাণ্ট ছিলেন বাবু রজনী কান্ত সেন। ইনি প্রথমে রোডসেস কমিটীর ওভারসিয়ার পদে নিযুক্ত হইয়া সিংহভূম জেলায় আসেন। নিজের যোগ্যতাগুণে ক্রমে কানুনগো, সব-ডেপুটী, ডেপুটী কালেক্টর, কমিশনারের পার্শনাল আসিষ্ট্যাণ্ট পর্য্যন্ত হইয়া রায় সাহেব উপাধি পাইয়াছেন। ইনি আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন।

প্রমথ নাথকে বর্দ্ধমানে উমেশ বাবুর বাসায় রাখিয়া আসিয়াছিলাম। এই বৎসর প্রমথ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করিয়াছিল। নিজের বুদ্ধি দোষে এবং আমার অজ্ঞাতসারে সংস্কৃত না পড়িয়া তৎপরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষা দেওয়ায়

তাহাকে আই, এ পড়াইতে সাহস হইল না। কারণ কলেজে প্রথম বর্ষেই সংস্কৃত কুমার-সম্ভব, রঘুবংশ প্রভৃতি সে সময়ে পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচিত ছিল। সেইজন্য তাহাকে কলিকাতার "ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে" ডাক্তারী শিক্ষার জন্য ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে অত্যধিক পরিশ্রম এবং নানাপ্রকার অসুবিধা হইতেছে বলিয়া আমাকে না জানাইয়াই ঐ স্কুল পরিত্যাগ করে এবং "কলেজ অব ফিজিসিয়ানস এণ্ড সার্জ্জেনস" ("College of Physicians and Surgeons") নামক একটী কলেজে ভর্ত্তি হইয়া পাঁচ বৎসর অধ্যয়নের পর সুখ্যাতির সহিত পাশ করিয়া "M. C. P. and S." অর্থাৎ "Member, College of Physicians and Surgeons" ডিপ্লোমা পাইয়াছিল। এই কলেজটী সে সময় পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত (affilia ted) না হওয়ায় প্রমথকে পরে অনেকটা অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল।

ইংরাজী ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে সপরিবারে চক্রধরপুরে উপস্থিত হইলাম। রজনী বাবু বেশ একটী পাকা বাড়ী আমাদের জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। সে সময় এখানে পাকা বাড়ীর সংখ্যা অধিক ছিল না। কিন্তু চক্রধরপুর একটী রেলওয়ে ডিষ্ট্রিক্ট (Railway District) বলিয়া রেলওয়ের দিকটা খুব জমকাল রকম ছিল। বড় বড় সাহেব কর্ম্মচারী, Anglo-Indian গার্ড, ড্রাইভার এবং টংসাবতংস ছোট খাট হ্যাটকোট-ধারী কর্ম্মচারী অনেকেই সেইদিকে থাকিতেন। European

Institution, Indian Institution, একটী M. E. School প্রভৃতি সেইদিকে সমস্তই ছিল। রেলওয়ের বাহিরে চক্রধরপুর গ্রামে পুলিশ থানা ও জঙ্গল অফিস (Forest Office) ভিন্ন তখন আর কিছুই ছিল না। তবে আমাদের মাড়োয়ারী ভ্রাতারা প্রথম হইতেই এখানে হাঁটু গাড়িয়া বাণিজ্য ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। কয়েক ঘর হিন্দুস্থানী মুসলমান, বাঁকুড়া জেলার কয়েকজন বাঙ্গালী এবং অনেকগুলি হিন্দুস্থানী হিন্দু নানারূপ কায় কারবার লইয়া এখানে বসবাস করিতেছিলেন। যাঁহার ষ্টেটের বন্দোবস্ত কাজে আমরা আসিয়াছিলাম, তখন পর্য্যন্ত তিনি কুমার নামেই গভর্ণমেণ্টের কাগজ পত্রে অভিহিত ছিলেন। আমরা এখানে থাকিতে থাকিতেই রাজোপাধি পাইয়াছিলেন। নাম রাজা নরপৎ সিংহ দেও। তখন বয়ঃক্রম মাত্র কুড়ি, বাইশ বৎসর ; সচ্চরিত্র, নম্রস্বভাব। হিন্দী, ইংরাজী এবং উড়িয়া ভাষায় ইঁহার বেশ দখল ছিল। ইনি ময়ূরভঞ্জের একটী রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই রাজ বংশের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এইস্থানে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। রাজা নরপৎ সিংহের পূর্ব্বপুরুষগণ ছিলেন নাগপুরের ভোঁসলা রাজাদের অধীনস্থ সামন্ত রাজা। স্থানীয় লোকে তাঁহাদিগকে মহারাজা বলিয়াই উল্লেখ করিত। তাঁহারা ছিলেন সমগ্র সিংহভূম জেলার অধিপতি। বর্ত্তমান সরাইকেনা, খরসোঁয়া পলিটিক্যাল ষ্টেট (Political State) এবং কেরা, আনন্দপুর প্রভৃতি ছোট ছোট জমিদারীগুলি ইঁহাদের অধীনে ছিল। সিপাহী

বিদ্রোহের সময় রাজা নরপৎ সিংহের পিতা মহারাজ অর্জ্জুন সিংহ প্রথমে গভর্ণমেন্টের সপক্ষতা করেন। কিছুদিন পরে সিংহভূমের ডেপুটী কমিশনারের সহিত কি একটা কারণে মনান্তর ঘটায় তিনিও বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়া ছয়মাস কাল ইংরাজ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন এবং পাহাড়ে জঙ্গলে সসৈন্যে লুকাইয়া থাকিতেন। অবশেষে একজন বিশ্বাসঘাতক বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা পুরস্কারের প্রলোভনে ভুলিয়া অর্জ্জুন সিংহকে ধরাইয়া দিয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বেনারসে রাজনৈতিক আইন অনুসারে State Prisoner করিয়া তাঁহার সমগ্র রাজ্য গভর্ণমেন্টের খাস করিয়া লইয়াছিলেন। মহারাজাকে মাসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করিতে হইল। সরাইকেনা, খরসোঁয়া, কেরা, আনন্দপুর প্রভৃতি যুদ্ধের সময় গভর্ণমেন্টের নানারূপ সাহায্য করায়, প্রথমোক্ত দুইটীকে Political State করা হইল। বাকী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারগুলির রাজস্ব মাপ হইয়া তাঁহাদিগকে Revenue Free জমিদার করা হইল। পিতার এই কারাবাসের সময়েই রাজা নরপৎ সিংহ পুণ্যক্ষেত্র বেনারসে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর গভর্ণমেণ্ট ইঁহারও উপযুক্তরূপ বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া, শিক্ষক রাখিয়া, ইঁহাকে ইংরাজী, হিন্দী ও উড়িয়া ভাষায় শিক্ষিত করিয়াছিলেন। বয়োপ্রাপ্ত হইলে ময়ূরভঞ্জাধিপতির কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ দিয়া, কেবল পোড়াহাট নামক পরগণাটী ইঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং গভর্ণমেন্টের রাজস্বের দায় হইতে মুক্তিদেওয়া হয়

পূর্ব্বপুরুষের বাসস্থান পোড়াহাট গড় (চক্রধরপুর হইতে প্রায় আট ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে) কামানের গোলায় চূর্ণ করিয়া চক্রধরপুরে ইঁহার ভবিষ্যৎ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া, আরও কয়েকটী সর্ত্তে ইঁহাকে আবদ্ধ করা হইয়াছে।

চক্রধরপুরে সেই সময় অবস্থানকালে নিম্নলিখিত ভদ্রলোক-দিগের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম। আরও অনেকগুলি ভদ্র-লোকের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল, এখন আর তাঁহাদের নাম মনে হইতেছে না। প্রথমেই বাবু সুন্দর সিং, পোড়াহাট ষ্টেটের এজেণ্ট ও দেওয়ান মহাশয়ের নাম মনে পড়ে; তারপর কেরার জমিদার ঠাকুর লছমী নারায়ণ সিংহ দেও এবং আনন্দপুরের জমিদার ঠাকুর উদিত নারায়ণ সিং দেও। তারপর কেরার দেওয়ান বাবু বৃন্দাবন চন্দ্র ত্রিপাটী এবং জ্যেষ্ঠ কুমারের গৃহশিক্ষক করালীচরণ বিশ্বাস। সেটেলমেণ্ট সংক্রান্ত কাজে আমার সর্ব্বপ্রথমে ইঁহাদের সহিতই পরিচয় হইয়াছিল। তারপর চক্রধরপুরে তৎসাময়িক বাসিন্দার মধ্যে বাবু মহেন্দ্র নাথ ঘোষ, W. C. Shaw & Co, কোম্পানীর ম্যানেজার, বাবু রামলাল দে, জঙ্গল কণ্ট্রাক্টর এবং বাহাদুরী কাষ্ঠের ব্যবসাদার (ইনি দমদমার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট পদেও নিযুক্ত ছিলেন এবং মাসে একবার দুইবার সেখানে যাইয়াও কাজকর্ম্ম করিতেন), ডাক্তার জাহরুল্লা বিশ্বাস, ইঁহার নিবাস নদীয়া জেলার কুষ্ঠিয়া সব-ডিভিসনে। প্রথমে গভর্ণমেণ্টের চাকরীতে এখানে আসিয়া পরে চাকরী পরিত্যাগ করিয়া নিজেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন এবং এইখানেই বিবাহ করিয়া

চক্রধরপুরের বাসিন্দা হইয়া গিয়াছিলেন। বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় P. W D. Sectional Officer or Sub-Overseer ; বাবু রঘুরাম মাড়োয়ারী, জঙ্গল কণ্ট্রাক্টর ও বাহাদুরী কাষ্ঠের ব্যবসাদার, বাবু রাম লাল মিত্র, Chief Clerk, D. T. S Office, বাবু সতীশ চন্দ্র দেব মান্না, Manager of Messrs Sodar Smith & Co., পণ্ডিত শিউ গোলাম তেওয়ারী, কণ্ট্রাক্টর ও জমিদার, এবং আরও কতকগুলি ভদ্রলোক।

চক্রধরপুরে সেটেলমেণ্ট বিভাগে চাকরী করিবার পর আমাকে কয়েক মাসের জন্য সাধারণ বিভাগে খুলনা জেলার সদরে বদলী করা হইয়াছিল। আবার চক্রধরপুরে আসিতে হইবে এইজন্য পরিবারবর্গকে চক্রধরপুরেই রাখিয়া গিয়াছিলাম। চাকরীর চেষ্টায় শ্যালক পরেশ নাথ মাতা ও পত্নীসহ এবং পিতৃব্য-পুত্র শচীপতি এবং তৎপত্নীও আসিয়া আমাদের নিকটেই ছিলেন। ইহা ব্যতীত চাকর, বামুন, চাকরাণীও অনেকগুলি ছিল। বেতন এলাউয়েন্স, বার বরদারি প্রভৃতিতে অনেকগুলি টাকা পাইতে-ছিলাম ; জিনিষ পত্রও বেশ সুলভ ছিল, কাজেই এতগুলি লোক বাসায় থাকা সত্ত্বেও বেশ স্বচ্ছলরূপে চলিয়া যাইতেছিল। আমি চেষ্টা করিয়া শ্যালককে রেলওয়ের মধ্যে একটি কেরাণীগিরি জুটাইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু শচীপতির কোন উপায়ই করিতে পারি নাই। আমি খুলনা যাইবার কিছুদিন পরে পত্নী, কন্যাকে ও শচীপতির পরিবারকে লইয়া দিগনগরে গিয়াছিলেন। আমার চক্রধরপুর প্রত্যাবর্ত্তনের পরেই পুনরায় সেখানে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

খুলনা সহরটী সে সময় খুব বড় ছিল না। সহরের দুইদিকে দুইটী নদী ; এই উভয় নদীর সঙ্গমে একটী বিস্তীর্ণ ত্রিভুজের উপর নগরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেখিতে বেশ সুন্দর, খাদ্য দ্রব্যও অনেকটা সুলভ, বিশেষতঃ নানাজাতীয় মৎস্য। প্রথমে কয়েক দিন বাবু যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের বাসায় থাকিয়া, পরে একটী পৃথক বাসা লইয়াছিলাম। ১৯০১ সালের ৮ই জুন হইতে ২২শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত খুলনায় ছিলাম। অন্যান্য কাজের সঙ্গে আবগারী, ইনকম-ট্যাক্স এবং চৌকিদারী সংক্রান্ত কাজের ভার আমাকে দেওয়ায় সর্ব্বদাই নৌকাযোগে মফঃস্বলে পরিভ্রমণ করিতে হইত। স্থানগুলি (সাতক্ষীরা সব-ডিভিসন ব্যতীত) বেশ স্বাস্থ্যকর, প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর ; সমাজটীও বেশ সুন্দর। জেলার কর্ত্তা মিঃ এইচ, ডব্লিউ স্ক্রুপ আই, সি, এস (Mr. H. W. Scroope. I. C. S) অতি ভদ্রলোক এবং আমার কাজকর্ম্মে প্রথম হইতেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সহরে অবস্থিতি করিবার সময় খুলনার তদানীন্তন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কান্তিভূষণ সেন, তারাপ্রসন্ন আচার্য্য, দুর্গানন্দ দাস, রাজেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, ডাক্তার গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিভিল মেডিক্যাল অফিসার, শ্রীনাথ গুপ্ত, অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বাবু যদুনাথ ঘোষ ও নন্দলাল কুণ্ডু, সবজজ বাবু শশীভূষণ সেন এবং রাজেন্দ্র নাথ রায়, মুন্সেফ (রাজেন্দ্র নাথ পরে ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজের পদে উঠিয়াছিলেন), রাম যাদব মৈত্রেয়, স্পেশ্যাল সব-রেজিষ্টার, সব-ডেপুটী কালেক্টর ভুবন

মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীবর্গের সহিত নানাবিধ নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে সন্ধ্যাকালটা অতিবাহিত হইত। যখন মফঃস্বলে বাহির হইতাম, সেই সময় বাগেরহাটের সব-ডিভিসনাল অফিসার বাবু কালিদাস মুখোপাধ্যায় এবং সাতক্ষীরা সব-ডিভিসনাল অফিসার বাবু রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়দিগের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইত। কালিদাস বাবু পূর্ব্বে পুলিসের সব-ইন্‌সপেক্টার ছিলেন। দেখিলাম, এখন গৈরিক বস্ত্র পরিধান, পায়ে খড়ম এবং গলায় ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের মালা; সন্ধ্যা-আহ্নিকেই অনেকটা সময় অতিবাহিত করেন। আমাকে এক-বেলা আহারের নিমন্ত্রণ করেন। আহারের আয়োজন একেবারে আড়ম্বরশূন্য; মিহি চাউলের ভাত, কতকগুলি উচ্ছে ভাজা, বড় বড় খলিসা মাছের একটা ঝোল, রুই মাছের ঝোল (অন্য প্রণালীতে প্রস্তুত), দুগ্ধ এবং বাতাসা। সব-ডেপুটী কালেক্টর সেদিন রাত্রিকালে পোলাও, কালিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া স্থানীয় কয়েকটী ভদ্রলোককে এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সাতক্ষীরা পরিদর্শন সময়ে সব-ডিভিসনাল অফিসার রাজেন্দ্র বাবু এই শেষোক্ত প্রণালীতে আমাকে এবং মুন্সেফ, সব-ডেপুটী, ডাক্তার প্রভৃতি কয়েকজনকে আহারাদি করাইয়াছিলেন। রাজেন্দ্র বাবু পূর্ব্বে কলিকাতায় শিক্ষা বিভাগের প্রফেসার ছিলেন; সেই সময় আমার কনিষ্ঠ সহোদর রাজেন্দ্র এবং পিতৃব্য-পুত্র ভূপতি কিছুদিন ইঁহার ছাত্র ছিল। ইনি অতি সদাশয়, ধীর ও শান্ত-প্রকৃতির লোক ছিলেন।

সাতক্ষীরা হইতে ফিরিবার সময় আবগারী দোকান দেখিবার জন্য খালিসাখালি নামক একটী প্রসিদ্ধ গ্রামে একরাত্রি নৌকায় বাস করিয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম, এই গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী বিল হইতে বড় বড় মাগুর, বড় বড় কই এবং কই মাছের ন্যায় খলিসা মাছ প্রচুর পরিমাণে ধরা হয়। মাগুর, কই গোটাকতক সংগ্রহ হইল। ঐ মৎস্যের তিন চারি রকম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার আদেশ দিয়া স্থানীয় দুই একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে নানাবিধ বিষয়ে আলোচনার সময় নিম্নলিখিত গল্পটী শুনিয়াছিলাম।

নবদ্বীপের একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কোন সময় এই অঞ্চলে বার্ষিক আদায় করিতে আসিয়া একটী মুদীর দোকানে একরাত্রি বাস করিয়াছিলেন। শয়নের জন্য ব্রাহ্মণকে দেওয়া হইয়াছিল কাঁচা নলখাগ্‌ড়া নির্ম্মিত একখানি দর্‌মা বা চাটাই। সমগ্র রাত্রি মশা, ভেক এবং ইন্দুরের উপদ্রবে ব্রাহ্মণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ আরও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে মুদী নিজে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা, যকৃত প্রভৃতি রোগে প্রায় শয্যাগত এবং তৎপত্নীই দোকানের কেনা বেচা এবং গৃহস্থলীর কাজ প্রভৃতি সমস্তই নির্ব্বাহ করিতেছে। মুদীর সন্তানাদি কি, এই কথা ব্রাহ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়, মুদী কপালে করাঘাত পূর্ব্বক বলিয়াছিল, "ঠাকুর! সে কপাল কি আমার; বার মাসই ঘুষঘুষে জ্বর, পেটপোরা পিলে লইয়াই পড়িয়া আছি, তা ছেলে হবে কি করে?" খালিসাখালির তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া ব্রাহ্মণ নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলেন :—

"নব নল নির্ম্মিত দরমা শয্যা।
ভর্ত্তরি জীবতি, বিধবা ভার্য্যা॥
ভেক মুষিক, মশক ব্যালি।
বিধিনা রচিতা খালিসাখালি॥"

খুলনা জেলাটী সর্ব্ববিষয়ে আমার মনোমত থাকায় সেখানে কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সেটেলমেণ্টের কাজে পুনরায় চক্রধরপুর যাইতে হইবে, পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল। কাজেই ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে চক্রধরপুরে উপস্থিত হইয়া ১লা অক্টোবর তারিখে কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম। পরিবারবর্গও দিগনগর হইতে চক্রধরপুর আসিলেন। এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে রাধিকা প্রসাদের কন্যা বিভাবতীর মৃত্যু হয়। মেয়েটী আমাদের বড়ই প্রিয় ছিল। তাহার অকাল মৃত্যুতে পরিবারস্থ সকলেই দুঃখিত হইয়াছিলেন। এ যাত্রায় চক্রধরপুরে সাতমাস কাজ করিয়া, তাহার পর দিনাজপুর জেলায় সদরে বদলী হইয়াছিলাম। ইহার দুই মাস পূর্ব্বে শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণী এই চক্রধরপুরেই পরলোকগমন করেন। তখন আয়ের পরিমাণ কিছু বেশী থাকায়, তাঁহার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ, সজ্জন, এবং আমাদের সেটেলমেণ্ট সংক্রান্ত সমস্ত লোকজনকে বেশ একটু খরচ পত্র করিয়া ভোজ দেওয়া হইয়াছিল। আমি চিরদিনই অমিতব্যয়ী ছিলাম ; পেন্সান লইবার পরও এই অভ্যাস দূর হয় নাই। বিষয় বুদ্ধি কোনকালেই ছিল না। কাজেই এতদিন চাকরী করিয়াও কোন একটা স্থায়ী আয়ের বন্দোবস্ত করিতে পারি নাই। সময়

সময় দেনাও করিতে হইয়াছে। নিজের অপরিণামদর্শিতার জন্য অনেক সময় অনুতাপ করিয়াছি। অর্থাভাবে অনেক সময় বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। তথাপি কুঅভ্যাস দূর হয় নাই। এটা বোধ হয় পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের ফল। এ জীবনে অর্থ সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি কেন হইল না, অনেক ভাবিয়াও ইহার একটা সন্তোষ-জনক মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারি নাই।

এ যাত্রায় চক্রধরপুরে সাতমাস কাজ করিয়াছিলাম। তাহার পরেই আমাকে দিনাজপুরে বদলী করা হয়। জামাতা সুরেন্দ্র কুমার পুলিসে সব-ইন্‌সপেক্টারী চাকরী পাইয়া খুলনা জেলার সদরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কন্যা নীলনলিনীকে তাঁহার নিকট খুলনায় পাঠান হইয়াছিল। মিং এ, গ্যারেট (Mr. A Garret I. C. S.) ছিলেন সে সময় দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন অতুল চন্দ্র দত্ত (পরে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন)। মানস রঞ্জন সেন (সাধক রাম প্রসাদ সেনের বংশোদ্ভব), অক্ষয় কুমার সেন, মৌলবী আক্রাম হোসেন এবং পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার, নবীন চন্দ্র দাস ও দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, অপূর্ব্ব কৃষ্ণ ঘোষ ও লাল সিং ছিলেন মুন্সেফ, ডাক্তার মহেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী ছিলেন সিভিল মেডিক্যাল অফিসার; পরে একজন সাহেব সিভিল সার্জ্জেন আসিয়াছিলেন, নামটী ভুলিয়া গিয়াছি। পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু কালীপ্রসন্ন দত্ত পুলিস ইন্‌সপেক্টার ছিলেন। শান্তিপুর নিবাসী শরৎ চন্দ্র রায় এবং জ্যোতিন্দ্র নাথ রায় ছিলেন কোর্ট অব

ওয়ার্ডের ম্যানেজার। ইঁহারা ব্যতীত প্রসিদ্ধ জমিদার মহারাজা গিরিজা নাথ রায়, ও রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায় এবং স্থানীয় অনেকগুলি উকীল মহাশয়দিগের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। রায় সাহেব রাধা গোবিন্দ রায় একজন পরম বৈষ্ণব, স্বধর্ম্মনিরত, দয়াল প্রকৃতির লোক। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও অহঙ্কার, মাৎসর্য্যের লেশ মাত্র ছিল না। চালচলন একেবারেই আড়ম্বরশূন্য ছিল। এরূপ মহান্ প্রকৃতির লোক আজকাল অতি বিরল। মহারাজা গিরিজা নাথ রায় বাহাদুরও অতি সদাশয় ও অমায়িক লোক ছিলেন। দিনাজপুরে যাইয়াই শুনিলাম কন্যা অন্তঃস্বত্তা হইয়াছেন। প্রথম পোয়াতিকে বাপ মায়ের নিকট রাখাই হইতেছে চিরপ্রচলিত প্রথা। সেইজন্য কয়েকদিনের বিদায় লইয়া প্রথমে খুলনায় যাইয়া কন্যাকে সঙ্গে করিয়া চক্রধর-পুরে রাখিয়া আসিয়াছিলাম এবং তাহার কিছুদিন পরেই (১৯০২ ১৩ই ডিসেম্বর) সমস্ত পরিবারবর্গকে দিনাজপুরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

দিনাজপুরে উৎকৃষ্ট চাউল, খুব বড় চিতোল মাছ এবং সমস্ত মাছই, পাহাড়িয়া আলু এবং নানাবিধ তরিতরকারী প্রচুর পরিমাণ এবং সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইত। নানাজাতীয় আম, প্রায় সমস্তই মিষ্ট। টক আম সেখানে দেখি নাই, খুব বড় বড় সুমিষ্ট লিচুও পাইতাম। আসিবার পূর্ব্বে দিনাজপুর হইতে প্রায় অর্দ্ধ-মণ মিষ্ট আমসত্ত্ব প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলাম। এই জেলায় মুসলমান রাজত্বের সময় নানাস্থানে সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর ছিল এবং

হিন্দু রাজত্বের সময় যেসকল বৃহৎ দীঘি খনন করা হইয়াছিল, এখন পর্য্যন্ত তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। নানাবিধ কারুকার্য্যখোদিত কাল পাথরের থাম, গেট প্রভৃতি অনেক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। মহারাজা গিরিজা নাথ তাঁহার জমিদারীর মধ্যে একস্থানে একটী কাল পাথরের গেট সম্পূর্ণ অবস্থায় পাইয়া তাহা রাজবাটীতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮৯৭ সালের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে এই নগরের এবং জেলার অভ্যন্তর ভাগের অনেক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। কোন কোন স্থানে খাল, বিল ভরাট হইয়া গিয়াছিল। আবার কোথাও বা নূতন খাল, বিল ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত্ত এবং বালুকা স্তুপের সৃষ্টি হইয়াছিল। মহারাজের প্রাসাদেরও অনেক ক্ষতি হইয়াছিল।

মহারাজ গিরিজা নাথ আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন এবং সেই উপলক্ষে রাজভোগের আয়োজন ত হইতই, ইহা ব্যতীত গান, বাজনার মজলিস বসিত। মহারাজ সঙ্গীতজ্ঞ না হইলেও, সঙ্গীত বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং নিজে বেশ সমজদার, অর্থাৎ রাগ রাগিণী, তাল মান বেশ বুঝিতেন। দুই চারিজন ওস্তাদ প্রায়ই রাজবাটীতে অনেক সময় থাকিতেন। বন্ধুবর সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার আমাদের বাঙ্গালীর মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ গায়ক বলিয়া উত্তরকালে পরিচিত হইয়াছিলেন। এমন কি সে সময়েও তিনি একজন উচ্চদরের গায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। রাজবাটীর এক মজলিসে সুরেন্দ্র নাথের

গান শুনিয়া ওস্তাদজীরা বলিয়াছিলেন, "হুজুর লেড়কা আদ্‌মি ভারি ভারি এন্তেহাম পাশ কিয়া, হাকিম হুয়া, ওস্তাদ বি বন্‌ গিয়া।" অবশ্য ওস্তাদের সেই আদব কায়দা পূর্ণ বিশুদ্ধ হিন্দি কথাগুলি আমার মনে নাই। আমার নিজের হিন্দিতেই ওস্তাদজীদের মন্তব্য এখানে লিপিবদ্ধ করা হইল।

তারপর আবার নিজ সংসারের কথা আরম্ভ করিতেছি। কন্যা নীলনলিনী খুলনা হইতেই সামান্য ঘুষঘুষে জ্বর এবং পেটের পীড়া লইয়া আসিয়াছিলেন। দিনাজপুরে আসিবার পর হইতে রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৯০৩ সালের ৪টা জানুয়ারী তারিখে একটী পুত্র প্রসব করিয়া যে শয্যাশায়িনী হইলেন, সে শয্যা হইতে আর উঠিতে হয় নাই। সন্তান প্রসবের একুশ দিন পরে ঊনবিংশতি বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া নানাবিধ চিকিৎসা করাইয়াও কোন ফল হইল না। নীলনলিনীর ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মেধাবিনী ও সুচতুরা বালিকা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যাইত না। বাঙ্গালায় অনর্গল কবিতা লিখিতে পারিতেন। কতকগুলি কবিতা "বালুকণা" নাম দিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিতও করা হইয়াছিল। সঙ্গীত বিষয়ে আমার যে সামান্য জ্ঞান ছিল, তাহা আয়ত্ত করিয়া উপরেও উঠিয়াছিলেন। শিল্প কার্য্য, নানাবিধ রন্ধনাদি প্রণালী প্রভৃতিও বেশ শিখিয়াছিলেন। চাইবাসায় অবস্থিতিকালে আমি হোমিও-প্যাথি চিকিৎসা করিতাম; নীলনলিনী সে সময় আমার একজন কম্পাউণ্ডারস্বরূপ থাকায় তিনিও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

অনেকটা শিখিয়াছিলেন। আবার রোগীর সেবায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিতেন। দোষের মধ্যে ছিল অত্যধিক অভিমান, এবং স্বামীর সহিত সর্ব্বদাই তর্ক বিতর্ক এবং বাদানুবাদ। যে দোষই থাকুক, এরূপ সর্ব্বগুণান্বিতা কন্যা হারাইয়া আমরা একেবারে শোক সন্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কন্যার পীড়ার সময় জামাতা কয়েক দিনের বিদায় লইয়া দিনাজপুরে আসিয়াছিলেন এবং অকাতর পরিশ্রমে পত্নীর সেবা করিয়াছিলেন। মুন্সেফ বাবু লাল সিং এবং দুর্গানাথ মুখোপাধ্যায় কন্যার পীড়ার সময় প্রকৃত আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। কন্যার মৃত্যুর পর হেমাঙ্গিনীর মনের অবস্থা কথঞ্চিৎ ভাল করিবার অভিপ্রায়ে লাল সিং আপন ভগ্নী ও পুত্রকে সঙ্গে দিয়া প্রায় একমাস কাল তাঁহাকে নানা তীর্থে ভ্রমণ করাইয়া আনিয়াছিলেন। সেই সময় আবগারি ও ইনকম-ট্যাক্সের ভার হাতে থাকায় পত্নী ও পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া অনেক সময় আমি নিজেও মফঃস্বলে কাটাইয়া আসিতাম। এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইবার পর ছয় মাসের বিদায় লইয়া প্রথমে কিছুদিন দিগনগর এবং তাহার পর চক্রধরপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলাম।

আমার খুলনা জেলায় বদলী হইবার সময় আমাদের জন্য একটি বাংলো ধরণের বাসোপযুক্ত ঘর নির্ম্মাণ করিবার জন্য চক্রধরপুরে তের কাঠা জমি বন্দোবস্ত লইয়া করালী বাবুর হাতে কয়েক শত টাকা দিয়া গিয়াছিলাম। তিনিও সেইরূপ একটি বাংলো তাঁহার এবং রজনী বাবুর বাড়ীর নিকটেই প্রস্তুত করাইয়া

রাখিয়াছিলেন দেখিলাম। করালী বাবু তাঁহার মনিবের কাজে এবং নিজের কাজে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকায়, পরিদর্শন অভাবে এবং অন্যান্য কারণে বাড়ীটী কোনরূপে বাসোপযুক্ত হইলেও একেবারেই মজবুত হয় নাই। যাহা হউক, সেই বাসাটীতেই উঠিয়া কয়েক মাস বাস করিয়াছিলাম। চাকরদের থাকিবার জন্য একখানি ছোট গৃহও প্রস্তুত করিয়াছিলাম। পণ্ডিত শিউগোলাম একটী পাকা কূয়া প্রস্তুতের জন্য বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। বাসা বাড়ীটীর কতকটা সৌষ্ঠব সাধিত হইলে, নিকটবর্ত্তী স্থানে যাতায়াতের সুবিধার জন্য কয়েকটী রাস্তা প্রস্তুত করা, সাধারণের ব্যয়ে শ্রীশ্রী৺কালী মাতার সাম্বৎসরিক পূজা এবং তদানুসঙ্গিক যাত্রা গান, নাচ তামাসা প্রভৃতির আয়োজন ও অন্যান্য কাজে ছয়টা মাস বেশ একরূপ কাটিয়া গিয়াছিল। বিদায় শেষ হইবার পূর্ব্বে একবার কিছুদিন কলিকাতায় যাইয়া একটা স্বাস্থ্যকর স্থানে বদলী হইবার জন্য বেঙ্গল অফিস এপয়ণ্টমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের হেড আসিষ্ট্যাণ্ট জ্ঞান চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে বিশেষ অনুরোধ করায়, তিনি একটু চেষ্টা করিয়া আমাকে মানভূম জেলার সদর ষ্টেশন পুরুলিয়ায় বদলী করাইয়াছিলেন। অতঃপর চক্রধরপুরের কতকটা নিকটবর্ত্তী একটী সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থান পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল এবং সেইজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া অসংখ্য প্রণিপাত করিয়া-ছিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্তান শোক, মনস্তাপ, অর্থনাশ প্রভৃতি একত্রিত হইয়া শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এই সময়ে যেরূপ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। পিতৃব্যদেবের মধ্যম পুত্র শ্রীপতি তখন পুরুলিয়ায় পুলিশের সব-ইন্‌সপেক্টার পদে নিযুক্ত ছিল। পুরুলিয়ায় বদ্‌লী হওয়ার সংবাদ তাহাকে জানাইয়া, একটী বাসা ভাড়া করিবার জন্য লিখিয়া দিলাম। বাসা স্থির হওয়ার সংবাদ পাইবা মাত্র পাচক ব্রাহ্মণ ও চাকর দুই একটী সঙ্গে লইয়া পুরুলিয়ায় যাত্রা করিলাম। পরিবারবর্গকে আপাততঃ চক্রধর-পুরেই রাখিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু পুরুলিয়ায় যাইয়াই জ্বরে শয্যাগত হওয়ায় পরিবারবর্গকেও সেখানে লইয়া গিয়াছিলাম। আমার সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভের পর পরিবারবর্গ কিছুদিনের জন্য দেশে গিয়াছিলেন। তাহার পরেই এই পল্লীতে কলেরার প্রাদুর্ভাব হওয়ায়, নগরের অন্য প্রান্তে নডিহা নামক পল্লীতে উঠিয়া গিয়াছিলাম। কিছুদিন এই বাটীতে থাকিবার পর, আর একটী ভাল বাড়ী পাইয়া সেইখানেই বাসা স্থির করা হইল। পরিবার-বর্গও এই সময় দেশ হইতে পুরুলিয়ায় আসিলেন। সেই সঙ্গে পিতৃব্যপত্নী, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শচীপতির স্ত্রী, তাহাদের শিশু পুত্র দুইটী সহ এবং আমার কনিষ্ঠা শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণী বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পুরুলিয়ায় আসিয়াছিলেন। শ্রীপতির এবং

আমার এই উভয় বাসাতেই এতগুলি পরিবার সঙ্কুলান হইবে না বলিয়া, আমার বাসার কতকটা নিকটে তাঁহাদের জন্য একটী বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। পুরুলিয়ায় যে বাড়ীতে শেষ পর্য্যন্ত ছিলাম পূর্ব্বে সেটী পাতকুমের রাজা বাহাদুর সময় সময় সহরে আসিয়া থাকিবার জন্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পরে বাবু কৃষ্ণকিশোর অধিকারী মহাশয় ক্রয় করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকিশোর বাবুর পৈতৃক নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদি মহকুমায়। পূর্ব্বে ইনি শিক্ষা বিভাগের ডেপুটী ইন্‌সপেক্টার ছিলেন। চাকরী পরিত্যাগ করিয়া কয়লার খনি লইয়াছিলেন। এই কয়লার কাজেই অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের মধ্যেই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, কয়লা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (Expert) হইয়াছিলেন। দেখিয়াছি, কোন কোন সময় কয়লা সংক্রান্ত জটিল বিষয়ের মীমাংসার জন্য তাঁহাকে পাঁচ শত, ছয় শত টাকা ফি দিয়াও কলিকাতায় লইয়া গিয়াছে। ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী একটী বড় হাঁসপাতালের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত আছেন। কনিষ্ঠ সহোদর গোপেশ চন্দ্র অধিকারী পুরুলিয়ায় প্রথমে ওকালতী করিতেন। পরে ওকালতী পরিত্যাগ করিয়া অনেকদিন বিশেষ যোগ্যতার সহিত অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি (১৯২৯ জুন) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং সরাসরি (Summary) বিচারের ক্ষমতা পুনরায় তিন বৎসরের জন্য পাইয়াছেন। রায় বাহাদুর উপাধিও লাভ করিয়াছেন।

কৃষ্ণকিশোর বাবু নিঃসন্তান। গোপেশ বাবুর অনেকগুলি পুত্র কন্যা। তাহাদের লইয়াই কৃষ্ণকিশোর বাবুর সংসার। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও কৃষ্ণকিশোর বাবু ও গোপেশ বাবুর অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না। একেবারে মাটির মানুষ। পরোপকারের সুযোগ উপস্থিত হইলে তাঁহাদের কতই আনন্দ হইত। আমাদের বাসাবাটী তাঁহাদের বাটীর সংলগ্ন থাকায় দুই পরিবারের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। পুরুলিয়া পরিত্যাগের পরও অনেকবার তাঁহাদের অতিথি হইয়াছি। পেন্সন লইয়াও দুই তিনবার গিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহাদের সেই অকৃত্রিম সরল ব্যবহারের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এমন কি সেদিনও (১৯২৯ ফেব্রুয়ারী) আমার জ্যেষ্ঠ নাতির বিবাহে মৎস্য, মিষ্টান্ন এবং বস্ত্রাদি সহ লোক পাঠাইয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

সে সময় মিঃ জন ল্যাং (Mr. John Lang) ছিলেন মানভূমের ডেপুটী কমিশনার। কয়েক বৎসর পরে যখন প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় তাঁহার এক নিঃসন্তান পিতৃষ্বসা মৃত্যুকালে তাঁহাকেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছিলেন। সেই সূত্রে মিঃ ল্যাং পিসিমার বিলাতে সুন্দর সুসজ্জিত প্রাসাদ, ভূসম্পত্তি, বাগবাগিচা ব্যতীত অষ্ট্রেলিয়ায় বার্ষিক ছয় সাত লক্ষ টাকা আয়ের স্বর্ণখনির অংশ পাইয়া চাকরী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে ভাগ্য। পুরুলিয়ায় অবস্থিতি সময়ে অনেকগুলি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইয়াছিল; তাহার মধ্যে নিম্ন-

লিখিত ব্যক্তিগণের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ—আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন ডাক্তার কালীমোহন সেন, আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন ডাক্তার যামিনী কান্ত মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার ভোলানাথ গাঙ্গুলী, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট চূণিলাল রায় (পরে রায় বাহাদুর উপাধি সহ আবগারী ডেপুটী কমিশনার হইয়াছিলেন), মৌলবী আবদুল সমদ, কুঞ্জ বিহারী চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার বসু (কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ মনোমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষের ভাগিনেয়) পরে রায় বাহাদুর 3 0. B. E. উপাধি সহ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। নন্দ-কিশোর ত্রিপাটী, মুন্সেফ অমূল্য চন্দ্র ঘোষ, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার রায় বাহাদুর নন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল নন্দলাল ঘোষ (সকলেই বলিত নন্দ বি, এল), রাম চরণ সিংহ, শরৎ চন্দ্র সেন, ললিত মোহন মিত্র ও তৎসহোদর যুগল কিশোর মিত্র, কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার রাখাল দাস সরকার, সেরেস্তাদার প্রাণকৃষ্ণ রায়, কোর্ট সব-ইনস্পেক্টার কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোক্তার সুরেশ চন্দ্র মিত্র। ইঁহারা ব্যতীত আরও অনেক উকীল, মোক্তার শিক্ষক ও ডাক্তার এবংস্থানীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগের সঙ্গেও পরিচয় হইয়াছিল। পুরুলিয়ায় প্রায় আড়াই বৎসর ছিলাম; সে সমটা খুব আনন্দে কাটিয়াছিল। এই সময় (১৯০৫ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী) প্রমথ নাথের প্রথম পুত্র প্রভাত নাথ জন্মগ্রহণ করে। একে ত চিরদিনের অমিতব্যয়ী, তাহার উপর এই প্রথমে পৌত্র মুখ দেখিয়া আনন্দে তাহার অন্নপ্রাশনের সময় অবস্থার

অধিক ব্যয় করিয়াছিলাম। এমন কি তিনি গর্ভাবস্থায় বধূমাতার "সাধ" উপলক্ষেও প্রায় তিন চারিশত টাকা ব্যয় করিয়া মহিলা-বর্গকে ভোজ দেওয়া হইয়াছিল। জানি না এই অকারণ অর্থ ব্যয় আড়ম্বরপ্রিয়তার অথবা মানসিক দৌর্ব্বল্যের ফল, অথবা অপরিণামদর্শিতার ফল।

মিঃ ল্যাং আমার কাজ কর্ম্মে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। অনেক সিনিয়র ও গ্রাজুয়েট ডেপুটী কালেক্টর থাকিতেও আমাকে অনেক গুরুতর ও দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতেন। উদাহরণস্বরূপ, ভূমি রেজিষ্টারীকরণ সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ এবং কেরাণীশ্রেণীর বেতন হ্রাস বৃদ্ধির সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ (Reconstitution of the ministerial officer's salaries)। আমার পুরুলিয়া অবস্থিতি সময়ে ইনি আবগারী বিভাগের ডেপুটী কালেক্টর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাহার কিছুদিন পরেই আমাকে আবগারী বিভাগের স্পেশাল ডেপুটী কালেক্টর পদে নিযুক্ত করাইয়া মেদিনীপুরে লইয়া গিয়াছিলেন। ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনী-পুরে যাইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করার প্রায় এক সপ্তাহ পরে পরিবারবর্গকে পুরুলিয়া হইতে মেদিনীপুর আনা হইয়াছিল। এস্থলে ইহাও লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন যে ঐ এক সপ্তাহকাল আমার পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু বর্দ্ধমাননিবাসী বাবু ক্ষেত্র মোহন মিত্র, সবজজ মহাশয়ের দুই পুত্র রমণী মোহন ও যামিনী মোহন আমাকে তাঁহাদের বাসায় পরম যত্ন ও সমাদরের সহিত রাখিয়া-

ছিলেন। উভয়েই সেই সময় মেদিনীপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত ছিলেন। উভয়েই বিদ্বান, সচ্চরিত্র এবং কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহারা অনেকটা সাহেবী ধরণে থাকিতেন। সাহেব মহলেও ইঁহাদের যথেষ্ট খাতির ও প্রতিপত্তি ছিল। এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ লইয়া তুমুল 'স্বদেশী" ও ও "রাজনৈতিক" আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা গভর্ণমেন্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারী এবং রাজভক্ত প্রজা, সুতরাং ঐ সকল আন্দোলন হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকিতাম। মেদিনীপুর আমার পূর্ব্ব পরিচিত স্থান, পুরাতন বন্ধু তখন অনেকেই বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (আমার সতীর্থ ও বাল্যবন্ধু), কালেক্টরীর সেরেস্তাদার, ডাক্তার ভুবনেশ্বর মিত্র, বাবু কৃষ্ণকিশোর আচার্য্য, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সেক্রেটারী, সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ ক্ষিরোদ বিহারী দত্ত, তৎসহোদর বাবু অটল বিহারী দত্ত, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কালেক্টর বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, কালেক্টরীর খাজাঞ্জি বাবু অশ্বিনী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল বাবু অর্পণা চরণ দত্ত, কেদার নাথ মিত্র, রামদিন ভট্টাচার্য্য, মহেন্দ্র নাথ দাস, চৌধুরী যামিনী নাথ মল্লিক প্রভৃতি কয়েকজনের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিঃ ডি, ওয়েষ্টন (Mr. D. Weston I. C. S.) ছিলেন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রমণী মোহন ও যামিনীমোহন ব্যতীত আরও কয়েকজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে রায় বাহাদুর রাম সদয় মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী সুপারি-

ণ্টেডেণ্টের পুত্র সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইনি পরে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। প্রমথ নাথের বাল্যবন্ধু মিঃ বীরেন্দ্র নাথ সাসমল এই সময় মেদিনীপুরে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (ভূপতির বিশেষ বন্ধু) শ্রীশ চন্দ্র ঘোষের সহোদর ডাক্তার বঙ্কিম চন্দ্র ঘোষ এই সময় মেদিনীপুরে স্বাধীনভাবে ডাক্তারী ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। পুলিশের ইন্‌সপেক্টার বাবু লালমোহন গুহ মহাশয় এবং আরও অনেকগুলি পুলিশ কর্ম্মচারীর সহিতও বিশেষ আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। মিঃ ওয়েষ্টন আমার কাজ কর্ম্মে বেশ সন্তুষ্টই ছিলেন। সর্ব্বদাই গান বাজনা এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদে দিনগুলি বেশ কাটিতে লাগিল। এই সময় মিঃ ল্যাং বিদায় লওয়ায় পূর্ব্ববর্ত্তী আবগারী কমিশনার মিঃ গিক (Mr. E. Geak I. C. S) পুনরায় আবগারী কমিশনার হইয়া আসিলেন এবং ছয় মাসের মধ্যেই আমাকে কটকে বদলী করাইয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র রমাপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার স্থানে আনাইয়াছিলেন।

আবগারী বিভাগের ডেপুটী কালেক্টর হইয়া পরিদর্শন উপলক্ষে আমাকে মধ্যে মধ্যে আমার পূর্ব্বপরিচিত স্থান তমলুক, কাঁথি এবং ঘাটাল সবডিভিসনে যাইতে হইত। কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল বাবু যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র বাবু রাখালদাস চট্টো-পাধ্যায় সেই সময় তমলুকের সব-ডিভিসনাল অফিসার ছিলেন।

পরিদর্শন উপলক্ষে তমলুকে যাইয়া ইঁহার সহিত প্রথম পরিচয় হয়। প্রথম পরিচয়েই বুঝিলাম, লোকটি বড়ই অহঙ্কারী। আমি পূর্ব্বে সব-ডেপুটী ছিলাম, এই ভয়ঙ্কর অপরাধেই বোধ হয় আমার সহিত ভাল করিয়া কথাই কহিলেন না। অধিকন্তু ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মহাশয়, তমলুকের সব-ডিভিসনাল অফিসার হইয়া আসার কি হইল?" কথাটার মর্ম্ম হঠাৎ বুঝিতে পারি নাই। পরে মনে হইল, সব-ডেপুটী পদে তমলুকে অবস্থিতি সময়ে, সেই সময়ের সবডিভিসনাল অফিসার নন্দলাল বাগচি কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে অপদস্থ হইয়া কোন কোন বন্ধুবান্ধবের নিকট বলিয়াছিলাম যে, যদি কখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পারি তাহা হইলে একবার তমলুকের সবডিভিসসনাল অফিসার হইয়া আসিবার ইচ্ছা রহিল। সেই কথা রাখাল বাবুর কর্ণগোচর হইয়াছিল। চির-প্রচলিত প্রথানুসারে বাঙ্গালী বা ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসী সবডিভিসনাল অফিসার থাকিলে, সদর হইতে বা অন্যস্থান হইতে সমাগত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সবডিভিসনে কার্য্যোপলক্ষে আসিলে সবডিভিসনাল অফিসার তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া নিজ বাংলোয় আহারাদি করাইয়া থাকেন। আমি তমলুক পরিদর্শনে যাইবার পূর্ব্বে রাখাল বাবুকে পত্র লেখা সত্ত্বেও তিনি আমার জন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত না করিয়াই মফঃস্বলে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। পরদিন সহরে ফিরিয়া আসিয়া প্রথম সাক্ষাতেই আমার সঙ্গে যেরূপ আলাপ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ

করা হইয়াছে। আমি কোথায় উঠিয়াছি, আহারাদির কিরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে, এ সকল বিষয় একবার মুখেও আনিলেন না। তমলুক হইতে ঘাটাল সবডিভিসনে উপস্থিত হইলে তথাকার তদানীন্তন সবডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী মহাশয় নিজে ডাক বাংলোয় আসিয়া আমাকে অতি সমাদরে কুঠীতে লইয়া গিয়াছিলেন, আহারাদির সুব্যবস্থার ত কথাই নাই। আবার মেদিনীপুর প্রত্যাগমনের সময় কয়েক সের অতি উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত আমার সঙ্গে দিয়াছিলেন। আমি ঘাটালে থাকিতে থাকিতেই পোষ্ট আফিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত হেমেন্ত কুমার রাহা মহাশয় ঘাটালে উপস্থিত হইলে আমার সহিত প্রথম পরিচয় হয়। তিনি আমাকে ও স্থানীয় আর দুই চারিটী ভদ্রলোককে পরিপাটী ভোজ দিয়াছিলেন। স্থানীয় মুন্সেফ বিজয় গোপাল বসু মহাশয়ও একদিন আমাদিগকে এবং স্থানীয় অনেকগুলি ভদ্র-লোককে ভোজ দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে বিজয় বাবুর পত্নী স্বহস্তে নানাবিধ উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন, সিঙ্গারা প্রভৃতি প্রস্তত করিয়া-ছিলেন। এক দেশবাসী, সমপদস্থ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কত-প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতি ও আচার ব্যবহারই না দেখিতে পাওয়া যায়!

এই স্থলে শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার রাহা মহাশয়ের একটু পরিচয় দিতেছি। ইনি স্বর্গীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ভুবন মোহন রাহা মহাশয়ের মধ্যম পুত্র। ইঁহার জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার রাহা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। অবসর গ্রহণ করিয়া বাঁকুড়ায়

ওকালতি করিতেছেন। ইঁহাদের কনিষ্ঠ শরৎ চন্দ্র রাহা বাঙ্গালার আবগারী কমিশনার (Commissioner of Excise and Salt, Bengal) হইয়াছিলেন, সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। হেমন্ত বাবু এখন বাঙ্গালার পোষ্ট মাষ্টার জেনারল (Post Master General), গভর্ণমেণ্ট হইতে রায় বাহাদুর এবং সি, আই, ই উপাধি পাইয়াছেন। এরূপ ভাগ্যবান পরিবার বাঙ্গালার মধ্যে অল্পই দেখা যায়। কিন্তু এরূপ উচ্চপদ লাভ করিয়াও তাঁহাদের সেই বিনয়নম্র, মিষ্ট স্বভাব এবং অমায়িকতার বিন্দুমাত্রও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই।

এই স্থলে আর একটী হাসির কথা লিখিতে হইতেছে। ঘাটাল হইতে ফিরিবার সময় ষ্টীমারের ডেকে একটি চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছি। এমন সময় বেশ সৌখিন পোষাক পরা, সোজা সিঁথি কাটা একটী যুবক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ব্রাহ্মণ ?" উত্তরে অবশ্যই কহিলাম, "হাঁ আমি ব্রাহ্মণ।" যুবক আর কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়াই পার্শ্ববর্ত্তী আর একখানি বেতের চেয়ার টানিয়া আমার পাশেই বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় কি করেন, কোথা হইতে আসিতেছেন, কোথায় যাইবেন।" উত্তরে পরিচয় দিয়া কহিলাম, "আপাততঃ হেড কোয়ার্টার মেদিনীপুরেই যাইতেছি।" যুবক বেশ একটু মুরুব্বিয়ানা ভাবে কহিলেন, "এ বেনেগিরি চাকরী কেন করিতেছেন, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার কি আশা নাই? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রোয়জন বিবেচনায় কোন উত্তর না

দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয় কি বিষয় কর্ম্ম করেন ?" উত্তর হইল—"I am Court Sub-Inspector of Ghatal, going to Midnapur on duty." অর্থাৎ, "আমি ঘাটালের কোর্ট সব-ইন্‌সপেক্টর, রাজকার্য্যে মেদিনীপুর যাইতেছি।" এই বলিয়াই বেশ সপ্রতিভ ভাবে আমার হাত হইতে গড়গড়ার নলটি টানিয়া লইয়া তামাক খাইতে লাগিলেন এবং কহিলেন, "মহাশয়ের তামাকটি বেশ।" এই ঘটনার বোধ হয় দেড় বা দুই বৎসর পরে যখন আমি তমলুকের সবডিভিসনাল আফিসার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম, সেই সময় একদিন দেখিলাম, পুলিসের ইউনিফরমধারী একটি বাবু ধীরে ধীরে আসিয়া একটু দূর হইতে পুলিস কায়দায় সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন। কি একটা লিখিতেছিলাম, সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্রই দেখিলাম সেই ষ্টীমারের বন্ধুটী। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, তিনি তমলুক সবডিভিসনের একটি থানার ভারপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন। ভদ্রলোক বিশেষ লজ্জিত হইয়াছেন বুঝিয়া, পূর্ব্ব প্রসঙ্গের কোন উল্লেখ না করিয়া অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর তাঁহাকে বিদায় করা হইল।

নানাকারণে মেদিনীপুরে কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা ছিল। মিঃ ওয়েষ্টনকে ধরিয়া কটকের বদলীটা রহিত করিবার চেষ্টাও করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে সপরিবারে কটকে উপস্থিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম। ভূপতি সেই সময় উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনারের পার্শনাল আসিষ্ট্যাণ্ট পদে নিযুক্ত ছিল। প্রথমে দুই একদিন

তাহার বাসায় থাকিয়া পরে একটী সুন্দর দ্বিতলবাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। কটক অতি স্বাস্থ্যকর স্থান, দ্রব্যাদি সুলভ, সমাজ প্রশংসনীয়। জেলার কালেক্টর মিং গ্যারেট (Mr. A. Garrett, I. C. S.) বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। ভূপতি সেখানে রহিয়াছে। বন্ধুবর সুপ্রসিদ্ধ গণিতাধ্যাপক রায় বাহাদুর বিপিন বিহারী গুপ্ত তখন "র‍্যাভেনসা" (Ravenshaw) কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই কাজকর্ম্মে বেশ একটু সুখ্যাতি হইয়াছিল। কিন্তু আবগারী ও ইনকম-ট্যাক্সের কাজ প্রথম হইতেই ভাল লাগিত না। সেইজন্য অব্যবস্থিত অস্থির মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। আবার সাধারণ বিভাগে যাইবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। কাহাকেও কিছু না জানাইয়াই গভর্ণমেণ্টে এবং আবগারী কমিশনার গিক্ সাহেবকে পত্র লিখিলাম। তিনিও তাহাই চাহিতেছিলেন। একজন সাহেব আবগারী ইনসপেক্টারকে ডেপুটী কালেক্টর পদে উঠাইবার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। আমার পত্র পাইয়াই আমাকে পুনরায় মেদিনীপুরে সাধারণ বিভাগে বদ্‌লী করাইয়া সেই সাহেবটীকে (Mr. Taylor) আমার পদে কটকে আনাইয়া-ছিলেন। এই গীক্ সাহেবের অধীনে সব-ডেপুটী অবস্থায় প্রথমে রাণীগঞ্জে, তারপর মেদিনীপুরে, তারপর বর্দ্ধমানে কাজ করিয়াছিলাম। বর্দ্ধমানে থাকিবার সময় কি একটা বিষয় উপলক্ষে আমার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া-ছিলেনঃ—"The Sub-Deputy Collector has worked

under me at Midnapur, Ranigange and here. In each station he worked directly under me and I was extremely satisfied with his work, diligence and despatch." জানিনা, আমি আবগারী ডেপুটী কালেক্টর হইবার পর, তাঁহার পূর্ব্বভাব কেন পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। আশ্রিত, অনুগত কর্ম্মচারীদের প্রতি কৃপাপ্রদর্শনই বোধ হয় তাহার একটা কারণ হইতে পারে।

কটক সহর অনেকেই দেখিয়াছেন। বেশ বড় সহর, একটী ক্যান্টনমেণ্ট (Cantonment) আছে। কমিশনার বাহাদুরের হেড কোয়ার্টারও কটকে; তিনিই আবার উড়িষ্যার অন্তর্গত গড়জাত পলিটীক্যাল ষ্টেটগুলির সুপারিনণ্টেণ্ডেণ্ট থাকায় অন্যান্য বিভাগের কমিশনার অপেক্ষা তাঁহার ক্ষমতাও বেশী ছিল। একজন উড়িয়া ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন আসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিনণ্টেণ্ডেণ্ট। তাঁহারও ক্ষমতা বড় কম ছিল না। শুনিয়াছিলাম এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তিনি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। কটকের উত্তরে বিশালকায়া মহানদী এবং দক্ষিণে কাঠজুড়ী নদী প্রবাহিত থাকায় সহরটীকে বড় সুন্দর দেখাইত, বিশেষতঃ বর্ষাকালে। উড়িষ্যার কোন একজন হিন্দু স্বাধীন রাজা সহরের সম্মুখবর্ত্তী কাঠজুড়ী নদীর তট পাথরের দ্বারা বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন; তাহা এখনও নষ্ট হয় নাই। মুসলমান রাজত্বের নিদর্শনস্বরূপ অনেকগুলি মসজিদ এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। অন্যান্য মিষ্টান্নের মধ্যে কটকে একপ্রকার অতি উৎকৃষ্ট মিঠাই প্রস্তুত হয়।

সেরূপ মতিচুর মিঠাই বাঙ্গালা দেশের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মহিষাদলে এবং গোপীবল্লভপুর ভিন্ন অন্য কোথাও দেখি নাই। আমি যে সময় কটকে ছিলাম সে সময় উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত টাকায় (/১॥০) দেড়সের পাওয়া যাইত। বাঁধ, পুষ্করিণীর মৎস্য ব্যতীত নদীজাত ও নানাজাতীয় সুস্বাদু সামুদ্রিক মৎস্যও আমদানি হইত। মাছ, তরিতরকারীর বাজার সন্ধ্যার পর বসিত; সেই সময়ই প্রয়োজনমত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হইত। কটকে মাত্র ছয় মাস ছিলাম। অনেকগুলি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইলেও কৃষ্ণনগরনিবাসী চণ্ডীচরণ মৈত্রেয় মহাশয়, জজের সেরেস্তাদার এবং একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত একটু ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। মিঃ হেমেন্দ্র লাল খাস্তগীর সে সময় জাজপুরের সবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন। ইঁহার সহিত চাইবাসায় প্রথম পরিচয় হয়। পূর্ণচন্দ্র মৌলিক মহাশর ছিলেন কেঁদরাপাড়ার সবডিভিসনাল অফিসার। সব-ডিভিসনে যাইলে উভয়েই আমাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া আহারাদি করাইতেন। তাঁহারাও সহরে আসিলে আমার বাসাতেই থাকিতেন। কি একটা বন্ধ উপলক্ষে মিঃ হেমেন্দ্র লাল সপরিবারে কটকে আসিয়া আমার বাসায় তিন দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইনি পরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পদে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। মফঃস্বল পরিদর্শন উপলক্ষে বাহির হইয়া প্রায় সমস্ত জেলাটাই প্রদক্ষিণ করিতে হইত। সেই সময় দেখিতাম এমন পাহাড়, এমন উপবন, এমন জঙ্গল এবং এমন গণ্ডগ্রাম নাই

যেখানে ভগবান বিষ্ণুর কোন বা কোন মূর্ত্তির মন্দির ও সেবার বন্দোবস্ত নাই। ভক্ত-শিরোমণি (মতান্তরে অবতার) নদীয়ার চাঁদ শ্রীগৌরাঙ্গ এবং নিত্যানন্দের মূর্ত্তিও কোন কোন স্থানে বিশেষ ভক্তি সহকারে পূজিত হইতে দেখিয়াছিলাম। জগতপতি মহা-প্রভু জগন্নাথ এবং নিমাই নিতাইয়ের আবির্ভাবে উড়িষ্যা যেন দ্বিতীয় বৃন্দাবন বা দ্বিতীয় নবদ্বীপ বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই পরিণত হইয়াছিল। মন্দির ও মঠগুলির গঠন প্রণালী এবং প্রাচীনত্ব দেখিয়াই তাহা সম্যক্ প্রকারে উপলব্ধি হইত। আরও লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে উৎকলবাসীদের ধর্ম্মানুষ্ঠান, পূজাপদ্ধতি, আচার ব্যবহার এবং ভাষাও প্রায় বাঙ্গালার অনুরূপ। কোন সময়ে উৎকলবাসী ও বাঙ্গালীর মধ্যে যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা যে এক অখণ্ড রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহাতে বিন্দু-মাত্র সন্দেহ নাই।

১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে (শীতল ষষ্ঠীর দিন) পুনরায় মেদিনীপুরে উপস্থিত হইলাম। বন্ধুবর অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং পিতৃব্যদেবের বন্ধু পূজ্যপাদ উকীল রামদীন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ণেলগোলা নামক পল্লীতে একটী দ্বিতল পাকা বাড়ী আমাদের জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা মেদিনীপুরে উপস্থিত হইয়া একটু ভালরকম প্রসাদ (মা ষষ্ঠীর) যাহাতে পাই, সেই জন্য অনুকূল চন্দ্র পোলাও, আলুরদম, কপির তরকারী, নানাবিধ ভাজা, আলুবখরার চাট্নি, উৎকৃষ্ট পায়স, মিষ্টান্ন প্রভৃতি পূর্ব্বদিন প্রস্তুত করাইয়া, পরদিন মা ষষ্ঠীর ভোগ দিয়াছিলেন। বোধ হয়,

আমার কল্যাণে দেবীর এই বিশেষরূপ ভোজের আয়োজন হওয়ায় তিনি সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। কারণ আমার আর তখন সন্তান হইবার সম্ভাবনা ছিলনা বলিয়া বোধ হয় মায়ের কৃপাদৃষ্টি পুত্র প্রমথ নাথের উপর পড়িয়াছিল। সেইজন্য ১৯০৫ সাল হইতে ১৯০৮ সালের মধ্যে তাহার আটটি পুত্র এবং পাঁচটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

ছয়মাস পূর্ব্বে দেখিয়া গিয়াছিলাম মেদিনীপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন রমণী, যামিনী দুই ভাই, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রমাপতি চট্টোপাধ্যায় এবং আরও দুইজন, নাম মনে হইতেছে না। আসিয়া দেখিলাম, রমণী, যামিনী রমাপতি স্থানান্তরিত হইয়াছেন। নূতন আসিয়াছেন বন্ধুবর উমেশ চন্দ্র গোস্বামী আবগারী ডেপুটী কালেক্টর, পুরুলিয়ার পরিচিত মৌলবী আবদস্ সমদ, মৌলবী আব্দুল হক, সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, নগেন্দ্র নাথ দত্ত, নরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী এবং সব-ডেপুটী কালেক্টর আশুতোষ দেব। মিঃ ওয়েষ্টন বাহাদুর এবার আমাকে ফৌজদারীকার্য্য ব্যতীত রোডসেস, রিভ্যালুয়েসন তৌজী প্রভৃতি আরও অনেকগুলি কাজের ভার দিয়াছিলেন। সৌভাগ্য-ক্রমে অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমি তাঁহার বিশ্বাসভাজন হইয়া-ছিলাম। আসিষ্ট্যান্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সিনিয়র ডেপুটী কালেক্টর থাকিতেও বাহিরে যাইবার সময় আমার উপর সমস্ত ভার দিয়া যাইতেন। সরকারী সিন্দুকের যে সমস্ত চাবি এবং কাগজপত্র নিজ হস্তে রাখিতে হইত, তাহাও মফঃস্বলে যাইবার সময় আমার

নিকট রাখিয়া যাইতেন। তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনার বাহাদুরের নিকট (রেভিনিউ সংক্রান্ত) আপীল হইলে, তাহার রিপোর্ট ও আমাকে লিখিতে দিতেন। সেরেস্তাদার অনুকূল চন্দ্র এক সময় সাহেবের নিকট প্রস্তাব করেন যে আমি একজন বহুদর্শী রেভিনিউ অফিসার, আমাকে ফৌজদারী কাজ না দিয়া কেবল রেভিনিউ কাজে রাখাই ভাল। তদুত্তরে সাহেব বলিয়াছিলেন,—"He is the best criminal Judge in the District." সাহেব বাহাদুরের আমার প্রতি এই অনুগ্রহ এবং বিশ্বাস অল্পদিনের মধ্যে আমার জীবনে একটা ভয়ঙ্কর অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই সময় "রায় বাহাদুর" উপাধি পাইতে পাইতে পাইলাম না ; তাহাই সম্যক্‌রূপে বিবৃত করিবার জন্য এত কথা লিখিতে হইতেছে। নিজে যে একটা ভারি কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী ইহা জানাইবার জন্য এসকল লেখা হইতেছে না। আমার প্রতি সাহেবের এতটা বিশ্বাস এবং অনুগ্রহ তিনটি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের ঈর্ষার প্রথম কারণ। তারপর সহরের যে কোন ভদ্রলোকের বাটিতে ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে নিমন্ত্রণ হইলে সেখানে যাইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতাম। যুবকদিগের ব্যায়াম শিক্ষার, ডিবেটীং ক্লাব (Debating Club) প্রভৃতি বিষয়ে আমার নিকট কখন কখন তাহারা অর্থ সাহায্য পাইত। সহরে ভাল সঙ্গীতজ্ঞ বা যন্ত্রী আসিলে, সঙ্গীতপ্রিয় ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাড়ীতে গানের মজলিস বসাইতাম এবং অন্য কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে গানের মজলিসে উপস্থিত হইবার জন্য

নিমন্ত্রণ পাইলে আহ্লাদ সহকারে সেখানে যাইতাম। এক কথায় কোর্টের বাহিরে হাকিমীভাব দেখানটাকে আমি চিরদিনই অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতাম। সুতরাং আমি একটু জনপ্রিয় হইয়াছিলাম। সেই সময় বাঙ্গালার অনেক স্থানে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল; রাজদ্রোহী দলের সৃষ্টি হইতেছিল। মেদিনীপুর তাহার অন্যতম কেন্দ্রস্থল ছিল। পুলিসের ইন্‌স-পেক্টার লালমোহন গুহ এবং মৌলবী মজহরল হক ও ডাক্তার বঙ্কিম চন্দ্র ঘোষ গোপনে ঐ সকল দলভুক্ত লোকের নামের তালিকা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সময় সময় আমাকে বলিতেন, "আপনি সকলের সঙ্গে মিশিয়া থাকেন, সর্ব্বত্রই আপনার গতিবিধি আছে; অনেক সংবাদ জানিয়াও আপনি গোপন করেন।" তাঁহাদের এইরূপ মন্তব্যের কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। বলিতাম, "ভাই, আমি আমোদপ্রিয় লোক, আমোদ আহ্লাদের জন্যই সাধারণের সঙ্গে মিশিয়া থাকি; গোয়েন্দাগিরির জন্য নহে; আর গোয়েন্দাগিরি করিবার প্রবৃত্তিও নাই।" এইরূপ ভাবে কয়েক মাস অতীত হইবার পর, তমলুকের সব-ডিভিসনাল অফিসার পূর্ব্বোল্লিখিত রাখাল বাবুকে উলুবেড়িয়ায় বদলী করা হয় এবং সাহেব বাহাদুর অবিলম্বে তমলুকের ভার লইবার জন্য মফঃস্বল হইতে টেলিগ্রাম করেন "Take charge Tamluk immediately." আর কোথা যাবি? সেই পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটি ডেপুটীর ঈর্ষা একেবারে সীমা ছাড়াইয়া উঠিল। কিরূপে আমাকে

অপদস্থ করিবেন, কিরূপে আমার প্রতি সাহেবের মন বিষাক্ত করিয়া দিবেন, এখন তাহারই উপায় দেখিতে লাগিলেন। আমাকে লইয়া তলে তলে যে এতটা কাণ্ড হইতেছে, সে সময় ঘূণাক্ষরেও তাহা জানিতে পারি নাই।

এই সময় (১৯০৭-৩০শে সেপ্টেম্বর) প্রমথ নাথের দ্বিতীয় পুত্র বীরেন্দ্র নাথের জন্ম হয়। সোমবারে ইহার জন্ম হইয়াছিল। মনে পড়িয়া গেল, কবিবর দ্বিজেন্দ্র লালের সেই গানটা,—"বড় কষ্ট পেয়ে জন্মেরে ভাই, অদিনে বারম্বারে, এবার পাঁজি দেখে, পুরুত ডেকে, জন্ম নিলাম সোমবারে।" সোমবার জন্মের কি ফল হয় তাহা পরে জানা যাইবে। তমলুকের সব-ডিভিসনাল অফিসার রাখাল বাবু পূজার ছুটীর সঙ্গে এক মাসের বিদায় লওয়ায় আমাকে তৎপদে প্রথম অস্থায়ীভাবে, তারপর পাকা রকমে পাঠান হইয়াছিল। অস্থায়ীভাবে তমলুকে অবস্থিতি সময়ে কনিষ্ঠ সহোদর রাজেন্দ্র নাথ পীড়িত হইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পত্নী হেমাঙ্গিনী এই সংবাদ পাইয়া পুত্র প্রমথ নাথকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। প্রমথ নাথ তাহার পূর্ব্বে College of Physicians and Surgeons হইতে সুখ্যাতির সহিত পাশ করিয়া, খড়্গপুরের খরিদা বাজারে ডিসপেন্সারী করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল। পিতৃব্যের পীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র কম্পাউণ্ডার রাজকৃষ্ণকে খরিদায় রাখিয়া কলিকাতায় গিয়াছিল এবং উপযুক্তরূপ চিকিৎসায় আরোগ্য লাভের পর তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া মেদিনীপুরে আসিয়া

ছিল। রাজেন্দ্র নাথের পত্নী, তাঁহার ভগ্নী সরোজিনী এবং শ্যালক-পুত্র পাঁচুগোপাল (প্রমথ নাথের শ্যালক) তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল।

রাজকার্য্য উপলক্ষে এই সময় আমাকে একদিন গড় মনোহর পুরের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে যাইতে হইয়াছিল। গড় মনোহর-পুর, সেই সময় দাঁতনের জমিদার রাজা রামচন্দ্রের জমিদারীভুক্ত ছিল। এখানেও রাজা বাহাদুর একটী সুন্দর প্রাসাদ, কয়েকটি জলাশয়, পুষ্পোদ্যান প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া সপরিবারে অনেক সময় বাস করিতেন। প্রকৃতই স্থানটাকে রাজা বাহাদুর অতীব মনোহর করিয়া তুলিয়াছিলেন। ১৮৭৫-৭৬ সালে স্বর্গীয় পিতৃব্যদেব মহেন্দ্র নারায়ণ যখন দাঁতনে মুন্সেফি পদে, এবং আমি তত্রত্য M. E. স্কুলের হেড-মাষ্টারী পদে নিযুক্ত থাকি, সেই সময় রাজা রামচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম পরিচয়:হয়। ইনি আমার অপেক্ষা চারি পাঁচ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ। প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। মনোহরপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে আমি যাইতেছি, এই সংবাদ পাইয়া রাজা বাহাদুর কুমার সতীশ চন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া নেকুড়-সেনী ষ্টেশনে আমার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। ট্রেণ হইতে অবতরণ করিবামাত্রই আমাকে সহাস্যবদনে অভিবাদন করিয়া মনোহরপুর প্রাসাদে যাইয়া স্নানাহার করিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। কাজ সমাধা করিয়া আমিও তথায় যাইয়া একদিন আনন্দে কাটাইলাম। রাজা বাহাদুর অপরাহ্ণে আমাকে তাঁহার

পুস্তকালয়, উদ্যান প্রভৃতি দেখাইলেন। পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে একদল জেলে বড় জাল লইয়া একটী বড় পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে নামিল। আমাদের জন্য বাঁধাঘাটে কয়েকখানি চেয়ার রাখা হইয়াছিল, আমরা তাহাতে বসিয়া মাছ ধরা দেখিতে লাগিলাম। পুষ্করিণীটী মৎস্যে পরিপূর্ণ। বৃহৎ বৃহৎ রুই, কাতলা ঝাঁকে ঝাঁকে লম্ফ দিয়া জাল পার হইতেছিল। মাছ ধরা হইলে প্রাসাদে ফিরিয়া সান্ধ্য জলযোগান্তে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গান হইল। তুইটী ওস্তাদ উপস্থিত ছিলেন। রাজা রামচন্দ্র দেখিলাম অতি সুনিপুণ মৃদঙ্গী হইয়াছেন। ধ্রুপদ অঙ্গের অনেকগুলি তাল অতি দক্ষতার সহিত পাখোয়াজে বাজাইলেন। বিগত ত্রিশ বৎসরে দেখিলাম রাজা বাহাতুরের প্রকৃতি, শিক্ষা, আচার ব্যবহার প্রভৃতির যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আকৃতিরও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেই সুদীর্ঘ, বলিষ্ঠ, সৌম্যমূর্ত্তি এই পরিণত বয়সে যেন আরও শোভাময় হইয়াছে। মস্তকের তুষার ধবল দীর্ঘকেশ পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত। শুভ্র শ্মশ্রুরাজি শোভিত প্রশান্ত বদন ও উজ্জ্বল অথচ বদান্যতা ও সুখশান্তি ব্যঞ্জক চক্ষুদ্বয় মুখমণ্ডলের এবং দেহের শ্রীসম্পাদন করিতে-ছিল। এই একটা দিন যে কি আনন্দে কাটিয়াছিল তাহা ঠিক প্রকাশ করা যায় না। মেদিনীপুরে ফিরিবার সময় স্বরচিত ভক্তি রসাত্মক একখানি সঙ্গীত পুস্তক আমাকে উপহার দিয়া-ছিলেন। পূর্ব্বদিনের ধৃত একটী দশ বার সের ওজনের রুই মাছ, "ঠাকুরাণীকে আমার প্রণাম সহ উপহার দিবেন" বলিয়া

সঙ্গে দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এই সুন্দর মাছ পাইয়া "ঠাকুরাণী" এবং পরিবারস্থ সকলেরই বিশেষ আনন্দ হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর পোলাও, কালিয়া, চপ প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া দুই চারিটী বন্ধুসহ মাছের সদ্ব্যবহার করা হইয়াছিল।

এই সময়ের আর একটী গল্প না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। রাজকার্য্য উপলক্ষে একদিন গড়বেতায় গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে দুই চারিটী স্থানীয় ভদ্রলোকের সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইয়া মুন্সেফ বাবুদের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে যাইতেছিলাম। দেখিলাম পথের ধারে একটী বর্ষিয়সী রমণী অনেকবার আমার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বাছা তুমি ওরূপভাবে আমাকে দেখিতেছ কেন?" উত্তরে রমণী কহিলেন "বাবা, তুমি কে, তোমাকে যেন পূর্ব্ব পরিচিতের ন্যায় বোধ হইতেছে, কোথায় যেন তোমাকে কত সময় দেখিয়াছি; কোন সময়, কোথায় দেখিয়াছি মনে হইতেছে না।" উত্তরে কহিলাম, "আমার খুড়ামহাশয় বহু-দিন পূর্ব্বে যখন এখানে মুন্সেফ ছিলেন, সেই সময় আমি এবং আমার সহোদর তাঁহার নিকট থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিতাম।" এই কথা শুনিয়াই বৃদ্ধার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, কহিলেন, "বাবা, তুমি কি যোগী?" আমি কহিলাম "হাঁ, আমিই সেই যোগী, সম্প্রতি একটা প্রকাণ্ড "ঘটিরাম" যোগেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী। সে ত অনেকদিনের কথা (১৮৬৭-১৮৬৮), তুমি কি সেই অবধিই এখানে আছ, তুমি কে মনে হইতেছে না। উত্তর—"বাবা আমি

সেই নাজীর বাবুর নিস্তারিণী বামণী, তোমার কাকা আমাকে কত ভালবাসিতেন। তুমি, দেবী, রাজা, ভূপতি, শ্রীপতি আমার বাড়ীতে আসিয়া কতই উপদ্রব করিতে, কত ক্ষীর, ছানা, সন্দেশ, পেঁপে, পেয়ারা তোমাদিগকে খাওয়াইতাম। বাবা, মনে আছে কি, আমার কি রূপ ছিল, কত গয়নাগাঁটি ছিল, কত গাই বাছুর, আসবাব ছিল। বাবা, আমার সে রূপও নাই, সে সকল আর কিছুই নাই ; এখন আমি পথের ভিখারী। এই বলিয়া বৃদ্ধা নীরবে চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিল। আমারও চক্ষু দুইটা জল ভারাক্রান্ত হইল। সেকালের বাল্যকালের সকল কথাই মনে পড়িল। বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিয়া, ডাক বাঙ্গালায় সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে দেখা করিবার উপদেশ দিয়া, গন্তব্য স্থানে যাইয়া মুন্সেফ ও সবরেজিষ্টার, পোষ্ট মাষ্টার প্রভৃতি ভদ্রলোকদিগের সহিত কিছুকাল আলাপের পর ডাক বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিলাম। বৃদ্ধা তৎপূর্ব্বেই আসিয়া বারান্দায় বসিয়াছিলেন। বৃদ্ধাকে রাত্রিতে এবং পরদিন উত্তমরূপে আহারাদি করাইবার জন্য পাচক ব্রাহ্মণকে বলিয়া দিয়া বৃদ্ধার সঙ্গে অনেকক্ষণ সেকালের কথায় কাটাইলাম। দেবী, রাজা (মধ্যম দেবেন্দ্র ও কনিষ্ঠ রাজেন্দ্র) ভূপতি, শ্রীপতি প্রভৃতি কি করিতেছে সমস্ত বৃদ্ধাকে কহিলাম। ভূপতি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীপতি পুলিস ইন্‌সপেক্টার, রাজেন্দ্র সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হইয়াছে শুনিয়া বৃদ্ধার কতই আনন্দ হইল। দেবেন্দ্র কৃতবিদ্য হইয়া হরিনামে উন্মত্ত হইয়াছে শুনিয়া বৃদ্ধা কহিলেন, "বাবা দেবীর যদি কখনও দেখা পাই তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ভক্তের

সেবায় পাপ জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইব।" মেদিনীপুরে ফিরিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধাকে একজোড়া নূতন কাপড়, একখানি গামছা এবং নগদ দুইটী টাকা দিয়াছিলাম। পাপের পরিণাম প্রতি নিয়তই দেখিতেছি, তথাপি আমরা সর্ব্বদাই পাপকার্য্যে রত থাকি, এ রহস্য ভেদ করার শক্তি আমাদের নাই।

দিনাজপুরের পরিচিত বাবু অপূর্ব্ব চন্দ্র ঘোষ বাঁকুড়ায় বদলী হইয়া সহরের পশ্চিম প্রান্তে সুন্দর একটী পাকা বাড়ী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। নূতন বাড়ীতে একদিন একটী ভোজের আয়োজন করিয়া আমাকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমাদের বাল্যকালের ও কৈশোরের লীলাক্ষেত্র বাঁকুড়া দেখিবার ইচ্ছাটাও বলবতী হইয়া উঠিল। বাঁকুড়ার পথে ওঁদা, সেখানেও আমরা শৈশবে পিতৃব্যদেবের নিকট কয়েক বৎসর ছিলাম, তাহা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমে ওঁদার টিকিট লইয়া মহেশচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। মহেশ চন্দ্র পাচক ব্রাহ্মণরূপে প্রথমে আমাদের সংসারে প্রবেশ করেন। বুদ্ধি ও অধ্যবসায় বলে বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া পিতৃব্যদেবের কৃপায় মুন্সেফি আদালতে একটী কাজ পাইয়া ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করেন। সম্প্রতি পেন্সান লইয়া বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। অতি যত্নে ও সমাদরের সহিত একদিন সেখানে কাটাইলাম। দুই চারিটী বৃদ্ধ ব্যতীত সেকালের লোক বড় একটা দেখিলাম না। আমাকে দেখিবার জন্য তাঁহারা এবং প্রাচীনারা ও তাঁহাদের সঙ্গে দলে

দলে বালক বালিকারা আসিয়া সমস্ত দিনটাই মহেশচন্দ্রের বাড়ীটা মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। আমার সমবয়স্ক এবং সহপাঠীদের মধ্যে দেখিলাম কেবল সীতানাথ চক্রবর্ত্তী সক্ষম অবস্থায় আছেন। ইনিও সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া নীলকুঠীর দেওয়ান বা ম্যানেজারী পদে কয়েক বৎসর থাকিয়া প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা করিয়া আমাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন। দেখিলাম, সেকালের কয়েকখানি জীর্ণ তৃণাচ্ছাদিত ভদ্রাসনের স্থানে সুন্দর দ্বিতল পাকা বাড়ী, পূজার চণ্ডীমণ্ডপ, বৃহৎ গোশালা, রন্ধনশালা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। বাটীর পশ্চিমভাগে পাকা ঘাট বাঁধান বৃহৎ পুষ্করিণী (মাছে ভরা), আখ মাড়া কল, গুড় প্রস্তুত করিবার বৃহৎ বৃহৎ কড়াই এবং অন্যান্য সরঞ্জাম প্রভৃতি দেখাইলেন। পুষ্করিণীর উত্তর এবং পশ্চিম ধারে অনেকগুলি কৃষাণ, ধীবর প্রভৃতি নানাবিধ শ্রমজীবি লোকদের বসাইয়াছেন। তাহারা খাজনার পরিবর্ত্তে বার মাসই সীতানাথের চাষের গুড় প্রস্তুত, মাছ ধরা এবং সংসারের যাবতীয় ঐ শ্রেণীর কাজে ব্যাপৃত থাকিত। বাটীতে গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিত্য সেবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব, কালীপূজা এবং পিতৃ-মাতৃ সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে অনেক লোক, বিশেষতঃ দরিদ্র-দিগকে, পরিতোষরূপে খাওয়াইতেন। দেখিয়া যে কি আনন্দ হইল তাহা আর কি লিখিব। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও ধিক্কার দিয়াছিলাম। সংসারে আসিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না ; সেই শ্লোকটি মনে পড়িল :—

"প্রথমে নার্জ্জিতাং বিদ্যা, দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনং।
তৃতীয়ে নার্জ্জিতং পুণ্যং, চতুর্থে কিং করিষ্যামি॥"

পরদিন প্রাতে আহারান্তে বাঁকুড়া যাত্রা করিলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি অপূর্ব্ব ভায়ার বাড়ীটা বেশ সুন্দর ও মজবুত করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল। মেজেয়, রোয়াকে এবং পৈঠায় পাথরের টালি বসান। আড়াই বা তিন বিঘা জমির উপর বাড়ী, জমির খাজনা বার্ষিক মাত্র ১৵৹ আনা। তিনটি বড় বড় সেগুন গাছ কোথায় জোগাড় করিয়া আঠার টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া, সেই গাছের কাষ্ঠেই সমস্ত কড়ি, বরগা, দুয়ার, জানালা, চৌকাট, কপাট প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কি সুবিধাই কাহার কাহার ভাগ্যে ভগবান লিখিয়া রাখিয়াছেন।

কিছুকাল বিশ্রামের পর আমার বাঁকুড়া জেলা স্কুলের সহ-পাঠী বামা চরণদের সঙ্গে দেখা করিলাম। বামাচরণ সে সময় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের একাউটেণ্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন। অনেকক্ষণ তাঁহার সহিত গল্প গুজব করিয়া চা ও জলযোগ সমাধার পর একখানি ঘোড়ার গাড়ী আনাইয়া দুইজনে বাহির হইলাম। আমাদের অন্যান্য সহপাঠীদের মধ্যে কেবল রমানাথ ভট্টাচার্য্য সেই সময় সেখানে স্কুলের সব-ইন্‌সপেক্টার পদে নিযুক্ত ছিলেন। আমাদের পাঠদ্দশায় যাঁহারা আমাদের মুরুব্বিস্থানীয় ছিলেন, দেখিলাম তাঁহাদের মধ্যে কেবল বাবু কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উকীল এবং নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার জীবিত আছেন। উভয়ের বাড়ীতে যাইয়া পদধূলি গ্রহণ করিলাম।

উভয়েই খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। উভয়েই তখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শরীর তখন পর্য্যন্ত বেশ সবল ও সক্ষম রহিয়াছে। তারপর গন্ধেশ্বরী নদী এবং পূর্ব্বপরিচিত প্রিয় স্থানগুলি দেখিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে অপূর্ব্ব চন্দ্রের ভবনে ফিরিলাম। পঠদ্দশাতেই বামাচরণ চিত্রাঙ্কন, চেহারা দেখিয়া অবিকল নকল করা এবং নানারূপ কারুকার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। দুইটী পুত্রকে এই সকল কাজ শিখাইয়া তাহাদের দোকান করিয়া দিয়াছিলেন। আমার চক্রধরপুরের বৈঠকখানায় প্রবেশ দ্বারের উপর যে "Deeds Not Words" লিখিত খোদাই করা তক্তাখানি আছে সেখানি বামাচরণের পুত্রদের নির্ম্মিত; আমাকে উপহার দিয়াছিল।

নিমন্ত্রিতদের চিত্তবিনোদনের জন্য অপূর্ব্ব ভায়া স্থানীয় "কন্সার্ট" পার্টি এবং থিয়াটারের কয়েকটী গায়কেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় জজ বরদা চরণ মিত্র, ম্যাজিষ্ট্রেট কুমার রমেন্দ্র কৃষ্ণ দেব, পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গিরীন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সবজজ, মুন্সেফ এবং কয়েকজন উকীল নিমন্ত্রিত শ্রেণী ভুক্ত ছিলেন। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার পূর্ব্ব পরিচিত। আর কাহারও সঙ্গে পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না। বিষ্ণুপুরের সবডিভিসনাল অফিসার রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিমন্ত্রণ পাইয়া আসিয়াছিলেন। রাখাল বাবু সম্বন্ধে একটা কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে। ইঁহার পিতা স্বর্গীয় মুন্সেফ মহাশয়ের উপাধি ছিল "শর্ম্মা" (প্রিয়নাথ শর্ম্মা, আমরা ওঁদায় থাকিবার

সময় সোণামুখীর মুন্সেফ ছিলেন) এবং রাখাল বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর পুরুলিয়ার উকীল অনঙ্গ বাবু নিজেকে অনঙ্গ মোহন ভট্টাচার্য্য বলিতেন এবং সকলেই জানিত তাঁহার উপাধি ছিল "ভট্টাচার্য্য।" আহারাদির আয়োজন খুব জমকাল রকম হইয়াছিল। নানাবিধ ফলমূল হইতে আরম্ভ করিয়া কালিয়া, পোলাও এবং বাঁকুড়ার প্রসিদ্ধ ছানার জিলিপি ও বিষ্ণুপুরের সীতাভোগ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছিল। অপূর্ব্ব ভায়ার জ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি (নামটী ভুলিয়াছি, কলিকাতায় কি একটা বড় কাজ করিতেন তাহাও মনে নাই) কলিকাতা হইতে উৎকৃষ্ট সন্দেশও আনিয়াছিলেন। তিনজন বাঙ্গালী সাহেবের মধ্যে জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটকে টেবিলে খাবার দেওয়া হইয়াছিল; গিরীন্দ্র আর সকলের সঙ্গে আসনেই দেশী ধরণে বসিয়াছিলেন। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে একজন ব্যারিষ্টারও ছিলেন। কিন্তু টেবিলটী সেই আমাদের সম্মুখস্থ শালপাতা, শালপাতার দোনা, মাটির গেলাস ও মাটির কট্‌রা দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া একটা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। যাহা হউক, বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত ভোজ নির্ব্বাহ হইয়াছিল। ভায়ার ভগ্নীপতির অধ্যক্ষতাতেই এবং পরামর্শ অনুসারে যে আয়োজন হইয়াছিল তাহা বুঝিতে বাকী ছিল না। তাহার কারণ আমরা কোন সময়ে তাঁহার নিকট হইতে একটী ভোজ আদায় করিবার জন্য দুই তিন মাস ধরিয়া উমেদারী ও পীড়াপীড়ি করিবার পর ভায়া ভোজ দিয়াছিলেন। আমরা ছিলাম এগার জন। ভায়া কহিলেন "আমার বাড়ীতে ওসব হাঙ্গামা হবে না;

জিনিষ পত্র পাঠাইয়া দিব, তোমরা রাঁধিয়া বাড়িয়া খাও।” আমরা তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া একটা দিন স্থির করিয়া পূর্ব্বদিন ভায়াকে জানাইলাম। পরদিন একজন মুন্সেফ কোর্টের বৃদ্ধ চাপরাসী একটী ডালায় নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি আমার বাসায় আনিয়া দিল ঃ—চাউল /২॥০ সের, বুটের ডাউল /॥০, আলু /১ সের, পটল /১।০ সের, পেঁয়াজ ৪টা, আদা ১খানি, ঘৃত ৵॥০ সের, তৈল /॥০ সের, লবণ /।০ পোয়া, তেজপত্র ৮খানি, লঙ্কা মরিচ ৬টী, অন্যান্য মসলাও এই পরিমাণ। মিষ্টান্ন, চাট্‌নি এবং আচার প্রভৃতিও আসিল। আনারস খাইয়া তার বুকোটা টুকরা টুকরা, করিয়া ভিনিগার, লবণ, কিছু মসলা ও চিনির সহিত বোতলে পুরিয়া কিছুকাল রাখিয়া যে চাট্‌নী প্রস্তুত হয়, সেই উপাদেয় চাট্‌নী এগার টুকরা ; কাঁঠাল খাইয়া তাহার বুকোটা টুকরা টুকরা করিয়া লবণও কিছু মসলার সহিত তৈলে ডুবাইয়া কিছুদিন রাখিবার পর যে আচার প্রস্তুত হয় সেই আচার এগার টুকরা। মিষ্টান্ন পাইলাম এগার টুকরা, অৰ্দ্ধ ইঞ্চি স্কোয়ার (square) ঘরের প্রস্তুত বিনা ময়ানের গজা। মাংসও পাইয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে বেশ ছোট খাসীর মোলায়েম মাংস আন্দাজ /১॥০ সের পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক, প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি নিজেরাই সংগ্রহ করিয়া নিজেদের পাচকের দ্বারা পোলাও, মাংস, ডাউল প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া ভোজ খাওয়া হইয়াছিল।

বেতনভোগী (stipendary) কর্ম্মচারীরূপে মেদিনীপুর সদরে আমার এই শেষ অবস্থিতি। পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুবান্ধবও অন্যান্য

ভদ্রলোক ব্যতীত, এযাত্রায় আরও অনেকের সঙ্গে বিশেষরূপ আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্র লাল খাঁ, তাঁহার পিতৃব্য উপেন্দ্র লাল খাঁ, রাজা বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার দেবেন্দ্র লাল খাঁ, ব্যারিষ্টার রবীন্দ্র নাথ নাগ ও তৎসহোদর জ্ঞানেন্দ্র নাথ নাগ। ইঁহাদের পিতা, শুনিয়াছি একজন দুর্দ্দান্ত জমিদার ছিলেন। একদিন পাল্কীযোগে রাত্রি-কালে মেদিনীপুর হইতে নিজ বাটীতে যাইবার পথে জনশূন্য মাঠের মধ্যে অনেক লোক ইঁহাকে আক্রমণ করিয়া পাল্কী চূর্ণ করিয়া তাঁহার সংহার করিয়াছিল। মৃতদেহ মেদিনীপুর হাঁসপাতালে আনীত হইলে শরীরে ৫২টী অস্ত্রাঘাত চিহ্ন দেখা গিয়াছিল। তারপর পরিচয় হইয়াছিল, চৌধুরী রাধাগোবিন্দ পাল জমিদার, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হেডক্লার্ক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (পরে সেক্রেটারী হইয়াছিলেন), সব-ডেপুটী কালেক্টর আশুতোষ দেব, জাড়ার জমিদার বংশের কিশোরীপতি ও তৎসহোদর সাতকড়িপতি রায় অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট গোঁসাই দাস দত্ত, রোডসেস হেডক্লার্ক মহেন্দ্র লাল বসু ও তৎপুত্র জ্ঞানেন্দ্র লাল বসু। গোপীবল্লভপুরের জমিদার কৃষ্ণ চন্দ্র গ্রহরাজ এবং আরও অনেক সম্ভ্রান্ত উকীল ও ভাল ভাল লোক।

১৯০৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে আমাদের গোল-কূয়ার সম্মুখস্থ বাসা বাড়ীতে প্রমথ নাথের দ্বিতীয় পুত্র নসু (বীরেন্দ্র) জন্মগ্রহণ করে। বঙ্গ-বিভাগ জনিত আন্দোলন

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইলেও এই সময় খুব বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিয়াছিল। যেখানে সেখানে সভা সমিতির অধিবেশন, বক্তৃতা, হরিদ্রাবর্ণের পাগড়ী বাঁধিয়া পতাকা হস্তে "বন্দেমাতরম্" শব্দে আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া ছাত্র ও যুবকবৃন্দের রাস্তায় রাস্তায় বিচরণ, কাহারও পরিধানে বিলাতী বস্ত্র দেখিলে তাহার প্রতি নানারূপ অত্যাচার, লাঠি খেলার আড্ডা স্থাপন প্রভৃতি কাজগুলি স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কোন কোন পরিবারের মহিলারাও স্বামী ভ্রাতা প্রভৃতির অনুকরণে বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে বোমা প্রস্তুত হইতেছে এরূপ গুজবও শুনিতে পাইলাম। একদিন শুনিলাম, নারায়ণগড় ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ছোট লাট বাহাদুরের স্পেশাল ট্রেণ বোমার দ্বারা নষ্ট করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। পুলিশ মহালে এবং সহরের সর্ব্বত্রই হুলস্থুল পড়িয়া গেল। প্রকৃতই এই সকল অরাজকতার ফলে দেশের ভবিষ্যৎ কিরূপ অন্ধকারময় হইবে তাহাও চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। অনেকগুলি মজুর শ্রেণীর লোক পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া হাজতে আবদ্ধ হইল এবং পুলিস ও C. I. D. কর্ত্তৃক অনুসন্ধান আরম্ভ হইল।

১৯০৮ সালের ৮ই মার্চ্চ আমি তমলুকে উপস্থিত হইয়া রাখাল বাবুর নিকট হইতে সবডিভিসনের ভার গ্রহণ করিয়া-ছিলাম, তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। রাখাল বাবুকে উলুবেড়িয়ায় বদ্‌লী করিয়া প্রথমে বাবু জ্যোতিষ চন্দ্র সেনকে তৎপদে নিযুক্ত করিয়া গেজেট পর্য্যন্ত হইয়াছিল। আমাকে

কি জন্য তমলুকের ভার লইবার আদেশ হইল, প্রথমে তাহা বুঝিতে পারি নাই। পরে শুনিয়াছিলাম সবডিভিসনের অন্তর্গত মহিষাদলের রাজা বাহাদুর প্রমুখ অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক একজন প্রবীন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটকে তমলুকের ভার দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করেন। তাহার ফলেই আমার চাকরীর শেষ অবস্থায় তমলুকে বদ্‌লী হইয়াছিলাম। মা বর্গভীমা এতদিনে আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্যই এই সকল কার্য্যকারণ ঘটাইয়াছিলেন। তমলুক একটী প্রকাণ্ড মহকুমা, রাজনৈতিক আন্দোলন লইয়া নানাস্থানে নানারূপ গোলযোগ ঘটিতেছিল। বিলাতী দ্রব্য বিক্রয় করণ অপরাধে কয়েকটী স্বদেশী পাণ্ডা, নিরীহ দোকানদারদের উপর নানাবিধ অত্যাচার করায় তাহাদের কারাদণ্ড হইয়াছিল। পুলিসের প্ররোচনায় এবং রাখাল বাবু নিজের কার্য্যকুশলতা দেখাইবার জন্য অনেক নিরীহ ভদ্রলোকের বাড়ী খানাতল্লাসী করাইয়া তাহাদিগকে অনর্থক অপদস্থ ও বিড়ম্বিত করিতেছিলেন। কখন পুলিস আসিয়া কাহার বাড়ী ঘেরাও করিবে, খানাতল্লাসী করাইয়া ঘরের আসবাব ছারখার করিবে এই ভয়ে সমগ্র সবডিভিসনের ছোট বড় সকলেই সশঙ্কিত হইয়াছিলেন। চার্জ্জ গ্রহণ করিবার পর যখন ট্রেজারীতে বসিয়া টাকা কড়ি, ষ্ট্যাম্প আদি গণিয়া লইতেছিলাম, সেই সময় রাখাল বাবু তমলুক পরিত্যাগ করিয়া ষ্টীমারে উঠিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ একটা লোক আসিয়া খবর দিল "বড় গোলযোগ উপস্থিত, রাখাল বাবুর এফিজি (effigy) অর্থাৎ তৃণ কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত

প্রতিকৃতি নদীর ধারে খাড়া করিয়া আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রাখাল বাবু বড় ভয় পাইয়াছেন। আপনি একবার শীঘ্র আসুন।” আমি তৎক্ষণাৎ খাজনাখানা বন্ধ করিয়া ষ্টীমার ঘাটে উপস্থিত হইলাম। অনেকগুলি পুলিস কর্ম্মচারী ও অন্যান্য ভদ্রলোকও আমার সঙ্গে ছিলেন। রাখাল বাবুকে ষ্টীমারে কেহ কোনরূপ অপমান না করিতে পারে, সেইজন্য একজন হেড কনেষ্টবল এবং কনেষ্টবলকে উলুবেড়িয়া পর্য্যন্ত রাখাল বাবুর সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। পরদিন “তমালিকা” নামক স্থানীয় পত্রিকায় রাখাল বাবুর তমলুক পরিত্যাগজনিত আনন্দোচ্ছ্বাস পূর্ণ একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইল, যে দুই চারিটী রাজকর্ম্মচারী ও স্থানীয় ভদ্রলোক রাখাল বাবুর প্রিয়পাত্র এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সম্পাদক ভায়া তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ও দুই চারিটা ব্যঙ্গোক্তি করিতে ছাড়েন নাই। রাখাল বাবু একজন সুযোগ্য কর্ম্মচারী; শাসন সংক্রান্ত নীতির (Executive) কাজে বেশ সুখ্যাতি ছিল। তবে সাম্য নীতিরও দূরদর্শিতার অভাব প্রযুক্ত লোকপ্রিয় হইতে পারেন নাই এবং অনেক নির্দ্দোষী ভদ্রলোকের মানসম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনে তমলুক সবডিভিসন্ এই সময় টলমল করিতেছিল। অনেকগুলি যুবক, উকীল, মোক্তার এবং সম্ভ্রান্ত লোক, এমন কি সবডিভিসনের সুদূর প্রান্তবর্ত্তী স্থান সমূহের অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত লোকের মধ্যেও অনেকে, এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে এক একটা

বিচাবালয় স্থাপন কবিয়া সম্পত্তিশালী গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা সকল প্রকার বিচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যালয়, দেবমন্দির, ধনীর অট্টালিকা, দরিদ্রের কুটীর, দোকান ঘরগুলিরও পুরোভাগে বৃহদক্ষরে "বন্দেমাতরম্" লেখা হইতেছিল। কলিকাতা, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি স্থান হইতে স্বদেশী আন্দোলনের পাণ্ডারা দলে দলে সবডিভিসনের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিলেন এবং কেবল স্বদেশানুরাগ নহে, রাজদ্রোহজনক উত্তেজক বর্ক্তৃতার দ্বারা জনসাধারণকে অধিকতর উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিলেন। হিন্দু, মুসলমান বহুদিন হইতে জেতৃ ও বিজিত ভাব ভুলিয়া, জাতি ধর্ম্মের বিভিন্নতা ভুলিয়া পরস্পর ভ্রাতৃভাবে, বন্ধুভাবে আপনাপন সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিল। এখন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দারুণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা হইতে লাগিল। নানাস্থান হইতে আমার নামে বহুতর বেনামী এবং স্বাক্ষরবিহীন চিঠিপত্র আসিতে লাগিল, "অমুক স্থানে বোমা প্রস্তুত হইতেছে", "অমুক বাটীতে রাত্রিকালে সভা বসিতেছে, পুলিস প্রহরী লইয়া সত্বর আসুন, ধরাইয়া দিব" প্রভৃতি এই সকল মর্ম্মে চিঠিপত্র লিখিত হইতেছিল। পুলিস কর্ম্মচারীগণ একটু কিছু সূচনা পাইলেই তাহাকে অতিরঞ্জিত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিয়া তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার করিতে লাগিলেন। আমিও বিচলিত হইয়া পড়িলাম। সর্ব্বপ্রথমেই সবডিভিসনের সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং তাঁহাদের প্রতিনিধিদিগকে তমলুকে আনাইয়া একটী সভার অধিবেশন করা হইল। যাঁহারা

মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতে নিষেধ করিয়া কেবল ভূমি সংক্রান্ত, দেনাপাওনা সংক্রান্ত এবং সামাজিক বিষয়েরই পঞ্চায়তি ধরণে বিচার করিয়া প্রতিমাসে ঐ সকল মোকদ্দমার কাগজপত্র আমার নিকট পাঠাইতে উপদেশ দেওয়া হইল। দরজার উপর "বন্দেমাতরম্" লিখিয়া মাথায় হরিদ্রাবর্ণের পাগড়ী বাঁধিয়া পতাকা উড়াইয়া অনর্থক হৈ, চৈ করিয়া বেড়াইলে প্রকৃত কাজ কিছুই হইবে না, বিশদরূপে তাহা উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। "বন্দেমাতরম্" হৃদয়ে এবং রাজভক্তি মাথায় করিয়া যাহাতে স্বদেশের প্রকৃত উন্নতি হয়, যাহাতে স্থানীয় অভাবগুলি মোচন হয়, যাহাতে গভর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন না হইতে হয়, পুলিস কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত না হইতে হয়, এইরূপ নীতি অবলম্বন করিবার উপদেশ দেওয়া হইল। কোন স্থানে কি, কি অভাব দূর করা প্রয়োজন, প্রত্যেক থানার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে তাহার এক একটা তালিকা প্রস্তুত করিতে বলিলাম। এই সকল তালিকা প্রস্তুত হইলে শীঘ্রই আবার একত্রে সম্মিলিত হইয়া আসল কাজে হস্তক্ষেপ করা যাইবে বলিয়া সকলকে বিদায় দেওয়া হইল। তারপর অল্পদিনের মধ্যেই সবডিভিসনের প্রধান প্রধান স্থান এবং স্বদেশী আন্দোলনের কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিয়া প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক থানায় পূর্ব্বোক্ত নীতি ও প্রণালী অবলম্বনে কাজ করিবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিলাম। কখনও বা গোপনে অথবা ছদ্মবেশে কোন কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া

পূর্ব্বোল্লিখিত বেনামী বা স্বাক্ষরবিহীন চিঠি পত্রের সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, বোমাও প্রস্তুত হইতেছে না, রাত্রিকালে সভার অধিবেশনও হইতেছে না। তবে সর্ব্বত্রই স্বদেশী আলোচনা হইতেছে মাত্র। আমি প্রথম হইতে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহা পুলিস নীতির অনুকূল নহে দেখিয়া কতকগুলি পুলিস কর্ম্মচারী আমার উপর খুবই বিরক্ত হইয়াছিলেন। ইন্‌সপেক্টার নগেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ইনি আমার পিতৃব্য পত্নীর জ্ঞাতিভ্রাতা স্বর্গীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র) একদিন কথায় কথায় আমাকে বলিলেন, "দাদা, দারোগারা বলিতেছে আপনার কার্য্যপ্রণালীতে লোকেরা সাবধান হইতেছে এখন তাহাদিগকে ধরা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। আমি মনে মনে হাসিয়া নগেশকে কহিলাম "ভাই আমি এই প্রণালীতে ও নীতি অবলম্বনেই কাজ করিব। সকলকে সাবধান করিয়া দিব, অপরাধ সংঘটিত হইতে দিব না। Prevention is much more desirable than detection after a crime has been committed. অর্থাৎ অপরাধ সংঘটিত হইবার পর অপরাধীকে ধরা অপেক্ষা যাহাতে অপরাধ না ঘটে তাহার চেষ্টা করাই সর্ব্বোতভাবে বাঞ্ছনীয়। ভাই, তুমিও এই নীতি অবলম্বন করিয়া আমার সহায়তা করিলে সব-ডিভিসনে অরাজকতার নামগন্ধও থাকিবে না ; অতি শীঘ্রই শান্তি স্থাপন হইবে। আমার দৃঢ়পণ দেখিয়া অতঃপর নগেশও কতকটা আমার মতাবলম্বী হইয়াছিল।

এবার তমলুকে আসিয়া দেখিলাম ষ্টীমার আর নগর পর্য্যন্ত আসিতে পারে না, প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে নদীবক্ষে অপেক্ষা করে। তাহার কারণ নগর ও নদীর মধ্যে একটী বিশাল চর উদ্ভব হইয়াছিল। আবার এই চর এবং নগরের মধ্যে একটী নাতিবৃহৎ খাল থাকিয়া গিয়াছিল। জোয়ারের সময় যখন খালটা জল পূর্ণ হইত সেই সময় যাত্রীগণকে নৌকাযোগে চরের দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরিয়া ষ্টীমারে উঠাইয়া দেওয়া হইত। ভাটার সময় যখন খালের জল প্রায় শুকাইয়া যাইত সেই সময় ষ্টীমার আসিলে ষ্টীমার ধরিবার জন্য যাত্রীগণকে এক হাঁটু বা তদধিক গভীর পাঁকের মধ্যে দিয়া চরে উঠিতে হইত এবং কণ্টকাকীর্ণ নানাবিধ গুল্মের মধ্য দিয়া প্রায় অর্দ্ধমাইল পথ অতিকষ্টে অতিক্রমের পর নদীতীরে উপস্থিত হইতে হইত। দুই একদিন দেখিলাম কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর এবং কতকগুলি গরীব ভদ্রলোকের রমণী, একহাতে কাপড়ের পুঁটুলী, কোলে শিশু এবং অন্যহাতে পরিধেয় বস্ত্র উপরের দিকে উঠাইয়া অতি কষ্টে সেই বিষম পঙ্কিল খাল হাঁটিয়া পার হইতেছেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে কোন প্রকারেই হউক এই কষ্ট দূর করিতেই হইবে।

সবডিভিসনের অফিসারদিগকে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধিবেশনে প্রতিমাসে একবার করিয়া সদরে যাইতে হইত। আমি তমলুক হইতে সর্ব্বপ্রথমে যখন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধিবেশনে যাই সেই সময় মেদিনীপুরের "বোমার" মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইয়াছে। কৌতূহলপরবশ হইয়া মোকদ্দমার বিচার দেখিবার জন্য

বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখি, সুপ্রশস্ত হল্‌টীতে "তিল ধারণের স্থান নাই," লোকে লোকারণ্য। পুলিস প্রহরীগণের নিকট আমি সুপরিচিত থাকায়, তাহারা কোন রকমে একটু রাস্তা করিয়া এজলাসের নিকটবর্ত্তী স্থানে একখানি চেয়ার দিয়া আমাকে বসাইলেন। পুলিস প্রথমে ১৫৪ জনকে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া গ্রেপ্তার করে, হাজতেও তাহাদিগকে দুই চারিদিন থাকিতে হইয়াছিল। ষড়যন্ত্রকারীদের নামের তালিকার মধ্যে পরে নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্র লাল খাঁ, জমিদার চৌধুরী যামিনী নাথ মল্লিক, অবিনাশ চন্দ্র মিত্র ও উপেন্দ্র চন্দ্র মাইতি প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত উকীল অনেকগুলি মোট ২৯ জনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালান হইতেছিল। পরে এডভোকেট জেনারেল মিঃ এস, পি, সিংহ (Advocate General Mr. S. P. Sinha) মহাশয় মেদিনীপুরে আসিয়া সমস্ত কাগজ পত্র দেখিবার পর তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কেবল মাত্র তিনজনকে রাখিয়া বাকী ২৬ জনকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল। ঐ তিনজন সেসন সোপর্দ্দ হইলে জজ বাহাদুর তাঁহাদিগকে সুদীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। হাইকোর্টে আপীল হইলে মহামান্য হাইকোর্টে তিনজনকেই নিষ্কৃতি দিয়া, পুলিসের কার্য্যাবলীর উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে কি হয়, বিচার বিভাগ এবং শাসন বিভাগ (Judicial Executive) দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। এই ষড়যন্ত্র ধরিয়াছেন বলিয়া মৌলবী মজহরল হক এবং বাবু লাল মোহন গুহ ইন্‌সপেক্টারদ্বয় অবিলম্বে খাঁ বাহাদুর ও রায় বাহাদুর উপাধি

সহ ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে উন্নীত হইলেন। সেই সঙ্গে পুলিস-বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক ডাক্তার বঙ্কিম চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হইয়া গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস পাইলেন। তাঁহাকে আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন পদে নিযুক্ত করিয়া বেহার প্রদেশের কোন জেলায় পাঠান হইল।

কাছারী হইতে ফিরিয়া বন্ধুবর উমেশ চন্দ্র গোস্বামীর বাসায় নানাবিধ গৃহজাত সুখাদ্য মিষ্টান্নাদি সহ চা পান করনান্তর সহর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, দুই চারিজন বিশেষ বিশেষ বন্ধুর সহিত দেখা সাক্ষাতের পর বাসায় ফিরিলাম। তখন দুই একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং আবগারী কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। বোমার মোকদ্দমা সংক্রান্ত আলোচনার সময় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু মাখন লাল চট্টোপাধ্যায় কহিলেন, "সেদিন মিঃ ওয়েষ্টন আমা-দিগকে কুঠীতে ডাকিয়া লইয়া কহেন যে "My Deputies go about with their eyes and ears shut." তাহাতে পূর্ব্বোক্ত তিনজন ডেপুটীর মধ্যে একজন উত্তর দিলেন, "Sir, we are new-comers; Jogendra Babu is the oldest officer here, he freely mixes with the public and the public mix with him. He is the only man who is expected to know what is going on in the town." কি ভয়ানক, প্রকারান্তরে আমাকেও বিপ্লবকারীদিগের দলভুক্ত করিয়া আমার সম্বন্ধে সাহেবের মনে একটা বিকট ধারণার সৃষ্টি করিবার চেষ্টাতেই যে

আমার প্রিয় বন্ধু হিতৈষী ডেপুটীবর্গ সাহেবকে ঐ সকল বলিয়াছিলেন, তাহা আর বুঝিতে বাকী রহিল না।

তমলুক সবডিভিসনের ভার গ্রহণ করিবার অল্পদিন পরেই আমার চারিশত টাকা বেতন হইয়াছিল। মা বর্গভীমার পূজা দিয়া সহরের যাবতীয় ভদ্রলোক এবং তাঁহাদের মহিলাবর্গকে ভোজ দেওয়া হইল। আমার পঞ্চান্ন বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ায়, আমার আবেদন অনুসারে গভর্ণমেণ্ট এক বৎসর করিয়া আরও তিন বৎসর চাকরী করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

এই সময় মিঃ ওয়েষ্টন কয়েক মাসের বিদায় লওয়ায় তৎপদে মিঃ আর, জি, কিলবী (Mr. R. G. Kilby I. C. S) মেদিনীপুরের স্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে ইনি মেদিনীপুরের আডিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত ছিলেন। উভয়েই উচ্চ প্রকৃতির লোক। কিলবী সাহেবের একটী খানসামাকে পাগলা কুকুরে কামড়াইয়াছিল। সাহেব তৎক্ষণাৎ ক্ষতস্থানে মুখ দিয়া বিষ ও বিষাক্ত রক্ত চুষিয়া লইয়া সামান্য একজন খানসামার প্রাণরক্ষার জন্য নিজের প্রাণ সঙ্কটাপন্ন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার দুই মাস পূর্ব্বে সাহেব একটী সপ্তদশ বর্ষীয়া বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যে জাতির মধ্যে কিলবী সাহেবের ন্যায় মহৎ প্রকৃতির লোক জন্মগ্রহণ করেন, সেই জাতিই প্রকৃত মহৎ, প্রকৃত বীর! সেই সময় হইতে মহামতি কিলবীকে সকলে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। বিলাতে এই সংবাদ পৌঁছিলে, সেখানে হাউস অব কমন্স

(House of Commons) ইঁহাকে The heroic Magistrate বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। মিঃ ওয়েষ্টন বাহাদুরও দেবপ্রকৃতির লোক ছিলেন। কেবল কয়েকটী পুলিস কর্ম্মচারী, এবং দুই চারিজন ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন, ঘোর স্বার্থপর, নীচপ্রকৃতির লোকের উপর অযথা বিশ্বাস স্থাপন করায় তাঁহার অকলঙ্ক চরিত্রে একটু কলঙ্কের দাগ পড়িয়াছিল এবং কতকগুলি নিরপরাধ লোকের লাঞ্ছনার একশেষ হইয়াছিল।

উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ক্রমে ক্রমে আমাকে আরও তিন বৎসরের জন্য চাকরীতে থাকিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ঐ আদেশ অনুসারে ১৯১০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আমাকে চাকরীতে থাকিতে হইত। কিন্তু এই সময় মিঃ কিলবী স্থানান্তরিত হওয়ায় তৎপদে মিঃ ডব্লিউ, এ, মার নামক (Mr. W. A. Marr. I C. S.) একটী জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর হইয়া আসিলেন। ইনি মেদিনীপুর আসিয়াই কি ডেপুটী, কি আমলা সকলের উপর এরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিলেন যে অনেকগুলি উপযুক্ত কর্ম্মচারী দীর্ঘ বিদায় লইয়া স্থানান্তরে বদ্‌লীর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেকগুলি সুদক্ষ, বহুদর্শী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কার্য্যক্ষম থাকিয়াও পেন্সন লইবার জন্য আবেদন পত্র পাঠাইতে লাগিলেন। আমিও দেখিলাম এরূপ লোকের অধীনে চাকরী করিতে হইলে শেষ অবস্থায় অপদস্থ হইয়া বাহির হইতে হইবে। এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া শারীরিক অসুস্থতার ভান করিয়া ১লা নভেম্বর

হইতে অবসর গ্রহণ করিবার প্রস্তাবে আবেদন পত্র পাঠাইলাম।

কয়েকটী বিশেষ কথা ইতিপূর্ব্বেই লেখা কর্ত্তব্য ছিল, ভ্রম বশতঃ তাহা হয় নাই বলিয়া এই স্থলেই লিখিতেছি। আমার উভয় চক্ষে মতিয়াবিন্দু হইয়া দৃষ্টি খুবই ক্ষীণ হইতেছিল; অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই সময় প্রমথ নাথের একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল। পাঁচ মাস বয়ঃক্রম সময়ে শিশুটী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়। স্থানীয় ডাক্তারদের চিকিৎসায় কোন ফল না হওয়ায় তাহাকে কলিকাতা পাঠান প্রয়োজন হইয়াছিল। বন্ধুবর দেবেন্দ্র চন্দ্র মল্লিককে লিখিয়া মাসিক ষাঠ টাকায় একটী বাড়ী ভাড়া করা হইল। একটি চাকর এবং একটি ব্রাহ্মণকে নিকটে রাখিয়া, বাবু সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় কানুনগো মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সমস্ত পরিবারবর্গকে কলিকাতায় পাঠান হইয়াছিল। কয়েকদিন পরে আমার বিদায় মঞ্জুর হইয়া আসিলে আমিও কলিকাতায় গিয়াছিলাম। অস্ত্র চিকিৎসায় দৃষ্টিলাভ না করিতে পারিলে কলিকাতা হইতেই পেন্সনের দরখাস্ত পাঠাইব এই বিবেচনায় অধিকাংশ দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। বড় বড় নামজাদা ডাক্তারদের আনাইয়াও চিকিৎসা সত্ত্বেও শিশুটিকে বাঁচাইতে পারিলাম না। অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ চক্ষু চিকিৎসক (Eye Specialist Col. Maynard) কর্ণেল মেনার্ডের দ্বারা বাম চক্ষু অস্ত্র করান হইল এবং ভগবানের অপার করুণায় দৃষ্টি-লাভও হইল। বন্ধুবর ডাক্তার অভয় কুমার সেনের মধ্যম পুত্র

সুরেন্দ্র কুমার সেন সেই সময় কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, ইনি বিলাত হইতে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কয়েকটী উপাধিসহ উচ্চদরের ডাক্তার হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি এই সময় প্রতিদিন আমার বাসায় আসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। বন্ধুবর দেবেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক, কর্পোরেসন ষ্ট্রীট নিবাসী স্বর্গীয় বন্ধু নরেন্দ্র নাথ কুমার প্রভৃতি অনেকেই সর্ব্বদা আমাকে দেখিতে আসিতেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার কে, বি, দত্ত, একজীকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার মিঃ শ্রীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মুন্সেফ কিরণ চন্দ্র মিত্র, এবং অন্যান্য অনেক-গুলি পরিচিত বন্ধু বান্ধব সর্ব্বদাই দেখিতে আসিতেন। তমলুক সবডিভিসান হইতে অনেকেই ডাব, নারিকেল, তরকারী, মৎস্য, উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন প্রভৃতি ঐ সময়ের মধ্যে অনেকবার পাঠাইয়া দিয়া-ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ রায়, বাবু উপেন্দ্র নাথ মাইতি, বাবু উমেশ চন্দ্র ভঞ্জ প্রভৃতি কয়েকজনের নামই উল্লেখযোগ্য। ভ্রাতুষ্পুত্র রাধিকা প্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ সেই সময় প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের বাসায় আসিয়া রাত্রি-যাপন করিত। আমরা কলিকাতায় আসিয়াছি শুনিয়া রাধিকা প্রসাদের মাতুল পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী (চাকরীর চেষ্টায়), স্বর্গীয়া পিতৃব্য পত্নী, স্বর্গীয়া কনিষ্ঠা শ্বশ্রূঠাকুরাণী, শ্যালক পরেশ নাথ এবং দিগনগরের প্রতিবেশীদের মধ্যে দুই একজন আসিয়া কলিকাতায় আমার বাসায় কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। বাসাটী বেশ গুলজার হইয়াছিল, জলের ন্যায় অর্থব্যয়ও হইয়া-

ছিল। যাহা হউক, করুণাময়ী জগন্মাতার কৃপায় চক্ষের দৃষ্টিলাভ করিয়া মনের আনন্দে অর্থব্যয়ের দিকে একেবারেই দৃষ্টিপাত করি নাই, কোন্ কালেই বা করিয়াছি !

বিদায় শেষ হইলে তমলুক প্রত্যাগমন করিয়া ১৯০৯ সালের ১লা ডিসেম্বর পুনরায় কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম। তমলুকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বর্গভীমা দেবীর পূজা দিয়া নগরের অনেকগুলি ব্রাহ্মণ. সজ্জন, দীন দরিদ্র এবং মহিলাবর্গকে ভোজ দেওয়া হইয়াছিল। কয়েকজন অন্ধকে কম্বল, পরিধেয় বস্ত্রাদি দান করিয়া পরিতোষরূপে আহারাদি করান হইয়াছিল। আমার পুনরায় তমলুক প্রত্যাগমনে সবডিভিসনবাসী আবালবৃদ্ধবিণতা ছোট বড় সকলেরই আনন্দ হইয়াছিল। প্রমথ নাথের শিশু পুত্রটীর চিকিৎসা, নিজের চক্ষু চিকিৎসা, কলিকাতায় সপরিবারে প্রায় দুই মাস কাল বাস, অভ্যাগত, আত্মীয়, বন্ধুদের অভ্যর্থনা ও আহারাদির ব্যবস্থা, তমলুক হইতে কলিকাতা যাতায়াতের খরচ, পূজা, দান, ধ্যান, ভোজ প্রভৃতি বিষয়ে অন্যূন প্রায় ষোল শত টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই টাকার অধিকাংশই তমলুকে সঞ্চিত হইয়াছিল। তিন চারি শত টাকা মাত্র ঋণ করিতে হইয়াছিল।

মেদিনীপুরের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর মিঃ মার মহোদয়ের ব্যবহারাদি সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে। একটী প্রকাণ্ড জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তার অবিমৃষ্য-কারিতার ফলে নিরীহ নির্দ্দোষ লোকও কিরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়

পড়িয়া নির্য্যাতিত হইয়াছিল, তাহার একটী মাত্র উদাহরণ লিপি-বদ্ধ করিতেছি।

বিজয় কান্ত ঘোষ তমলুক সবডিভিসনের নায়েব নাজীর। তাঁহার বিরুদ্ধে জাল নোট চালাইবার মোকদ্দমা পুলিস কর্ত্তৃক স্থাপিত হইল। প্রমাণাদি গ্রহণে দেখিলাম বিজয়কে কিছুতেই দোষী সাব্যস্ত করিতে পারা যায় না; সুতরাং তাহাকে অব্যাহতি দিয়াছিলাম। ইহার পূর্ব্ব হইতেই নেজারতের সঙ্গে পুলিসের কি একটা কারণে মনোমালিন্য চলিতেছিল। পুলিসের আশা ছিল এই মোকদ্দমায় বিজয়কে দায়রা সোপর্দ্দ করা হইবে, এবং সেসন কোর্টে সে সাজা পাইবে। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না দেখিয়া ইন্‌সপেক্টার নগেশ ভায়া পুলিসের কর্ত্তার নিকট কনফিডেনসিয়াল (Confidential) রিপোর্ট প্রেরণ করেন। পুলিস সাহেব সেই রিপোর্ট নিজ মন্তব্যসহ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মার মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর আমার নিকট হইতে উক্ত মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজপত্র তলব করিয়া, আমার বিচার বিবেচনার (finding) উপর কতকগুলি অযথা দোষারোপ করিয়া, বিজয়কে "undoubted criminal" আখ্যা দিয়া মোকদ্দমাটী দায়রা সোপর্দ্দ করিবার আদেশ দেন। কি করি উপরওয়ালার হুকুম তামিল করিতেই হইবে; বিজয়কে দায়রা সোপর্দ্দ করা হইল। দায়রা সোপর্দ্দের হেতু grounds of commitment লিখিলাম জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অনুসারেই বিজয় কান্তকে দায়রা সোপর্দ্দ করা হইল। আমার

নিজের যে অভিমত, তাহা আমার রায় পড়িলেই প্রকাশ পাইবে। জজ বাহাদুর প্রমাণাদি গ্রহণের পর বিজয়কে মুক্তি দিলেন। যে যে কারণ ও যুক্তি দেখাইয়া আমি বিজয়কে মুক্তি দিয়াছিলাম, ঠিক সেই সকল এবং আরও দুই চারিটী যুক্তির বলেই জজ বাহাদুর তাহাকে খালাস দিয়াছিলেন। অধিকন্তু পুলিসের উপর এবং কয়েকটী সাক্ষীর প্রতি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট মার সাহেব মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলেন। বিলক্ষণ অপ্রস্তুত হইলেও আর কোনদিকে কিছু না করিতে পারিয়া অতঃপর একটী "ডিপার্টমেণ্টাল" (departmental proceeding) তদন্তের পর বিজয়কে চাকরী চ্যুত করিলেন। বিজয় নিম্ন আদালতের এবং জজ বাহাদুরের রায়ের নকল আনাইয়া কমিশনার বাহাদুরের নিকট ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিল। কমিশনার বাহাদুর সমস্ত কাগজ পত্র দেখিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ রদ করিয়া বিজয়কে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং তাহার প্রাপ্য সমস্ত বেতন তাহাকে দিবার আদেশ দিলেন। বিজয় মাসিক পনর টাকা বেতন পাইতেছিল। সেই সময় কাঁথি মহকুমায় ত্রিশ টাকা বেতনের একটী চাকরী খালি হওয়ায় বিজয়কে সেই পদে নিযুক্ত করিয়া কাঁথিতে বদলী করিয়া দিলেন। কথায় বলে, "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে" এই মহাসত্যের সার্থকতা বিজয় ঘটিত ব্যাপারে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন হইল।

এই প্রসঙ্গে একটী আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ করিতে হইতেছে।

মোকদ্দমায় অব্যাহতি পাইলে বিজয় মা বর্গভীমার পূজা দিবার মানসিক করিয়া রাখিয়াছিল এবং একটী নিখুঁত কৃষ্ণবর্ণ ছাগ ক্রয় করিয়াছিল। যেদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে বিজয় দায়রা সোপর্দ্দ হইল, সেইদিন পাঁঠাটী অদৃশ্য হইল, নানা অনুসন্ধানেও পাওয়া যায় নাই। আবার যেদিন জজ সাহেবের:বিচারে মুক্তি লাভ করে, তারযোগে এই সংবাদ তমলুকে আসিবার কিছু পূর্ব্বে পাঁঠাটী আপনি কোথা হইতে আসিয়া বিজয়ের বাসার সম্মুখে হৃষ্টমনে চরিতে লাগিল। বিজয়ের প্রতিবেশীনী একটী বৃদ্ধা এই ব্যাপারটী অনেকের গোচর করেন। এবং ছাগটী দেখাইয়া কহেন, "মা বিজয়ের প্রার্থনা শুনিয়াছেন, বিজয় নিশ্চয়ই খালাস. হইবে, তোমরা এখনই সংবাদ পাইবে।" কিছুকাল পরেই বিজয়ের মুক্তিলাভ সংবাদ তারযোগে আসিয়া বৃদ্ধার বচন সার্থক করিয়াছিল। বোধ হয় অনেকেই এই ব্যাপারটী বিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু এটি ধ্রুব সত্য। নির্দ্দোষ, নিরীহ ভদ্রসন্তান বিজয় কান্তের মুক্তিলাভে পুলিস কর্ম্মচারী এবং আরও দুই তিনটী লোক ব্যতীত তমলুকবাসী সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বি, এন, রেলওয়ের হিন্দু কর্ম্মচারীবর্গ কোলাঘাট ষ্টেসনে দুর্গোৎসব করিবার সঙ্কল্প করিয়া আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। আমি তাঁহাদের এই সাধু সঙ্কল্প সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিয়া নিজে কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া, সবডিভিসনের অন্তর্গত রাজা, জমিদার এবং অন্যান্য সঙ্গতিপন্ন ভদ্রলোকদিগের সাহায্য প্রার্থনার পত্র লেখায় সকলেই আহ্লাদ সহকারে অর্থ

সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত কেহ আতপ চাউল, কেহ ঘৃত, কেহ নারিকেল, কেহ বা কাষ্ঠ, কদলী ও কদলীপত্র, কেহ বা বলির পাঁঠা প্রভৃতি পূজার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। একটী দরিদ্র বৃদ্ধা চারিটী কুষ্মাণ্ড আনিয়া প্রতিমার সম্মুখে রাখিয়াছিলেন। এই পূজার বিবরণ উপলক্ষ করিয়া একজন স্থানীয় পণ্ডিত একটী নাতি দীর্ঘ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কবিতাটি আমার মনে নাই। কেবল নিম্নলিখিত কয়েক লাইন মনে পড়ায় তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম ঃ—

"কো দদাতু ছাগ শিশু সযত্নং
হবিস্তণ্ডুলং কোঽপি বা
সমিৎ খণ্ডং অখণ্ডমর্থং
কুষ্মাণ্ড চতুষ্টয়ং কঃ।"

আশাতীত অর্থ সাহায্য এবং পূজার অন্যান্য উপকরণ পাইয়া বেশ একটু ধূমধামের সহিত রেলওয়ে কর্ম্মচারীবর্গ মায়ের পূজার আয়োজন করিয়াছিলেন। মহাষ্টমীর দিন কাঙ্গালীদিগকে চিড়া মুড়কি, দধি ও মিষ্টান্নের দ্বারা পরিতোষরূপে আহার করান হইয়াছিল। পূজার বন্ধের মধ্যে, পিতৃব্যপুত্র শ্রীপতি তমলুকে আসিয়া দুই চারিদিন আমার নিকট থাকিবে এইরূপ প্রস্তাব ছিল। কোলাঘাটে ঐদিন কাঙ্গালী ভোজনের সময় যে প্যাসেঞ্জার ট্রেণ সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই ট্রেণেই শ্রীপতি ছিল। আমি ষ্টেশনে উপস্থিত আছি শুনিয়া সেইখানেই শ্রীপতি অবতরণ করিয়াছিল। পরদিন কোলাঘাট হইতে রঘুনাথপুরের মহান্ত মহারাজের নিমন্ত্রণ

রক্ষার জন্য সেখানে একদিন অবস্থিতি করিয়া তমলুকে ফিরিয়াছিলাম। অনেক দিন পরে দুই ভাই একত্রে কয়দিন আনন্দে কাটাইয়াছিলাম।

এই বৎসর শারদীয়া মহাপূজা ১০ই অক্টোবর তারিখে আরম্ভ হয়। ইচ্ছা ছিল পরিবারবর্গকেও ঐ সময় কোলাঘাটে লইয়া যাইব, কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটে নাই। প্রথমতঃ ১লা নভেম্বর হইতে অবসর গ্রহণ করিতে পারিব, ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর এইরূপ আশা দিয়াছিলেন। অন্যদিকে বধূমাতা তখন প্রায় আসন্নপ্রসবা। এই সময় তাঁহাকে দিগনগরে অথবা চক্রধরপুরে পাঠাইয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু সে সময় পত্রাদি লিখিয়া সংবাদ পাইলাম যে দিগনগরে তখন ম্যালেরিয়া পূর্ণ মাত্রায় নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সুতরাং পাচক ব্রাহ্মণ এবং দুই একটি চাকরকে আপনার নিকট রাখিয়া আর সকলকে চক্রধরপুরে পাঠান হইল। ১লা নভেম্বর হইতে অবসর গ্রহণ করা একরূপ স্থির হওয়ায়, সেপ্টেম্বর মাস হইতেই আমাকে বিদায়ী ভোজ দেওয়া আরম্ভ হইয়াছিল। কার্য্যগতিকে আরও দুই চারি মাস কাল তমলুকে থাকিতে হইয়াছিল। ১৯১১ সালের ২রা মার্চ্চ তারিখে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই কয়মাসের মধ্যে সর্ব্বসমেত ৫২টী বিদায়ী ভোজ হইয়াছিল। তাহার মধ্যে মহিষাদলের দুই রাজার দুইটী বিদায়ী ভোজ, বাবু রজনী কান্ত ঘোষ ও রসময় সিংহ উকীল, পুলিস বিভাগ, আবগারী বিভাগ এবং কুঁকড়াহাটীর নিকটবর্ত্তী রামপুর নিবাসী বাবু পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়দিগের প্রদত্ত

ভোজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক ভোজের অঙ্গস্বরূপ ইংরজী, বাঙ্গালা অথবা সংস্কৃত ভাষায় বিদায়ী অভিনন্দন পাঠ করা হইয়াছিল। সেগুলি এখন পর্য্যন্ত আমার নিকট আছে। মিউনিসিপাল কমিশনারগণও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তাঁহারাও একটী সংক্ষিপ্ত সুন্দর অভিনন্দন পত্র ইংরাজীতে রেশমী কাপড়ের উপর ছাপাইয়া রৌপ্য নির্ম্মিত কৌটায় করিয়া উপহার দিয়াছিলেন।

কটকের অন্তর্গত যাজপুর মহকুমার সবডিভিসনাল অফিসার রায় পূর্ণচন্দ্র মৌলিক বাহাদুর আমার অবসর গ্রহণের পর তমলুকের ভার পাইবেন স্থির হইয়াছিল। গেজেটও হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পদে যিনি যাজপুর যাইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছিল, তিনি বিহার প্রদেশে সেই সময় কি একটা বিশেষ কাজে নিযুক্ত থাকায়, তাঁহার শীঘ্র যাজপুরে আসিবার সম্ভাবনা ছিল না। সেইজন্য রায় বাহাদুর পূর্ণবাবু যাজপুরে আপাততঃ রহিলেন। আমিও তমলুকে বসিয়া বিদায়ী ভোজ খাইতে লাগিলাম। নভেম্বর মাসে বধূমাতা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন সংবাদ পাইলাম। প্রমথ নাথ তাহাদিগের তত্ত্বাবধান জন্য আপাততঃ খড়্গপুরের ডিসপেন্সারী একরূপ বন্ধ করিয়া চক্রধরপুরে অবস্থিতি করিতেছিল। চক্রধরপুরের তৎসাময়িক রেলওয়ের আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন ডাক্তার শ্রীচরণ দে, ডাক্তার জহরুল্লা বিশ্বাস, কেরা ষ্টেটের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত করালী চরণ বিশ্বাস প্রভৃতি মহোদয়গণ প্রকৃত আত্মীয়ের ন্যায় দেখাশুনা করিতেছিলেন। সে সম্বন্ধে

আমার চিন্তার কোন কারণ ছিল না। এদিকে ব্রাহ্মণী নিকটে না থাকায় নানারূপ অসুবিধাও হইতেছিল। কতদিনে অবসর গ্রহণ করিতে পারিব তাহাও অনিশ্চিত। এই সকল ভাবিয়া এবং ভোজগুলি একাই খাইব, ব্রাহ্মণী কি তাহার ভাগ পাইবেন না, এই সকল বিবেচনায় জানুয়ারী (১৯১১) মাসের প্রথম ভাগেই তাঁহাকে তমলুকে আনা হইল। তাঁহার "ন্যাং বোট" অর্থাৎ প্রমথ নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাত নাথ সঙ্গেই আসিয়াছিল। এই ছেলেটী তাহার পিতামহীর বড়ই প্রিয় ছিল। এইরূপে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী নানারূপ আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত হইল। কোন সময় কে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইবেন এবং তৎক্ষণাৎ চার্জ্জ লইতে চাহিবেন এই ধারণায় পোঁট্‌লা পুঁট্‌লী বাঁধিয়া সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতাম। সেই সময় ভোজও চলিতে লাগিল। রাজকার্য্য যথাশক্তি সম্পাদন করিতে লাগিলাম। যাহা ভাবিয়া ছিলাম তাহাই হইল। ১৯১১ সালের ১লা মার্চ্চ তারিখে টেলিগ্রাম পাইলাম যে বাবু শশীভূষণ বসু ২রা মার্চ্চ তারিখে তমলুকে উপস্থিত হইয়া চার্জ্জ লইবেন। এই সংবাদ পাইবা মাত্রই একখানি উটের গাড়ী তমলুক হইতে পাঁশকুড়া পর্য্যন্ত ভাড়া করিয়া, গাড়ীখানি রাত্রিকালেই বাংলোর নিকট আনিয়া রাখা হইল। পাঁশকুড়া হইতে চক্রধরপুর পর্য্যন্ত একটী ২য় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করিবার জন্য কলিকাতায় টেলিগ্রাম করা হইল। পরদিন (১৯১১ ৩রা মার্চ্চ) প্রাতেই শশী বাবু উপস্থিত হইয়া চার্জ্জ গ্রহণ করিলেন। আমরা তৎপূর্ব্বেই প্রাতরাশ সমাধা

করিয়াছিলাম। পথের সম্বল লুচি, তরকারী, মিষ্টান্ন প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে সঙ্গে লইবার জন্য প্রস্তুত করান হইয়াছিল। কিঞ্চিদধিক ৩৩ বৎসর নানাস্থানে বিভিন্ন বিভাগে ছোট বড় নানা প্রকারের চাকরীর অবসানে গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করা হইল। পুলিস সব-ইনসপেক্টার মৌলবী আজহর উদ্দীন মহম্মদ, মৌলবী সাদত আলী, বাবু মনোমোহন রায় তমলুক হইতে পাঁশকুড়া পর্য্যন্ত আসিয়া আমাদিগকে ট্রেণে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ অৰ্দ্ধপথ নিজের টম্‌টমে আমার সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে আসিয়াছিলেন, প্রত্যাগমন সময়ে অশ্রু বর্ষণ করিলেন। আমারও চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়াছিল। পাঁশকুড়া রেল ষ্টেশনের অদূর-বর্ত্তী প্রতাপপুরের বাংলোয় সাধনপুর নিবাসী বাবু উপেন্দ্র নাথ মিশ্র জমিদার আমাদের জন্য প্রচুর আহার্য্য প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন, তমলুকে যে কয়টী গাভী বৎস ছিল, পত্নীর ঐকান্তিক অনুরোধে সেগুলিকেও সেইদিন চক্রধরপুরে পাঠান হইল। তমলুক হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁশকুড়া পর্য্যন্ত (১৬ মাইল) কয়েকটী বৰ্দ্ধিষ্ণু গ্রামের হিন্দু মুসলমান অনেকগুলি ভদ্রলোক আমার প্রিয় তরকারী যথা :—মোচা, থোড়, মানকচু খাম আলু, নারিকেল এবং বৃহৎ বৃহৎ রোহিৎ ও কাতলা মাছ, কেহ কেহ বা উৎকৃষ্ট গৃহজাত দধি এবং মিষ্টান্ন প্রচুর পরিমাণ উপহার সহ রাস্তার ধারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কেবল সেগুলির ভাড়াই "Fresh Fruits and Perishable" লেবেল

সত্ত্বেও সাত টাকা দিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে চক্রধরপুরে উপস্থিত হইয়াই সেই রাত্রিতে "perishable" উপহারগুলির সদ্ব্যয় হইয়াছিল। সে সময় বম্বেগামী মেল ট্রেণ সন্ধ্যা ৬টার সময় চক্রধরপুরে আসিত। পূর্ব্বপরিচিত অনেকগুলি ভদ্রলোক এবং নবাগত অনেকগুলি, পুলিসের সব-ইন্‌সপেক্টার এবং অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মচারীবর্গও বোধ হয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সহিত যথাবিহিত আপ্যায়ন ও সৌজন্য বিনিময়ের পরে বাসায় আসিয়াও দেখিলাম, বাহিরের বারাণ্ডাটী লোকপূর্ণ। দুই দশ মিনিটে আপ্যায়ন ও সৌজন্যের কাজ সমাধা করা হইল। যাঁহাদের সঙ্গে একটু বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, এইরূপ কয়েকজনকে সেই রাত্রিতেই আহারের নিমন্ত্রণ করা হইল। পত্নী হেমাঙ্গিনী, গোপাল ঠাকুর এবং পাচক ব্রাহ্মণ বিশেষ পরিশ্রমে রাত্রি দশটার মধ্যেই নানাবিধ উপাদেয় আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া যত্ন সহকারে সকলকেই আহারাদি করাইয়াছিলেন। অতঃপর একটা নূতন জীবন আরম্ভ হইল। নূতন জীবনের কথা এই আখ্যায়িকার দ্বিতীয় খণ্ডে সংক্ষেপে বিবৃত করা হইবে। তমলুক সংক্রান্ত অনেকগুলি বিষয় এখনও লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। তাহার মধ্যে দুই চারিটি নিম্নে লিখিত হইল।

উৎসব ও মেলা (Festivals and Fairs etc.) :— নিজ তমলুক সহরে সেরূপ উল্লেখযোগ্য উৎসব সে সময় দেখি নাই। তমলুকের নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা বা অন্যান্য প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ। ঐ সকল পূজার সময় মা বর্গভীমারই পূজা

একটু আড়ম্বরের সহিত হইয়া থাকে। পৌষ সংক্রান্তিতে মায়ের মন্দিরের সম্মুখস্থ পাকা রাস্তার দুই পার্শ্বে মিষ্টান্ন, খেলনা, কাপড়, বাসন, পাটী প্রভৃতির অনেক দোকান বসে। সবডিভিসনের এবং বাহিরের অনেক লোক ঐ সময় তমলুকে আসিয়া মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী খালে পুণ্য সঞ্চয় মানসে (পূর্ব্বে রূপনারায়ণ নদই এই স্থানে প্রবাহিত হইত) স্নান করিয়া থাকে।

রথযাত্রার সময় মহিষাদলে অষ্টাহকাল ব্যাপী, মাঘী পূর্ণিমার সময় লক্ষ্যা নামক এক গ্রামে এবং শিবচতুর্দ্দশীতে রায়াপাড়া নামক স্থানে মেলা বসিয়া থাকে। মহিষাদলের এবং লক্ষ্যার মেলাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া, চব্বিশ পরগণা, কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে সেই সকল স্থানের বিশেষ বিশেষ পণ্যদ্রব্য, ফলমূল, কলমের চারা, বস্ত্র, পিত্তল, কাঁসার ও পাথরের বাসন, দা, কাটারী বঁটী, কোদালি, কুড়াল প্রভৃতি গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী লোহার জিনিষ, আবার বিলাতী এনামেল, এলুমিনিয়ম ও চায়না এবং কাচের বাসন ; নানাবিধ বিলাতী, জাপানী ও দেশী চিত্রের ছবির দোকান বসিয়া থাকে। মহিষাদলের রথযাত্রার মেলায় যেরূপ আনারস, ফজলী, ল্যাংড়া, এবং নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট আমের ছোট ছোট পর্ব্বত দেখিয়াছিলাম, এরূপ আর কোথাও দেখি নাই। মেলার মধ্যে অন্ততঃ তিন চারিদিন মহিষাদলে থাকিতে হইত (on duty)। রাজা বাহাদুরের স্থাপিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের উপরতলার দুই তিনটী ঘর, স্নানাগার প্রভৃতি তৎসাময়িক সব-

ডিভিসনাল অফিসারের ব্যবহারের জন্য সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইত। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সবডিভিসনাল অফিসার রাখাল বাবু এই আটদিনই মহিষাদলে থাকিতেন। প্রয়োজন হইলে এক এক দিন দুই চারি ঘণ্টার জন্য তমলুকে আসিতেন। স্কুল ঘরের উপরকার একটী সুপ্রশস্ত হলে ফরাস পাতা হইত। স্থানীয় এবং স্থানান্তর হইতে সমাগত গায়ক, সেতারীবর্গকে লইয়া সন্ধ্যার পর দুই চারি ঘণ্টা কাটাইতাম। কোন কোন বৎসর স্বনামখ্যাত রহস্য-রসিক চিত্তরঞ্জন গোস্বামী এবং ঐ শ্রেণীর অন্যান্য লোকও আসিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। কোন কোন সময় উচ্চদরের কীর্ত্তনের ও ঢপের দলও আসিত। বায়স্কোপ, ম্যাজিক, সার্কাস প্রভৃতির ত কথাই নাই। তারপর এই কয়টা দিন রাজা বাহাদুরের কৃপায় উদর দেবের পূজাটা বিহিত বিধানেই হইত।

লক্ষ্যার মেলা আরম্ভ হইত মাঘী পূর্ণিমার দিন। এক সপ্তাহ কাল প্রায় মহিষাদলের রথযাত্রার মেলার ন্যায় উৎসব হইত। স্থানীয় জমিদার স্বর্গীয় উপেন্দ্র নাথ মাইতি মহাশয়ের গৃহদেবতার রাসযাত্রা উপলক্ষেই এই উৎসব হইত। উপেন্দ্র বাবুর একটী সুন্দর দ্বিতল বৈঠকখানা বাড়ীর উপরে আমাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত। এই উৎসবের একটু বিশেষত্ব এই ছিল যে মহিষাদলের মেলায় কেবল সবডিভিসনাল অফিসার, পুলিস কর্ম্মচারী, ষ্টেটের উকীল এবং আরও দুই চারিটী ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইতেন, কিন্তু উপেন্দ্র বাবু তমলুকের যাবতীয় কর্ম্মচারী, উকীল, আমলা এবং

গণ্যমান্য সমস্ত ভদ্রলোকদিগকেই নিমন্ত্রণ করিতেন এবং নিজের তত্ত্বাবধানে নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য প্রস্তুত করাইতেন। সাময়িক ফলমূল, উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন প্রভৃতি কলিকাতা হইতে আনাইতেন। তাঁহার বাটীতে যেরূপ ওলের ডাল্না খাইয়াছিলাম, সেরূপ আর কোথাও দেখি নাই। দুই ইঞ্চি দীর্ঘ, দুই ইঞ্চি প্রস্থ এবং এক ইঞ্চি উচ্চ বরফির আকারে ওল কুটিয়া তাহাকে এরূপভাবে রন্ধন করাইতেন যে ওল বলিয়া বুঝিতে পারা যাইত না। ভিন্ন ভিন্ন পুষ্করিণীতে বিভিন্ন জাতীয় মৎস্য যথা ঃ—ভেট্‌কি, খরসুল, গলদা চিংড়ী, খয়রা, রোহিত, কই, মাগুর প্রভৃতি রাখা হইত। এই সকল মৎস্য ধরিয়া অতি উচ্চদরের বিভিন্ন প্রণালীতে রন্ধন করাইতেন।

তারপর রায়াপাড়ার মেলা। শিবচতুর্দ্দশীতে এই মেলা বসিত। তিনচারি দিন ব্যাপী উৎসব হইত, নানাস্থান হইতে আসিয়া দোকান পাট বসিত। সিদ্ধেশ্বর নামক মহাদেব এবং তাঁহার মন্দিরের অদূরবর্ত্তী সিদ্ধেশ্বরী নামক মহাদেবী কালীমাতার অতি প্রাচীন মন্দিরের চারিদিক বেষ্টন করিয়া এই মেলা বসিত। শিবচতুর্দ্দশীর ব্রতাচারী সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন নরনারী দলে দলে দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া নানা উপচারে ভগবান মহাদেবের পূজা করিতেন। সেই সময় প্রায় সমস্ত রাত্রিই স্তোত্র পাঠ, শিব সংকীর্ত্তন হইত। ধূপ, ধুনা এবং হোমের গন্ধে সমস্ত পল্লীটী আমোদিত হইত। প্রকৃতই এটী দেখিবার উপযুক্ত উৎসব। আমার ন্যায় মহাপাতকী পাষাণ-হৃদয় লোকের মনেও সেই দৃশ্য দেখিয়া

ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হইত। আমি এবং আমার সঙ্গী তুই চারিজন কর্ম্মচারী প্রায় তুইদিন মহান্ত মহারাজের কৃপায় বেশ আনন্দেই কাটাইতাম। এখানে মহিষাদলের রাজা বাহাতুরদিগের একটী কাছারী বাড়ী এবং নায়েব থাকায়, রাজাদের পক্ষ হইতেও তুই একজন কর্ম্মচারী কিছু কিছু উপহার সহ আসিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিতেন।

বাহিরের লোক আমার ক্ষুদ্র জীবনের এই আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই বলিবেন লোকটা বড়ই উদরপরায়ণ ছিল। কোথায় কিরূপ আহারের আয়োজন, কোথায় কিরূপ জলযোগের ব্যবস্থা, কোথায় কি মৎস্য, কোথায় কি মিষ্টান্ন, দধি, তুগ্ধ ক্ষীর, ছানা পাওয়া যাইত, সেই সকল বিবরণেই আখ্যায়িকার অনেকটা স্থান পূর্ণ করিয়াছেন। ইহার উত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি যে ১৯২৯ সালে আখ্যায়িকাটী নূতন ধরণে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। বয়স এখন ৭৯ বৎসর। অন্য কোন ভোগবাসনা নাই। কেবল যাহাকে মেয়েলী কথায় বলে "ভাল মন্দ খাইতে ইচ্ছা হয়," আমিও সেই অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি। সেই জন্যই আহার বিষয়ক বিবরণেই অনেকটা স্থান জুড়িয়া গিয়াছে। চাকরীর আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোন স্থানে কিরূপ আহার্য্য পাওয়া যাইত তাহা এখন মনে পড়িতেছে। আবার ভাবিতেছি ভগবান যদি এই জীবনে আর একবার সেই সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আসিবার শক্তি এবং উপযুক্তরূপ অর্থ দেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া একটী ভৃত্য সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়ি।

তমলুকে অবস্থিতি সময়ে স্থানীয় বিশিষ্ট, বিশিষ্ট যে সকল রাজকর্ম্মচারী, জমিদার এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগের সহিত বিশেষরূপ পরিচয় হইয়াছিল তাঁহাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইল:—পাঁশকুড়ার সবরেজিষ্ট্রার কৃষ্ণানন্দ দাস, আখ্যায়িকার ২য় পরিচ্ছেদে যে ব্রজনাথ দাসের কথা উল্লেখ করিয়াছি ইনি সেই ব্রজনাথ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। এরূপ বিনয়ী, সচ্চরিত্র, নম্র-স্বভাব বিশিষ্ট ভদ্রলোক অতি অল্পই দেখিয়াছি। মহিষাদলের সব-রেজিষ্ট্রার যতীন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহার পিতা ডেপুটী কালেক্টর বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসিষ্ট্যাণ্ট রূপে মেদিনীপুর সদরে সব-ডেপুটী অবস্থায় কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলাম। কোন উৎসব উপলক্ষ ভিন্ন রাজকার্য্য উপলক্ষে মহিষাদলে গেলে অনেক সময় ইনি ও ইঁহার পত্নী আমাকে অতি যত্নের সহিত আহারাদি করাইতেন। প্রমথ নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাত নাথের বিদ্যারম্ভের সময় উপস্থিত হইলে, আমি সপরিবারে ইঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া মহিষাদলাধিপতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভা পণ্ডিতের দ্বারা প্রভাত নাথের "হাতে খড়ি" দেওয়াইয়া ছিলাম। তাহার ফলে প্রভাত নাথ কিরূপ পণ্ডিত হইয়াছিলেন যথাস্থানে তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ দিবার ইচ্ছা আছে। শান্তিপুর নিবাসী স্বর্গীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বিপিন বিহারী প্রামাণিকের পুত্র আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন ডাক্তার তেজচন্দ্র প্রামাণিক (ইনি এখন সিভিল সার্জ্জেন পদে উন্নতি লাভ করিয়াছেন)। তাঁহার পরবর্ত্তী কলিকাতাবাসী আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন ডাক্তার কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেক-

গুলি পুলিস কর্ম্মচারীও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। ইহাদের মধ্যে মুন্সী অজহর উদ্দীন আহম্মদ, প্রভাষ চন্দ্র রায়, মহিম চন্দ্র মজুমদার, প্রতাপ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মনোমোহন রায় প্রভৃতি কয়েকজনের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জমিদারদিগের মধ্যে মহিষাদলাধিপতি রাজা সতী প্রসাদ গর্গ, তৎসহোদর গোপাল প্রসাদ গর্গ, তাঁহাদের ভগ্নীপতি এবং ষ্টেটের দেওয়ান প্রভাত চন্দ্র দোবে, তমলুকের রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ রায়, ময়নাগড়ের রাজা সচ্চিদানন্দ বাহুবলীন্দ্র, তৎসহোদর পূর্ণানন্দ বাহুবলীন্দ্র। সম্ভ্রান্ত জমিদার, পত্তনীদার এবং চাষীদিগের মধ্যে কল্যাণ চক নিবাসী ভবতারণ পাহাড়ী, হরিচক নিবাষী বাবু যোগেন্দ্র নাথ কর ও তৎসহোদরবর্গ, লক্ষ্যার বাবু উপেন্দ্র নাথ মাইতি, ইচ্ছাপুর নিবাসী বাবু মহেশ চন্দ্র গিরি, মধ্যহিংলী নিবাসী বাবু যোগেন্দ্র নাথ মিত্র, বেণীমাধব দত্ত ও তৎসহোদর মণীন্দ্র নাথ দত্ত, ভূপতি-চক নিবাসী বাবু ত্রিলোচন ভূঞ্যা, পার্ব্বতীপুরের বাবু ভূতনাথ প্রামাণিক, কুকড়াহাটী রামপুর নিবাসী বাবু পূর্ণ চন্দ্র মণ্ডল, আসনান নিবাসী কুমেদা চরণ দাস, রঘুনাথপুরের মহান্ত রামতারক দাস, রায়াপাড়ার মহান্ত অক্ষয় কুমার গিরি, কেলোমাল নিবাসী নরেন্দ্র নাথ সরকার ও তৎপুত্র মন্মথ নাথ সরকার, নাটশাল নিবাসী বাবু যোগেন্দ্র নাথ মাইতি ও তৎসহোদরগণ, নন্দীগ্রাম নিবাসী বাবু বীর নারায়ণ জানা, চংসরপুর নিবাসী মুন্সী নাবিরুদ্দিন ও তৎসহোদরগণ। যখন সব-ডিভিসনাল অফিসার ছিলাম তখন ছোট বড় সকলেই খাতির করিবেনই। কিন্তু সব-

ডিভিসনের সঙ্গে সম্বন্ধ পরিত্যাগের পরও যাঁহারা অনেকদিন পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই প্রকৃত মানুষ এবং তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা, ভক্তি ভালবাসাকেই অকৃত্রিম বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ রায়, বাবু ভূতনাথ প্রামাণিক, বাবু কুমেদা চরণ দাস, বাবু পূর্ণ চন্দ্র মণ্ডল, সব-রেজিষ্ট্রার মৌলবী হাতিফ আলী উল হোসেনী, মুন্সী নবীরুদ্দিন, উকীল বাবু রজনী কান্ত ঘোষ, ভীমা চরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীপতি বসু, শরৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু দুর্গারাম বসু, বাবু উমেশ চন্দ্র ভঞ্জ প্রভৃতি মহোদয়গণের নামই চিরদিনই মনে থাকিবে। আবার ইহাও দেখিয়াছিলাম, যাঁহারা সে সময় প্রায় ছায়ার ন্যায় আমার অনুসরণ করিতেন, বন্ধুভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কয়েক মাসের মধ্যেই একেবারে রূপান্তর ধারণ করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর লোকদিগকে সময়-সেবক, শক্তি-সেবক ও কপটাচারী আখ্যা প্রদান করিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না।

কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর কাল তমলুকে অবস্থিতি সময়ে জগজ্জননী বর্গভীমা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটী নগণ্য মানুষের হাত দিয়া তমলুক মহকুমার যে সকল উপকার সাধন করাইয়াছিলেন, নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

১। প্রথমেই বলিতে হইবে, নিজের উন্নতি, উপরিস্থ কর্ম্মচারী-বর্গের সুখ্যাতি এবং "রায় বাহাদুর" উপাধি পাইবার আশা অম্লান বদনে পরিত্যাগ করিয়া, পুলিস ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরক্তি ও

বিরাগ ভাজন হইয়াও পুলিসের কবল হইতে সবডিভিসনের অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোককে মুক্তি প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। অকারণ বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগের ঘর বাড়ী খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার একেবারে বন্ধ করিয়াছিলাম। বেনামী চিঠিপত্র এবং দরখাস্ত লিখিত বোমা প্রস্তুতের গ্রাম ও গুপ্তস্থানগুলি ছদ্মবেশে দেখিয়া শুনিয়া ঐ সকল চিঠি পত্রের অলীকত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলাম। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, বিবাদ, বিসম্বাদ যে ইহাব অন্যতম কারণ, সেই সঙ্গে স্বার্থান্ধ কয়েকটী পুলিস কর্ম্মচারীদিগের সহযোগেই যে এই সকল চিঠিপত্র আসিতেছিল তাহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাহার পর হইতে ঐরূপ চিঠিপত্র, দরখাস্ত আদি আসিলে তৎক্ষণাৎ ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে (waste paper basket) ফেলিতাম। এই প্রণালী অবলম্বন করায় একটা বিষম উপদ্রব খুব কমিয়া গিয়াছিল। সবডিভিসনাল অফিসারের নিকট এই সকল চিঠিপত্র পাঠাইয়া কোন ফল নাই দেখিয়া, অবশেষে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এইরূপ চিঠিপত্র যাইতে আরম্ভ করিল। একটী মাত্র উদাহরণ নিম্নে লিখিতেছি। একদিন প্রাতে ডাকের চিঠিপত্র খুলিয়া পড়িবার সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বহস্তলিখিত একখানি Confidential পত্রের সঙ্গে তমলুকের দেশীয় খৃষ্টানদের একখানি দরখাস্ত পাইলাম। দরখাস্তের মর্ম্ম এই যে "অমুক তারিখের রাত্রিতে আমাদের অস্থাবর সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইবে। আমাদের যুবতীগণ অপহৃত ও অবমানিত হইবে এবং আমাদের বাস ভবন অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত হইবে। আমাদের রক্ষার

জন্য অস্ত্রধারী বিশেষ প্রহরী (special armed force) পাঠান হউক।" পত্র পাঠ কয়েকজন পুলিস প্রহরী এবং সব-ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কতিপয় ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া খৃষ্টান পল্লীতে উপস্থিত হইলাম। পত্রখানি ম্যাজিষ্ট্রেটকে কে লিখিয়াছিল জিজ্ঞাসা করায় কেহই স্বীকার করিল না। তাহাদিগকে অভয় দিয়া কহিলাম, যদি সত্যই কাহারও কোনরূপ আশঙ্কা থাকে তাহা হইলে আমার বাংলোর সংলগ্ন ঘরগুলিতে (out-houses) তাহারা আসিয়া আশ্রয় লইতে পারে। কিন্তু কেহই আসিল না। আর কোন উচ্চবাচ্যও হইল না। সাহেবকে সমস্ত বিবরণ পরে লিখিব বলিয়া প্রথমে টেলিগ্রাম করিলাম ঃ—"Please rest assured, nothing will happen I am responsible for the peace of my Sub-Division. Report follows." সঙ্গে সঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ যুক্ত একখানি কনফিডেসনসিয়াল রিপোর্ট (Confidential Report) পাঠাইয়াছিলাম। কর্ত্তৃপক্ষের ভীতি উৎপাদক এই ধরণের চিঠিপত্র নন্দীগ্রাম, মহিষাদল এবং অন্যান্য স্থান হইতেও ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গিয়াছিল। আমার নিকট হইতে রিপোর্ট তলবও হইয়াছিল। আমিও যথাযথ রিপোর্ট দিয়াছিলাম। প্রকৃতপক্ষে আমার অবস্থিতি সময়ে স্বদেশী ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে, তমলুক সবডিভিসনের কোনস্থানেই কোনরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামা বা অন্যরূপ উপদ্রব সংঘটিত হয় নাই। ভগবানের অপার মহিমা ইহার মূলীভূত কারণ।

আখ্যায়িকার এই পরিচ্ছেদে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে একটী সভা করিয়া স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগকে স্থানীয় অভাবের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া শীঘ্রই আমার নিকট পাঠাইতে উপদেশ দিয়াছিলাম। তাঁহারাও দুই মাসের মধ্যেই আপন আপন এলাকার তালিকা পাঠাইয়াছিলেন। তাহার পর আর একটী সভা করিয়া ঐসকল তালিকাভুক্ত কাজগুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টী বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং সেইগুলি নির্ব্বাহ করিতে কি পরিমাণ ব্যয় হইবে, তাহার আলোচনা করা হইল। সভাস্থলেই অন্যূন বিশ হাজার টাকা স্বাক্ষরিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুতি মত টাকা সকলেই পাঠাইতে লাগিলেন। একটী কমিটী গঠন করিয়া তাহাদের হাতে সমস্ত কার্য্যের ভার দেওয়া হইল। অবশ্য আমাকে সভাপতি বা প্রেসিডেন্ট মনোনীত করা হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে নিম্নলিখিত কাজগুলি আমার অবসর গ্রহণের পূর্ব্বেই সম্পাদিত হইয়াছিল :—

১। তমলুক নগর হইতে রূপনারয়ণ নদ পর্য্যন্ত একটী সুপ্রশস্ত রাস্তা এবং মধ্যস্থিত খালের উপর একটী সুদৃঢ় সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই কাজটী সম্পন্ন হইলে ষ্টীমার যাত্রীদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। নদের অপর দিক (উলুবেড়িয়া সবডিভিসন) হইতে যে সকল লোক নানাবিধ শাক সব্জী ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রতিদিন বিক্রয়ার্থ তমলুকে লইয়া আসিত, তাহাদেরও অনেক কষ্ট নিবারণ হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত নগরবাসীদের নদীতীরে প্রাতঃ ভ্রমণ, সান্ধ্যভ্রমণ, খেলাধূলা,

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈঠক ও নানাবিধ আলোচনা করিবার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। জনসাধারণ কর্ত্তৃক পুলটীর নাম দেওয়া হইল "যোগেন্দ্র সেতু" "Jogendra Bridge"।

২। শ্রীশ্রী৺বর্গভীমা দেবীর মন্দিরের বহির্দ্দেশে এবং বাজারের মধ্যস্থিত ব্রহ্মা (অগ্নিদেবতা) মন্দিরের প্রাঙ্গণের মধ্যে দুইটী পাকা কূপ (ইঁদারা) প্রস্তুত করাইয়া ঐ দুই স্থানের অধিবাসীদের, বিশেষতঃ পূজা পার্ব্বন উপলক্ষে সমাগত লোক-দিগের, পানীয় জলের অভাব মোচন করা হইয়াছিল। জন-সাধারণ কূপ দুইটীর নাম দিয়াছিলেন "ভীমাকূপ" ও "ব্রহ্মকূপ"। শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে কূপের নাম এবং তাহার নিম্নভাগে আমার নামও খোদাই করিয়া কূপ দুইটীর ইষ্টক নির্ম্মিত বেষ্টনীর গাত্রে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

৩। বিসূচিকা ও বসন্ত রোগাক্রান্ত দরিদ্রদিগের চিকিৎসার জন্য নগরের প্রান্তভাগে একটী পাকা বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, কিলবী (Mr. R. Kilby I. C. S.) মহোদয়ের নামকরণে গৃহটীর নাম হইল "কিলবী ওয়ার্ড" (Kilby Ward)। ঐ নামযুক্ত প্রস্তর ফলকও গৃহের সম্মুখস্থ দেওয়ালের উপরিভাগে যথা নিয়মে বসাইয়া দেওয়া হইল। এই কিলবী মহোদয়ই কুক্কুরের বিষ একটী সামান্য অনুচরের দেহ হইতে চুষিয়া লইয়া নিজের প্রাণ সংশয় করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করায়, বিলাতে ইঁহার নাম হইয়াছিল, The Heroic Magistrate.

৪। তৃণাচ্ছাদিত ছাত্র-নিবাস (Boarding) আগুন লাগিয়া ভস্মীভূত হওয়ায় তৎপরিবর্ত্তে পাকা দেওয়ালের উপর টীনের (corrugated iron) ছাদ যুক্ত একটী সুন্দর সুপ্রশস্ত বাটী নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।

৫। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহটী পড়িয়া যাওয়ায় তৎপরিবর্ত্তে একটী পাকা বাড়ী প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

৬। স্থানীয় হাঁসপাতালে একটি অস্ত্র চিকিৎসার ঘর (Surgical Ward) এবং ডাক্তারের ব্যবহার জন্য ও বিশেষ বিশেষ সভার অধিবেশন জন্য একটী সুপ্রশস্ত পাকা ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঘরটীর নাম হইয়াছিল, 'যোগেন্দ্র হল" "Jogendra Hall"।

৭। পাঁশকুড়ার মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় গৃহটী জরাজীর্ণ হইয়া পতনোন্মুখ হওয়ায় একটী সুন্দর নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই কার্য্যে তদানীন্তন আসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার (পরে একজি-কিউটিব ইঞ্জিনিয়ার পদে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন) উদার চরিত্র ও সর্ব্বগুণান্বিত স্বর্গীয় জ্ঞানেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং পূর্ব্বো-ল্লিখিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ দাস সব-রেজিষ্টার ও পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত যাবতীয় সম্পত্তিশালী, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছিলেন।

৮। নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত রায়াপাড়া গ্রামের পূর্ব্বো-ল্লিখিত শ্রীশ্রী৺মহাদেব সিদ্ধেশ্বরের এবং শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী কালী-মাতার প্রাচীন মন্দির দুইটী সংস্কার করান হইয়াছিল। সংস্কারের পর মন্দির দুইটী নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছিল এবং সবডিভিসনের

সুদূর প্রান্তবর্ত্তী স্থান হইতে দলে দলে আবালবৃদ্ধবণিতা আসিয়া নূতন মন্দিরে দেবাদিদেব মহাদেবের ও জগন্মাতার পূজা দিয়া যাইত। এই কাজটি সুসম্পন্ন হওয়ায় আমার এবং আমার পৃষ্ঠ-পোষক কয়েকটী ভদ্রলোকের বিশেষ সুখ্যাতি হইয়াছিল।

৯। কোলাঘাট রেলষ্টেসনের প্রায় একক্রোশ দূরে খারিসা গ্রামে একটি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। স্কুলটী "যোগেন্দ্র এম, ই, স্কুল" নামে প্রচারিত হইয়াছিল।

১০। সুতাহাটা থানার অন্তর্গত পার্ব্বতীপুর গ্রামে একটি উচ্চ শ্রেণীর (H. E. School) ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়টী স্থাপন সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ বিবরণের উল্লেখ করিতে হইতেছে। শ্রীযুক্ত বাবু ভূতনাথ প্রামাণিক (এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছেন ১০।৮।২৯) পার্ব্বতী-পুরের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁহার মাতা পতিত পাবনী দাসী তখন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধে, মামলা মোকদ্দমা সম্বন্ধে এবং সামাজিক অন্যান্য বিষয়ের খোঁজ খবর রাখিতেন এবং পরামর্শ দিতেন। ইঁহারা জাতিতে পোদ। এই শ্রেণীর অশিক্ষিতা পল্লীগ্রামবাসিনী স্ত্রীলোকের মধ্যে পতিত পাবনীর ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, উদ্যমশীল ও উৎসাহশীল রমণী ইতি-পূর্ব্বে আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তমলুক মুন্সেফি আদালতে পুত্র ভূতনাথ একটি মোকদ্দমায় জয়লাভ করিতে পারেন নাই। পরাজয়ের কারণ জিজ্ঞাসায় ভূতনাথ জননীকে বলিয়াছিলেন, "আমরা মূর্খ মানুষ, উকীল হাকিমকে কি বুঝাইলেন, হাকিম কি

বুঝিলেন, তাঁহারাই জানেন। আমরা এত টাকা কেবল জলে ফেলিলাম।" এই কথা শুনিয়া পতিত পাবনী তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন, "এখনি ছেলেদের লেখাপড়া শিক্ষার বন্দোবস্ত কর; যত টাকা লাগে আমি দিব। যা তোরা কালই তমলুকে যাইয়া হাকিমকে (অর্থাৎ আমাকে) এখানে নিয়ে আয়, তিনি যেরূপ বলিবেন তাহাই কর।" মাতৃভক্ত ভূতনাথ মাতৃ-আজ্ঞা পালনে কালবিলম্ব করেন নাই। সত্বর তমলুকে আসিয়া আমার নিকট সমস্ত অবস্থা জানাইলেন এবং শীঘ্রই পার্ব্বতীপুর যাইয়া একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য যাহা করিতে হইবে তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া আসিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। একটা স্থানীয় অভাব দূর করিবার সুযোগ বুঝিয়া লাইব্রেরী হইতে একখানি শিক্ষা বিভাগের পুস্তক (Educational Code) সংগ্রহ করিলাম এবং তমলুক ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু অটল বিহারী মৈত্রেয় মহাশয়ের সঙ্গে এই সম্বন্ধে আলোচনার পর বন্ধুবর স্বর্গীয় রজনী কান্ত সেন উকীল মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে পার্ব্বতীপুরে উপস্থিত হইলাম। সর্ব্ব প্রথমেই পতিত পাবনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম এবং তাঁহার এই সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব আশা দিয়া, পার্ব্বতীপুরে প্রায় এক সপ্তাহ অবস্থিতি করিলাম। কোন্ স্থানে স্কুল-গৃহ, বোর্ডিং, শিক্ষকদের বাসা, ছাত্রদের ব্যায়াম শিক্ষার স্থান প্রভৃতি করিতে হইবে, ইউনিভার্সিটি রেগুলেশন অনুসারে স্কুল-গৃহ ও বোর্ডিং নির্ম্মাণ করিতে হইবে, প্রথমে কত

বেতনে কত জন শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে, লাইব্রেরীতে আপাততঃ কতগুলি পুস্তক, ম্যাপ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি, কতগুলি চেয়ার, টেবিল, আলমারী, বেঞ্চ, ডেস্ক প্রভৃতি প্রয়োজন হইবে এবং এই সকল কার্য্যে কি পরিমাণ ব্যয় হইতে পারে ; তারপর প্রতি মাসে শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য বাবদে কত টাকা ব্যয় হইতে পারে, তাহার একটা এষ্টিমেট প্রস্তুত করা হইল। পুনরায় একদিন পতিত পাবনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জানাইলাম যে প্রথমেই পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে এবং মাসিক দুইশত অন্ততঃ দেড়শত টাকা আয়ের উপযুক্ত সম্পত্তি স্কুলের জন্য একেবারে রেজিষ্টারি করিয়া দিতে হইবে। “বাবা, আমি গরীব মানুষ, এত টাকা কোথায় পাইব” বলিয়া বৃদ্ধা প্রথমটা কিছু আপত্তি করিয়াছিলেন। পরে কহিলেন আপাততঃ কোন প্রকারে ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া স্কুল খুলিয়া দেওয়া হউক, ক্রমে ক্রমে ভাল করিয়া নির্ম্মাণ করিলেই হইবে। স্থায়ী আয়ের জন্য দোরো পরগণার ২০০ শত বিঘা উৎকৃষ্ট জমি হাই স্কুলের নামে দান-পত্র রেজেষ্ট্রি করিয়া দিতে সম্মত হইলেন। আমি পার্ব্বতীপুর হইতে তমলুক প্রত্যাগমনের পর অল্পদিনের মধ্যেই দলিলটী রেজেষ্ট্রি করা হইল। স্কুল-গৃহ এবং বোর্ডিং নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল। স্কুলটী affiliated হইয়াছে। দুই চারিটি ছাত্রও প্রবেশিকা (Matric) পরীক্ষায় প্রতি বৎসর উত্তীর্ণও হইতেছে। এই সময় একবার পার্ব্বতীপুরে যাইয়া স্কুলের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আসিবার জন্য ভূতনাথ বাবু খুবই আগ্রহ প্রকাশ

করিতেছেন। কিন্তু এই বয়সে ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া যাইতে সাহস হইতেছে না।

১১। বহুদিন পূর্ব্বে তমলুক নগরের পুরোভাগস্থ একটী সুপ্রশস্ত রাজপথ এবং তৎসংলগ্ন ভূখণ্ড রূপনারায়ণ গ্রাস করিয়াছিল। সেই পথটী পুনরায় নির্ম্মিত হইয়া, স্থানটী নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছিল এবং মোটর, ঘোড়ার গাড়ী, গো-যান প্রভৃতি চালাইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

তমলুক নগরে একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠি স্থাপন করিবার সমস্ত আয়োজন করা হইয়াছিল। কিন্তু সত্বর অবসর গ্রহণ করিয়া, স্থান পরিত্যাগ করিতে হইল বলিয়া সঙ্কল্পটী কার্য্যে পরিণত করিয়া আসিতে পারি নাই।

আখ্যায়িকার প্রথম খণ্ড এই স্থানেই শেষ হইল। বেতনভোগী চাকরীও শেষ হইল। অতঃপর পেন্সন লইয়া চক্রধরপুরে অবস্থিতি সময়ের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত
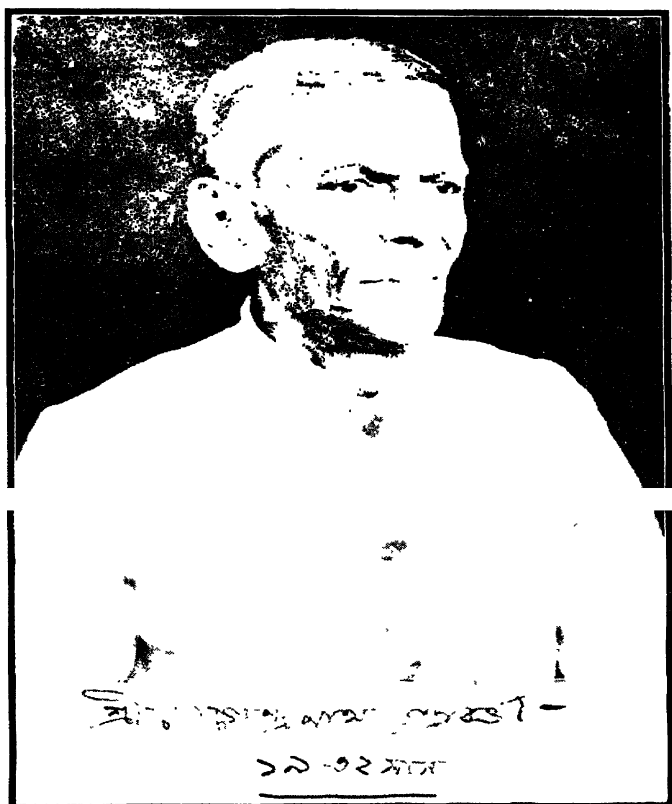
দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

এইবার জীবন নাটকের প্রথম অঙ্ক শেষ হইয়া দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ১৯১১ মার্চ্চ মাসের প্রথম ভাগে তমলুক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া চক্রধরপুরে আসি। মনে তখনও বেশ উদ্যম, বেশ উৎসাহ চক্ষের দৃষ্টি ক্ষীণ হইলেও, পরিশ্রম শক্তি তখন পর্য্যন্ত হ্রাস হয় নাই। জীবনের শেষ দিকটা এই স্থানেই কাটাইতে হইবে বুঝিয়া ভাবিলাম যাহাতে এই স্থানের সকল বিষয়ের উন্নতি হয় প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথমেই বাসাবাটীর সংস্কার। একটী বাহিরের ঘর এবং খিড়কির দিকে বাটীর পশ্চাদ্ভাগে একটী সামান্যরূপ পুষ্করিণী করান হইল। স্থানীয় জনসাধারণ আমাকে ডিস্‌পেন্সারী এবং স্কুল কমিটীর প্রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত করিলেন। নিজে উদ্যোগী হইয়া "ইম্‌প্রুভমেণ্ট কমিটী" (Improvement Committee) নাম দিয়া একটী কমিটী গঠন করিলাম। স্থানীয় ভূম্যধিকারী রাজা নরপৎ সিং দেও বাহাদুর কমিটীর প্রেসিডেণ্ট এবং আমি সেক্রেটারী পদে নির্ব্বাচিত হইলাম। কিন্তু স্থানীয় লোকের

অবহেলায় ডিসপেন্সারীটী এবং ইম্‌প্রুভমেণ্ট কমিটী অতি অল্প দিনের মধ্যেই উঠিয়া গেল।

এই সময়ের কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে কনিষ্ঠ সহোদর রাজেন্দ্র নাথ দিগনগরে একটী ছোট রকমের পূজার দালান নির্ম্মাণ করাইয়া প্রথমেই সেই দালানে জগন্মাতার দশভূজা মূর্ত্তি পূজা করিবার প্রস্তাব করিতেছিলেন। পরিবারবর্গও কয়েকমাস দেশে যাইয়া থাকিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বর্ষারম্ভের কিছু পূর্ব্বে দিগনগর যাইয়া দুই ভাইয়ের অর্থে দালানটী নির্ম্মাণ করান হইল। বৈঠকখানার ন্যায় ব্যবহার করা যাইতে পারে, ঘরটী সেইরূপ ভাবেই নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। সেই সঙ্গে গ্রামের প্রাচীন বিগ্রহ ৺মদন গোপাল জীউর অঙ্গ সংস্কার, স্থানীয় উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের এবং স্কুল কমিটীর কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধন ও নিজ সাংসারিক বিষয়ের কতকটা সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। স্থায়ীভাবে দিগনগরে থাকিবার জন্য স্বগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসী অনেকেই আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায়মত কাজ করিতে পারিলে শিক্ষিত ও সহৃদয় লোকের সহায়তায় নিজ গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের কিছু না কিছু উন্নতি সাধন করা যাইতে পারিবে এবং অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইব তাহা বেশ বুঝিয়াছিলাম। বহুদিন পরে নানাবিধ সুখাদ্য মৎস্য, তরিতরকারি, দধি, দুগ্ধ, ছানা ও মিষ্টান্ন মনের সাধে উপভোগ করিতে পারিব তাহাও বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু আষাঢ়

মাসের শেষ ভাগ হইতে পৌষ মাসের শেষ পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়ার উপদ্রবে দেশে বাস করা একেবারেই অসম্ভব। চিরদিন বিদেশে স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া অভ্যাস এবং শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এরূপ গঠিত হইয়া গিয়াছিল যে উহা মোটেই পল্লীবাসের উপযোগী ছিল না। যাঁহারা চিরদিনই দেশে বাস করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা একদিকে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছেন আবার সংসারের কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন ; জ্বর আসিলে লেপ বা কম্বলাচ্ছাদিত হইয়া কয়েক ঘণ্টা শয়নের পর হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতেছেন। এইভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ; সুতরাং আমরা চক্রধরপুরে ফিরিয়া আসিলাম।

পেন্সান লইয়া আয় খুবই কমিয়া গিয়াছিল। প্রমথ নাথ তাহার ডাক্তারী ব্যবসায় এবং খড়গপুরের জমি জায়গার আয় হইতে অধিক সাহায্য করিতে পারিত না। এদিকে ব্যয়ও বিশেষ কমাইতে পারি নাই। ভোজ দেওয়া রোগ তখন পর্য্যন্ত আমার ও পত্নীর পূর্ব্বের ন্যায়ই প্রবল ছিল। পিতৃমাতৃ সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের দিনে এবং কোন কিছু একটা উপলক্ষ পাইলেই তিনি মেয়েদের খাওয়াইতে ছাড়িতেন না, আমিও বন্ধুবান্ধব খাওয়াইয়া তৃপ্তিলাভ করিতাম। এই সময় প্রমথকে তাহার কয়েকটী বন্ধু খাওয়াইবার জন্য ধরিয়াছিল ; প্রমথ উত্তর দিয়াছিল—“বাবা যেরূপ খাওয়াইয়া যাইতেছেন, আমাদের তিনপুরুষ এখন না খাওয়াইলেও চলে।”

এই সময় চক্রধরপুরে অনেকগুলি বাঙ্গালী নানারূপ বিষয় কৰ্ম্ম উপলক্ষে বাস করিতেছিলেন। মুসলমান, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক বিষয় কৰ্ম্ম উপলক্ষে একরূপ স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া গিয়াছিলেন। সৰ্ব্বত্রই যেরূপ দেখা যায় এখানেও সেইরূপ মাড়োয়ারী সম্প্রদায় তাঁহাদের অসাধারণ অধ্যবসায়, বিষয় বুদ্ধি ও পরিশ্রম এবং অর্থোপার্জ্জনের কৌশল বলে অন্য সম্প্রদায় অপেক্ষা সমধিক ধনশালী হইতে-ছিলেন। ইংরাজী ১৯০০ সালে একটী মাড়োয়ারী ভদ্রলোক দুই হাজার টাকা কৰ্জ্জ লইবার জন্য অনেকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৯১২ সালে দেখিলাম সেই ভদ্রলোক মহাজনি, কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া কয়লার খাদ পর্য্যন্ত অর্জ্জন করিয়াছেন, প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং জেলার মধ্যে একটী গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা বাঙ্গালী, আমাদের চক্ষের সম্মুখে মাড়োয়ারীদিগের এইরূপ আদর্শ প্রতিনিয়ত দেখিয়াও আমাদের চক্ষু ফুটে না। জানিনা কোন্ দেবতার অভিশাপে আমাদের এই দশা ঘটিয়াছে।

ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ সপত্নীক ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়া ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীতে যে বিরাট দরবার করিয়াছিলেন এবং সেই উপলক্ষে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে যে উৎসবাদি হইয়াছিল তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা নিস্প্রয়োজন ; সেগুলি ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিষয়। আমাদের ক্ষুদ্র

চক্রধরপুর এবিষয়ে পশ্চাৎপদ ছিল না। উৎসব শেষে রাজা নরপৎ সিং দেও বাহাদুর এবং আমি দরবার মেডেল পাইয়াছিলাম। কমিটীর অন্যান্য মেম্বারবর্গও প্রশংসাসূচক সার্টিফিকেট পাইয়াছিলেন।

ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর-জেনেরল লর্ড কর্জ্জন কর্ত্তৃক বঙ্গব্যবচ্ছেদ ঘটনায় বাঙ্গলাদেশে একটা ঘোরতর অশান্তি ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। সম্রাটের দিল্লী দরবার উপলক্ষে রাজাদেশে আবার বিভক্ত বঙ্গ জোড়া লাগিল। লেফ্‌টন্যাণ্ট গবর্ণরের স্থলে উচ্চ বেতনে গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন। সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মনে একটা আনন্দের হিল্লোল বহিল। বঙ্গের সমস্ত নগর এবং বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামগুলি আলোকমালায় পুষ্প পত্র লতা পতাকায় বিভূষিত হইয়াছিল। রাজদম্পতি এবং কুমার কুমারীগণের দীর্ঘ জীবন ও সুখৈশ্বর্য্যের কামনায় প্রতি দেবালয়ে পূজা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কূট রাজনীতির প্রভাবে বাঙ্গালীজাতির এই আন্দোচ্ছ্বাস অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা একজন লেফ্‌টন্যাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীনে ছিল; আসামে একজন চীফ্‌ কমিশনার থাকিতেন। এখন বিহার উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর লইয়া একটা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সৃষ্টি হইল; আসামে চীফ কমিশনারের পদ উঠাইয়া দিয়া সেখানেও একজন গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন। সুতরাং দুইটীর স্থানে তিনটী পৃথক গবর্ণমেণ্টের সৃষ্টি হইল। আবার মানভূম ও সিংহভূম জেলা বাঙ্গালা হইতে বাহির করিয়া বিহার ও উড়িষ্যারা

অন্তর্ভুক্ত করা হইল। সিলেট বা শ্রীহট্ট জেলাটীকে আসামের মধ্যে দেওয়া হইল। এই তিনটী জেলার অধিবাসী অধিকাংশই বাঙ্গালী; আদালতে, বিদ্যালয়সমূহে বাঙ্গালা ভাষাই চিরদিন প্রচলিত ছিল। এই তিনটী জেলাকে পুনরায় বাংলা গবর্ণমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রার্থনায় সমস্ত আবেদন, আন্দোলন বিফল হইল। একজন লেফ্‌টন্যাণ্ট গবর্ণরের স্থলে তিনটী উচ্চ বেতনের গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন। তিনটী সুবৃহৎ লাটসেরেস্তা, তিনটা রেভিনিউ বোর্ড, তুইটী হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনজন একাউণ্টেণ্ট জেনারল, তুইজন পোষ্টমাষ্টার জেনারল, তিনজন আবগারি কমিশনার নিযুক্ত হইলেন। তিনদল নূতন কেরাণী, চাপরাসী প্রভৃতির সৃষ্টি হইল; এতকাল একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী কালেক্টর, আবগারী, ইনকমট্যাক্স প্রভৃতি নানা বিভাগের কাজ নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, এখন আবার কয়েকটী নূতন পদের সৃষ্টি হইল। যথা—কমিশনার ও আসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার অব ইনকমট্যাক্স, ইনকমট্যাক্স অফিসার, আসিষ্ট্যাণ্ট ইনকমট্যাক্স অফিসার, ডেপুটী কমিশনার অব একসাইজ এণ্ড সল্ট, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব একসাইজ এণ্ড সল্ট ইত্যাদি। এইরূপ জেল, পুলিস, ডাক্তারী, জঙ্গল, পূর্ত্ত ও শিক্ষা প্রভৃতি প্রত্যেক বিভাগে নূতন নূতন পদের সৃষ্টি হইল। ইঁহাদের সকলেরই পৃথক পৃথক আফিস হইল; অনেক নূতন কেরাণী নূতন চাপরাসী নিযুক্ত হইল। ব্যয় যে কতকটা বাড়িয়া গেল তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার কিছুদিন পরে (১৯২২) প্রত্যেক গবর্ণরের তুই

তিনজন করিয়া উচ্চ বেতনের মন্ত্রী এবং একজিকিউটিব কাউন্সিলার প্রভৃতি পদেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাও নবভাবে গঠিত হইয়াছিল। যে অর্থ দেশের নানা হিতকর কার্য্যে ব্যয় করা যাইতে পারিত সম্ভবতঃ সেই অর্থে এই বিরাট শাসন যন্ত্র পরিচালিত হইতে লাগিল। এ সম্বন্ধে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের কোন অভিমত প্রকাশ করা বাতুলতা মাত্র। কারণ অনেক প্রবীণ ও বহুদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বহু চিন্তা ও গবেষণার ফলেই যে এই অভিনব শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৯১২ ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে তমলুক সব-ডিভিসনের অন্তর্গত চমসরপুর নিবাসী মুন্সী নবিরুদ্দিন বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য, নানাবিধ ফলমূল এবং উৎকৃষ্ট মিষ্টান্নাদি উপহার সহ চক্রধরপুরে আসিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত আমার প্রতি ইঁহাদের এতটা শ্রদ্ধাপ্রীতি রহিয়াছে দেখিয়া প্রকৃতই বিস্মিত হইয়াছিলাম। যথাসম্ভব আদর যত্নে তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিয়াছিলাম। মুন্সীজী প্রস্তাব করিলেন,—"চলুন আর একবার আমাদের দেশে বেড়াইয়া আসিবেন।" আমারও সময় সময় সেইরূপ ইচ্ছা হইতেছিল। ইতস্ততঃ না করিয়া গোপাল ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া মুন্সীজীর সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম। খড়গপুরে প্রমথর নিকট একদিন থাকিয়া, তারপর মুন্সীজীর বাটীতে একদিন পরমাদরে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। সম্ভ্রান্ত হিন্দু অতিথিদের জন্য মুন্সীজী নিজ বসতবাটীর অনতিদূরে একটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ ও পাকশালাদি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পাচক ও হিন্দু চাকরেরও বন্দোবস্ত ছিল। সেখান হইতে তমলুক যাইয়া নগেশ ভায়ার আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। শ্রীশ্রী৺ বর্গভীমা দেবীর পূজা দিয়া, তারপর কলিকাতায় যাইয়া দুইদিন স্বর্গীয় বন্ধু নরেন্দ্র নাথ কুমার মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতি করা হইল। চক্রধরপুরে ফিরিবার সময় তমলুক হইয়া আসিয়াছিলাম।

আমার তমলুক হইতে অবসর গ্রহণের পর তুই তিন বৎসর মেদিনীপুর জেলার, বিশেষতঃ তমলুক সবডিভিসনবাসী, অনেক-গুলি সম্ভ্রান্ত লোক বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য চক্রধরপুরে আসিয়া-ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের নামই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য :— নাড়াজোলাধিপতি রাজা নরেন্দ্র লাল খাঁ, বাবু উপেন্দ্র নাথ মাইতি, জমিদার, বাবু শ্রীপতি বসু, রজনীকান্ত ঘোষ, ভীমাচরণ ভট্টাচার্য্য, উকীল, এবং বাবু উমেশ চন্দ্র ভঞ্জ, মোক্তার।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগে সপরিবারে দিগনগর যাইয়া আমি নিজে একমাস ছিলাম। এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে কনিষ্ঠ সহোদর রাজেন্দ্র নাথ চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে-ছিলেন ; তিনিও আমাদের সঙ্গে দিগনগর আসিয়াছিলেন এবং একটু সমারোহের সহিত ৺রক্ষাকালী মাতার পূজা নির্ব্বাহ করিয়া-ছিলেন। বাথানগাছি নিবাসী হরিমোহন ঘোষ, ভ্রাতুষ্পুত্র রাধিকা প্রসাদ, অঘোর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী, সীতানাথ সরকার, মুন্সী ইজ্জতালি মণ্ডল প্রভৃতি অনেকগুলি ভদ্রলোক সর্ব্বদাই আমাদের নিকটে থাকিতেন। দিগনগরের প্রসিদ্ধ দীঘি হইতে প্রমথ প্রতিদিনই রোহিত ও মিরগাল মাছ ধরিয়া আনিত। আবার এক একদিন স্তূপাকার হরিয়াল, তিতির, কাম, বন্যহাঁস প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষী এবং এক একদিন খরগোস শিকার করিয়া আনিত। রাত্রিকালে একটী ছোট খাট ভোজের আয়োজন হইত। নিজেদের বাগিচা কয়টীতে প্রচুর পরিমাণ আম, কাঁঠাল। বন্ধুবান্ধববর্গও, বিশেষতঃ হরিমোহন, তাঁহাদের বাগানের উৎকৃষ্ট

আম, লিচু, ম্যাঙ্গোষ্টিন (Mangoesteen) প্রভৃতি উপহার দিতেন। দধি, দুগ্ধ, ছানা এবং সন্দেশ, পানিতুয়া প্রভৃতিও সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইত। উপভোগের সমস্ত উপকরণ থাকিলে কি হয়, এক ম্যালেরিয়া রাক্ষসী দেশটাকে ছারখার করিয়া ফেলিতেছে। বর্ষারম্ভের পরেই প্রথমে আমি নিজে, তার কিছুদিন পরে পরিবারবর্গও চক্রধরপুরে ফিরিয়া আসিয়াছিল। এখানে আসিবার পূর্ব্বে একদিন নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা ক্ষৌণীশ চন্দ্র রায় বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছিলাম। তাঁহার সরল মধুর ব্যবহারে বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার সুযোগ্য ম্যানেজার বাবু সুরেন্দ্র লাল রায় (স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্র লালের সহোদর) মহাশয় আমার দিগনগরে অবস্থিতি সময়ে দুই একবার আমাদের বাটীতে আসিয়া আপ্যায়িত করিয়া গিয়াছিলেন।

আমাদের চক্রধরপুর প্রত্যাবর্ত্তনের কয়েকদিন পরে রাজেন্দ্র নাথ সপরিবারে এখানে আসিয়াছিলেন। এখানে কিছুদিন থাকিতে পারিলে জলবায়ু ও সেবা শুশ্রূষার গুণে সম্ভবতঃ তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেন ; কিন্তু বিদায়কাল শেষ হওয়ায় তাঁহাকে দিল্লী ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। সে সময় তিনি ডেপুটী একাউন্টেন্ট জেনারল পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিসের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কার্য্যদক্ষতা, অমায়িক সরল ব্যবহার, সঙ্গীত নৈপুণ্য, ভগবদ্ভক্তি এবং সর্ব্বদা হাস্য কৌতুক ও সদালাপে রত থাকায় তিনি সেখানে বাঙ্গালী সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন এবং সর্ব্বশ্রেণীর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

পিতৃব্যপুত্র ভূপতি এই সময় (কলিকাতা) আলিপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১২ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে সংবাদ পত্রে দেখিলাম, ভূপতি একদিন আফিস হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে; তাহার অনুসন্ধানে আত্মীয় স্বজন চারিদিকে যাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট হইতেও তাহার অনুসন্ধান জন্য নানাস্থানের পুলিসের উপর আদেশ প্রেরণ করা হইয়াছে। দুই তিন দিন পরে আবার সংবাদ পত্রে দেখিলাম যে মধুপুরের প্রান্তস্থিত একটী জনশূন্য বাটীর পাকশালায় ভূপতির মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে; কোটের পকেটে ভূপতির স্বহস্ত লিখিত এক টুকরা কাগজ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে লেখা ছিল :— "Extreme mental suffering; I therefore commit suicide, none is responsible". অর্থাৎ "অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করিলাম, এজন্য কেহই দায়ী নহে।" আমাদের পরিবারের মধ্যে রূপে, গুণে, বিদ্যা বুদ্ধি, স্বভাব চরিত্র ও যোগ্যতায় ভূপতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই সময় তাঁহার মাসিক বেতন ছিল ছয় শত টাকা। ইহার পূর্ব্বে আরও উচ্চ বেতনে অনেক দায়িত্বপূর্ণ বিশেষ বিশেষ কাজে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। এরূপ সর্ব্বগুণান্বিত, ধীর, শান্তপ্রকৃতি, সদ্বিবেচক ব্যক্তির শোচনীয় মৃত্যুতে আমরা বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। ভূপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্র সেই সময় সবে মাত্র আলিপুর কোর্টে ওকালতী আরম্ভ করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট প্রথমে তাহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীশ

নিতান্ত ভাল মানুষ বলিয়া তাহাকে মুন্সেফি পদে নিযুক্ত করা হইল। অতঃপর বুঝিতে হইবে যে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পদাকাঙ্খী ব্যক্তিকে একটু বিশেষ রকম চালাক চতুর হইতে হইবে।

এই বৎসর নভেম্বর মাসে প্রমথর প্রথমা কন্যার জন্ম হয়। তার নাম রাখা হইয়াছিল রেণুকা। আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরা সৌদামিনী দেবী এবং আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী সয়েমণির পরে এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ও সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা কন্যা সন্তান আমাদের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে নাই। প্রবাদ আছে, আমাদের পরিবারের কন্যারা অভিশপ্ত। হয় কেহ বালবিধবা, নতুবা চিরদুঃখী অথবা অল্প বয়সেই ইহধাম ত্যাগ করে। আহা, সোণার রেণুকাও এই অভিসম্পাতের কবল হইতে রক্ষা পায় নাই; যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন (Mr. B. C. Sen, I. C. S.) এই সময় সিংভূমের ডেপুটী কমিশনার পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি সার কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত (Sir K. G. Gupta I. C. S. C. I. E Etc) মহাশয়ের জামাতা। কন্যা জামাতাকে দেখিবার অভিপ্রায়ে ইনি ১৯১৩ জানুয়ারী মাসে চক্রধরপুর হইয়া চাই-বাসায় গিয়াছিলেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষে চক্রধরপুর ও চাইবাসায় নানাবিধ উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। বাহির হইতে মহারাজা, রাজা, জমিদার এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সময় চাইবাসায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমিও নিমন্ত্রিত হইয়া চাইবাসায় গিয়াছিলাম। দুই তিন দিন সেখানে খুব আনন্দে কাটিয়াছিল।

চক্রধরপুর প্রবাসী তৎকালীন সমস্ত গণ্যমান্য ভদ্রলোকদিগের নাম ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হয় নাই ; সেইজন্য এইস্থানে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি। অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ রায় বাহাদুর গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (ইনি আর ইহধামে নাই), শিবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ও তৎসহোদর রাজেন্দ্র নাথ ও সুরেন্দ্র নাথ ; শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী হালদার (ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন), এবং তৎসহোদর পুলিন বিহারী, ও বঙ্কিম বিহারী, শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত পান্নালাল মুখোপাধ্যায়, ধাত্রী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গোকুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ইনিও দিব্যধামের পথিক হইয়াছেন)। ইঁহারা সকলেই অনেক জমি লইয়া মনোরম উদ্যান ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কেহ বা ব্যবসা উপলক্ষে, কেহ বা কেবল বায়ু পরিবর্ত্তন উদ্দেশ্যে এই বাড়ীগুলি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। গোকুল বাবু নিজে বাস করিবার জন্য একখানি বাড়ী এবং ভাড়া দিবার জন্য আট দশখানি পাকাবাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইঁহারা ব্যতীত রেলওয়ের আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার শ্রীচরণ দে মহাশয়ের নামও উল্লেখ যোগ্য। উত্তরকালে ইনি উচ্চ বেতনে মেডিক্যাল অফিসারের পদে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

১৯১৩ ফেব্রুয়ারীর প্রথমে টেলিগ্রাম পাইলাম, রাজেন্দ্রর পীড়া সঙ্কটাপন্ন হওয়ায় তিনি পুনরায় বিদায় লইয়া চিকিৎসার জন্য সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়াছেন। অবিলম্বে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম প্রকৃতই রোগের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আছেন; ডাক্তারের সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি কহিলেন, "দীর্ঘকাল ইঁহাকে চিকিৎসাধীনে থাকিতে হইবে এবং আহারাদি সম্বন্ধেও বিশেষরূপ সুনিয়মে থাকাও খুব প্রয়োজন।" কলিকাতায় অবস্থিতিকালে একদিন ভূপতির বিধবা পত্নী এবং ছেলেদের দেখিয়া আসিয়াছিলাম। চক্রধরপুরে ফিরিবার পথে মেদিনীপুর যাইয়া তুইদিন নগেশ ভায়ার বাটীতে পরম যত্নে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। ঐ সময় মধ্যে নাড়াজোলের পরলোকগত সদাশয় রাজা ৺নরেন্দ্র লাল খাঁ বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করিয়া ৺কালী মন্দির নির্ম্মাণ জন্য দেড় শত টাকা সাহায্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল। চৌধুরী যামিনী নাথ মল্লিক মহাশয় পঁচিশ টাকা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার মিঃ বীরেন্দ্র নাথ সাসমল ত্রিশ টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় পিতামহ মহাত্মা বাণীকান্ত ও পিতৃদেব যাদব চন্দ্র সুগায়ক ও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের পরে আমি ও রাজেন্দ্র নাথও সঙ্গীতানুরাগী হইয়াছিলাম। রাজেন্দ্র নাথ দিল্লী অবস্থানকালে এই দেবতুর্ল্লভ বিদ্যায় কতকটা উন্নতি সাধন করিয়াছিল। আমার সে সুযোগ না থাকিলেও তুই চারিটা শ্যামা সঙ্গীত, হরি সংকীর্ত্তন এবং হাস্যোদ্দীপক গান শিক্ষা করিয়াছিলাম। অবসর সময়ে সন্ধ্যার পর প্রতিদিনই গানের মজলিস বসাইতাম। কখন কখন সদল বলে নগর সংকীর্ত্তন বাহির করিতাম। কোন স্থান হইতে সুগায়ক আসিলে অতীব যত্নে তাঁহাকে নিজের বাটীতে রাখিয়া গান শুনিতাম। পুত্র

প্রমথনাথও পিতৃপুরুষদের ন্যায় সঙ্গীতানুরাগী হইয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার বাসিন্দা শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন রায় ছিলেন তমলুকের একজন হোমিওপ্যাথী ডাক্তার। ইনি অতি সুকণ্ঠ ও সুগায়ক। প্রমথ নাথ তাঁহাকে দুই চারিবার চক্রধরপুরে আনিয়া ছিল। সেই সময় সঙ্গীতপ্রিয় সমস্ত ভদ্রলোক ও মহিলারা আসিয়া কালী বাবুর গান তন্ময় হইয়া শুনিতেন। বস্তুতঃ কালী বাবু ওস্তাদী ধরণের ধ্রুপদী বা খেয়ালী না হইলেও তাঁহার কণ্ঠের এমন একটা বিশেষত্ব আছে এবং গান গাহিবার সময় সহাস্য বদনে এরূপ ভাবভঙ্গী প্রকাশ করেন যে আবালবৃদ্ধবণিতা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চারি পাঁচ ঘণ্টা তাঁহার গান শুনিতেন। শেষবারে কালী বাবু এখানে সতের দিন ছিলেন। সেই সময় স্থানীয় ভদ্রেলাক একটী সভার অধিবেশন করিয়া তাঁহাকে একটী স্বর্ণপদক (Medal with suitable inscriptions) উপহার দিয়াছিলেন।

মে মাসের শেষভাগে সকলকে লইয়া দিগনগর গিয়াছিলাম। রাধিকা প্রসাদের মাতাঠাকুরাণী কিছুদিন পূর্ব্বে স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। পারলৌকিক ক্রিয়াও সমাধা হইয়াছিল। আমরা দেশে যাইবার পর রাধিকাপ্রসাদ খুব সমারোহের সহিত ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন।

আমাদের স্থানীয় কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্য্য-প্রণালী বড়ই অসন্তোষজনক দেখিয়া তৎপদে শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তীকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই

পরিবর্ত্তন যে খুবই ভ্রমাত্মক হইয়াছিল তাহা সে সময় বুঝি নাই। বৃন্দাবন চন্দ্রকে মনোনীত করিবার কারণ যে তিনি বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী এবং পূর্ব্ব হইতে আমার অন্য সরিকদের গোমস্তাপদে নিযুক্ত ছিলেন। ক্ষুদ্র সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ জন্য দুইটী লোক রাখা নিষ্প্রয়োজন, ইহাও একটী কারণ।

দিগনগরে অবস্থিতি সময়ে শুনিলাম, বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ স্বভাব-কবি, হাস্যরসে রসিক, স্বদেশানুরাগী ভাবুকশ্রেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্র লাল রায় সন্ন্যাসরোগে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি কেবল নদীয়া নহে, সমস্ত বঙ্গভূমিকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। ইঁহার অকালমৃত্যু সমগ্র বঙ্গদেশের একটী মহা দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে।

এই সময় দেবেন্দ্র নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীপদ এবং ভূপতির তৃতীয় পুত্র জ্যোতিষ চন্দ্র দিগনগর আসিয়া কয়েকদিন আমাদের নিকট ছিল। তখন প্রবল বর্ষা। বৃষ্টির জল চারিদিক হইতে অনেকগুলি প্রণালীর দ্বারা দীঘিতে যাইতেছিল। দীঘি হইতে মাছ উঠিয়া ঐ সকল নালার ভিতরে উজান যাইয়া মাঠের জল-রাশির মধ্যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সন্ধ্যার পর মাছ ধরিবার জন্য দলে দলে লোক দীঘির দিকে দৌড়াইতে লাগিল। এই সংবাদ পাইবামাত্র প্রমথ, কালীপদ, জ্যোতিষ চাকরদের লইয়া মাছ ধরিতে গিয়াছিল। রাত্রি ১টার সময় প্রায় আট দশ সের নানাজাতীয় মাছ লইয়া ফিরিয়া আসিল। আমি ঘুমাইতেছিলাম, গোলমালে ঘুম ভাঙ্গিল। উঠিয়া দেখি,

বড় বড় কই, মাগুর, সোল, সরল পুঁটী, বাটা, ফলুই, বড় বড় চেলা প্রভৃতি মাছ আনিয়াছে। উপর্য্যুপরি তিন চারিদিন বৃষ্টি হওয়ায়, ঐ কয়দিন অনেক মাছ ধরা হইল ; অনেকদিন পরে প্রচুর পরিমাণ সুস্বাদু মৎস্য পাইয়া কয়টা দিন আহারের ব্যবস্থা ভালই হইয়াছিল। উজানের মাছ ধরা আমাদের গ্রামের একটা বিশেষ আমোদের জিনিষ।

দুই সপ্তাহ মাত্র নিজে দিগনগরে ছিলাম। পরিবারবর্গকে রাখিয়া আমি একাই চক্রধরপুর আসিয়াছিলাম। বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য কিছুদিন এখানে আসিয়া থাকা শ্রেয়ঃ, রাজেন্দ্রকে বলিয়া আসিয়াছিলাম ; রাজেন্দ্রও সম্মত ছিলেন ; একটু সুস্থ হইয়া এখানে আসিবার অভিমত প্রকাশ করিলেন। কয়েকদিন পরেই সংবাদ পাইলাম রাজেন্দ্রনাথের পীড়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে। আমি তখন জ্বর ও পেটের পীড়ায় কষ্ট পাইতে-ছিলাম। কলিকাতা যাইয়া সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া আমাকে সত্বর জানাইবার জন্য খড়গপুরে প্রমথকে টেলিগ্রাম করিলাম। প্রমথও আমার টেলিগ্রাম পাইবামাত্র কলিকাতায় গিয়াছিল। কালীপদ সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতেছে দেখিয়া এবং আসন্ন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া পরিবারদিগকে দেখিয়া আসিবার জন্য প্রমথ একদিন দিগনগর গিয়াছিল। দিগনগরে উপস্থিত হইয়াই শুনিল, তাহার সে সময়ের তৃতীয় পুত্র নগেন্দ্র নাথ (সকলে "গুইরাম" বলিয়া ডাকিত) তিন দিনের জ্বরে মারা গিয়াছে। এইটী পিতামাতার বড়ই আদরের সন্তান ছিল। তার

এই অকাল মৃত্যুতে প্রমথ ও বউমা শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রমথ যেদিন প্রাতের ট্রেণে দিগনগর রওনা হয় সেইদিনই রাত্রিতে আবার রাজেন্দ্র নাথের পীড়া হঠাৎ বৃদ্ধি হয় এবং সেই রাত্রিতেই তাঁহার পবিত্র আত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিল। সমস্ত ফুরাইল ; রাজেন্দ্রনাথের ও আমার কত সাধ কত আশা অপূর্ণ রহিয়া গেল। শুনিয়াছিলাম, শেষ সময়ে সজ্ঞানে দুর্গানাম জপ করিতে করিতে,—"আর কেন মা, সময় কি পূর্ণ হয় নাই ?" বলিয়াই চির নিদ্রামগ্ন হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্র নাথের মৃত্যু সংবাদ স্বর্গীয় বন্ধু রামলাল দে মহাশয় দিল্লীতে পাঠাইয়াছিলেন। ডেপুটী একাউণ্টেণ্ট জেনারল মহোদয় শোকপ্রকাশ জন্য একদিন আফিস বন্ধ রাখিয়াছিলেন এবং দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া রাজেন্দ্র নাথের সদ্যবিধবা পত্নীকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন।

ইহার পর কয়েকমাস পুরুলিয়া, পঞ্চকোট, বর্দ্ধমান, তমলুক, কলিকাতা ভবানীপুর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া কালীমন্দির নির্ম্মাণ জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হইয়াছিল। পঞ্চকোটাধিপতি ১০০৲, বর্দ্ধমানের স্বনামধন্য রাজা বনবিহারী কর্পূর ২৫৲, ডাক্তার সুরেন্দ্র কুমার সেন ১৫৲, মহিষাদলাধিপতি ২০০৲, তমলুকের বার লাইব্রেরী ৫০৲, মোক্তার এসোসিয়েসন ২৫৲, এবং ১০৲, ৫৲, ২৲, টাকা করিয়া অনেকেই সাহায্য করিয়াছিলেন। এইবার তমলুকে যাইয়া রজনী কান্ত ঘোষ উকীল মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত

সচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে এই সময় প্রথম পরিচয় হয়। ইনি তখন তমলুকের সবরেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত ছিলেন। পুরুলিয়ায় যাওয়া হইলে শ্রীযুক্ত গোপেশ চন্দ্র অধিকারী মহাশয়-দিগের বাটীতেই থাকিতাম; গোপেশ বাবু পরে রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছিলেন, এবং বহুদিন সুখ্যাতির সহিত অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিয়াছিলেন।

চক্রধরপুরে ফিরিয়া মন্দির নির্ম্মাণ কাজেই প্রধানতঃ ব্যাপৃত ছিলাম। স্থানীয় P. W. D. ওভারসিয়ার স্বর্গীয় যোগেশ চন্দ্র বিশ্বাস যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। দেশ হইতে কুম্ভকার আনাইয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ এবং সুযোগ্য পুরোহিত আনাইয়া সেই বৎসর সাম্বৎসরিক কালী-পূজার দিবস বিহিত বিধানে মন্দির ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করান হইয়াছিল। স্বর্গীয় ভোলানাথ বড়ুয়া (Mr. B. Borooah) মহোদয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, ভাগিনেয় স্বর্গীয় হরনারায়ণ বড়া মহাশয়ের যোগে মন্দির ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ সহকারে যোগদান করিয়াছিলেন। জগন্মাতার কৃপায় আমাদের অনেকদিনের সাধ কতকটা পূর্ণ হইল। এখন আবার ইচ্ছা হইল মন্দিরের দুই পার্শ্বে দুইটী ছাদযুক্ত সম্মুখ মুক্ত বারান্দা প্রস্তুত করিতে হইবে। গোকুল বাবু ও করালী বাবু একযোগে স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই কাজটির যথেষ্ট সহায়তা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু "আশা বৈতরণী নদী"। ভাবিলাম মন্দির প্রাঙ্গন

বেষ্টন করিয়া একটী পাকা প্রাচীর এবং সম্মুখে একটি তোরণ দ্বার প্রস্তুত না করিলে ভাল দেখাইতেছে না। সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য পুনরায় নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা হইল এবং যথাকালে এই কাজটীও নির্ব্বাহ হইল। কয়েকটী স্থানীয় সঙ্গতিপন্ন আমোদপ্রিয় ভদ্রলোকের অর্থ সাহায্যে এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া কয়েক বৎসর কালী পূজার পরে নাচ কীর্ত্তন ও যাত্রাগানের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। এই সময় গোকুল বাবু দুই তিন বৎসর কাঙ্গালীদিগকে চাউল, পয়সা ও বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান বর্ষের ১৯১৪ আগষ্ট মাসে ইউরোপে যে অভূত ও অশ্রুতপূর্ব্ব মহা সমরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল সেটা ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিষয়। একদিকে প্রবল পরাক্রান্ত, বলদৃপ্ত জার্ম্মাণ সম্রাট, আষ্ট্রীয় সম্রাট, তুরস্কের সুলতান এবং তাঁহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতিবর্গ। অন্যদিকে ফরাসী, বেলজিয়ম, সার্ভিয়া, মণ্টনিগ্রো, রুষ সম্রাট এবং আমাদের রাজাধিরাজ পঞ্চম জর্জ্জ এবং বৃটেনের সমস্ত উপনিবেশ। জাপান এবং ভারতের সমগ্র মিত্র রাজ্যও এই পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। বীর বংশোদ্ভব শিখ্, মারহাট্টা, গুরখা, পাঠান ও তেলিঙ্গা সৈন্যদলও ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। আর আমাদের বাংলাদেশ হইতেও দুই একদল সৈন্য গঠন করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। চারি বৎসর অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর ভগবানের অপার করুণায় বলদর্পিত,

দাম্ভিক জার্ম্মাণ সম্রাট প্রমুখ রাজন্যবর্গের দর্প চূর্ণ হইয়াছিল। যুদ্ধ অবসানে ইউরোপখণ্ডের মানচিত্র একরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। কোন কোন রাজ্য সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইল, অষ্ট্রিয়া ও তুরস্কের আয়তন একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া গেল এবং যে পোলাণ্ডকে বহুদিন হইতে তিনটী পার্শ্ববর্ত্তী প্রবল রাজ্য গ্রাস করিয়া রাখিয়াছিল সেই পোলাণ্ড বর্দ্ধিতাকারে পুনরায় একটী স্বাধীন রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্ষুদ্র সার্ভিয়ার নাম পরিবর্ত্তন হইয়া, আয়তন বৃদ্ধি হইয়া, সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল এবং আরও কত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা এই যুদ্ধের ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। আর আমাদের বাঙ্গালীজাতি যে একেবারে ভীরু ও অকর্ম্মণ্য নহে, তাহারাও যে পূর্ণ উৎসাহে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিতে পারে তাহাও এই যুদ্ধে প্রমাণ হইয়া গেল। এই মহাযুদ্ধের অবসানে মানুষের জীবন ধারণোপযোগী এবং ইউরোপখণ্ড প্রস্তুত সমস্ত দ্রব্যের মূল্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পরে আমার জীবন ও সংসারের অন্যান্য প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিবার চেষ্টা করিব।

১। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশানুসারে, War Loan, Ambulance Corps, Lady Hardinge Fund, মহিলা সমিতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

২। বহু চেষ্টার পর মহামতি এম, জি, হ্যালেট (Mr. M. G. Hallett I. C. S.) মহোদয়ের সহায়তায় চক্রধরপুরে মিউনিসিপালিটী স্থাপন করাইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। প্রথমে ভাইস চেয়ারম্যান এবং পরে (after the introduction of non-official system) চেয়ারম্যান পদে কয়েক বৎসর প্রতিষ্ঠিত ছিলাম।

৩। ১৯১৭ সালের শেষভাগে ১ম শ্রেণীর ক্ষমতাযুক্ত অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৯৩০ সালের ৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এই "অনাহারী" হাকিমীও করা হইয়াছিল। যে কারণে চেয়ারম্যানের পদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইবে। অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিমাসে দুই তিনবার চাইবাসায় যাইয়াও মোকদ্দমার বিচার করিতে হইত। এই সময় অনেকগুলি উকীলের সঙ্গে প্রথম পরিচয়

হইয়াছিল ; তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ—রায় সাহেব নলিনী কান্ত সেন, রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র আয়কাত, যোগেন্দ্র নাথ আচার্য্য, ব্রজগোপাল মিত্র, অতুল চন্দ্র চৌধুরী, শৈলেশ্বর সেন, প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, সতীন্দ্র নাথ সেন, বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়, শরৎশশী চট্টোপাধ্যায়, বন্ধুবর রাখাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায়, স্বর্গীয় বন্ধু হরিনাথ রায় মহাশয়ের পুত্র অবনী নাথ রায় ও প্রমথ নাথ রায় উকীলবর্গ। যে সময় কোলহাল গবর্ণমেণ্ট ষ্টেটের সেটেলমেণ্ট কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম সেই সময় শেষোক্ত তিনজন শৈশব সীমা অতিক্রম করেন নাই। পরোলকগত উকীল ভগবতী চরণ চৌধুরী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয়ও সেই সময় চাই-বাসায় ওকালতি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইনি সম্প্রতি ধলভূম সবডিভিসনে ওকালতি করিতেছেন। পূর্ব্বপরিচিত রায় সাহেব মোহিনী মোহন ঘোষ, রায় সাহেব শশী ভূষণ সরকার, রাখাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রাচীন উকীল এখনও বর্ত্তমান আছেন। রায় সাহেব মোহিনী মোহন ঘোষ কয়েক বৎসর পরে পরলোকগমন করেন। সদর সব-ডিভিসনেল অফিসারদিগের মধ্যে মিঃ হাউ (Mr. St. John Howe), শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত মুকুটধারী সিং, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সর্ব্বরী কান্ত গুপ্ত, ট্রেজারী অফিসার শ্রীযুক্ত নীরোদ কান্ত সেন, ডিষ্ট্রীক্ট ইন্‌জিনিয়ার শ্রীযুক্ত মুরলীধর মিত্র, সব-ডেপুটী কালেক্টর-ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব রত্নেশ্বর রায়, গিরীন্দ্র নাথ সরকারও

তৎসহোদর পশুপতি সরকার, রায় বাহাতুর ক্ষিতীশচন্দ্র সরকারের পুত্র শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সরকার প্রভৃতির সহিতই একটু বিশেষরূপ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। পত্নী সকলকে সঙ্গে লইয়া এই সময় দেশে গিয়াছিলেন এবং প্রমথ নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাত নাথের উপনয়ন দিগনগরে সমাধা করিয়া আসিয়াছিলেন। অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করায় ঋণগ্রস্তও হইতে হইয়াছিল। আমি হঠাৎ পীড়িত হওয়ায় উপস্থিত হইতে পারি নাই।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে প্রমথ নাথ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে খড়গপুর খরিদা বাজারে ডাক্তারী ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল। এপর্য্যন্ত সুবিধামত বাড়ী না পাওয়ায় পরিবারবর্গকে লইয়া যাইতে পারে নাই। এই সময় একটী দোতালা বাড়ীর অর্দ্ধাংশ ভাড়া পাইয়া ১৯১৭।১৫ই আগষ্ট তারিখে সমস্ত পরিবারবর্গকে সেখানে লইয়া গিয়াছিল। ঐ বাড়ীর অপরার্দ্ধ দেবেন্দ্র নাথের মধ্যম জামাতা শ্রীমান্ কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় ভাড়া লইয়া সস্ত্রীক বাস করিতেছিলেন। তিনি তখন বি, এন, রেল-কোম্পানীর অধীনে ওভারসিয়র পদে নিযুক্ত ছিলেন। কয়েকদিন বেশ আনন্দেই কাটিয়াছিল। ২৬ আগষ্ট প্রথমে প্রমথর এক পত্রে এবং পরদিন টেলিগ্রামে সংবাদ পাইলাম মন্টু, বউমা ও রেণুকা বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। সেইদিনই রাজু ঠাকুরকে খড়গপুর পাঠাইলাম। বন্ধুবর অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে মেদিনীপুরে একখানি পত্র লিখিলাম। ২৯শে আগষ্ট রাজু ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের একখানি পত্র লইয়া চক্রধরপুরে

ফিরিয়া আসিল। পত্রের সংবাদ দেখিলাম, রেণুকা রোগাক্রান্ত হইবার পর ১২ ঘণ্টার মধ্যেই মারা যায়, অপর দুইজনের চিকিৎসা চলিতেছে। এই মেয়েটীকে বড়ই ভালবাসিতাম; শোকে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলাম; একরূপ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলাম। এখন পর্য্যন্ত তাহার সেই দেবদুর্লভ অসামান্য রূপলাবণ্য, শান্ত সরল হাসি-মাখা মুখখানি, মৃদু কমনীয় প্রকৃতি মনে হইলে চক্ষু জলভারাক্রান্ত হয়; কিছুদিন কোন বিষয়ে মনোসংযোগ করিতে পারি নাই। অনুকূলের নিকট হইতে প্রতিদিন একখানি পত্র পাইয়াছিলাম। তিনি নিজে খড়গপুরে আসিয়া অথবা একটী পুত্রকে পাঠাইয়া প্রত্যহ রোগীদের খবর লইতেছিলেন। কামাখ্যাপদ ও জ্যোতির্ম্ময়ী নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও রোগীদের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিল। হায়, হায় কি অশুভক্ষণেই প্রমথর জননী পুত্রের ঘর সংসার পাতাইয়া দিবার জন্য সকলকে লইয়া খড়গপুরে গিয়াছিলেন; নিয়তিই রেণুকাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেই সময় খড়গপুরে বা পার্শ্ববর্ত্তী কোন স্থানে ঐ রোগে আর কেহই আক্রান্ত হয় নাই।

চক্রধরপুর থানার এলাকাভুক্ত সমস্ত ফৌজদারী মোকদ্দমার পুলিস রিপোর্ট এবং দরখাস্ত প্রভৃতি লইয়া বিচার করিবার ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হইয়াছিল। অন্যান্য থানার মোকদ্দমাও সময় সময় পাঠান হইত। আবগারি বিভাগের Advisory কমিটীর মেম্বর পদেও আমাকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ

কর্ত্তৃক এইরূপে দিন দিন আমার সম্মান বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া কয়েকটী মিউনিসিপাল কমিশনার জাতীয় স্বভাব গুণে ঈর্ষ্যায় পুড়িতে লাগিলেন। আমাকে অপদস্থ করিবার অভিপ্রায়ে নানাবিধ চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভাইস চেয়ারম্যানের পদ হইতে অবসর লইবার জন্য তদানীন্তন ডেপুটী কমিশনার মিঃ এ, গ্যারেট (Mr. A Garret I. C. S.) মহোদয়ের নিকট দরখাস্ত পাঠাইয়াছিলাম। তাহার উত্তরে তিনি লিখিলেন ঃ—"I am sorry to inform you that you can't be spared It is the good of your country and not ill health or growing infirmity that should govern you, if not your regard for me. Please reconsider your decision." ইহার উপর আর কথা নাই। স্থির করিলাম, যতদিন গ্যারেট মহোদয় এ জেলায় থাকিবেন, ততদিন সমস্ত অসুবিধা ভোগ করিয়াও কাজ চালাইতে হইবে।

এই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে স্থানীয় রাজা নরপৎ সিং দেও বাহাদুরের চারিটী কন্যার বিবাহ অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। বড় জামাতা মহারাজা এবং ছোট তিনটী রাজোপাধিধারী। কন্যাগুলির বিবাহ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইবার তিন চারি বৎসর পরে রাজা বাহাদুরের পত্নী বিয়োগ হয়। ইনি ছিলেন মৌরভঞ্জাধিপতির কন্যা। পত্নী বিয়োগের পর রাজা বাহাদুর পত্নীর নামে (রসাল মঞ্জরী)

একটি অবৈতনিক মডেল বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং Narayan Zenana Hospital নামে একটী Female ও Maternity Hospital অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য শুনিয়াছি গবর্ণমেণ্টের হাতে দেড়লক্ষ মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়াছেন। সাধারণের হিতকর কার্য্যেও প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেছেন। রাজ-ষ্টেটের ছোট বড় সমস্ত প্রজাবর্গ এবং আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাকে বার বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুরের উত্তরে সকলকেই নির্ব্বাক হইতে হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন :—

"ঘরে সদ্য বিধবা যুবতী কন্যা (জ্যেষ্ঠা কুমারী দুইটী পুত্র সন্তান প্রসবের পর বিধবা হইয়াছিলেন); তাহার সম্মুখে আমি একটী যুবতী ভার্য্যা লইয়া কোন মুখে সুখভোগ করিব?

"আমার বয়ঃক্রম পঞ্চাশের উপরে উঠিয়াছে, এবয়সে পুত্র মুখ দেখার সৌভাগ্য ঘটিলেও তাহাকে উপযুক্তরূপে মানুষ করিয়া যাইতে পারিব কিনা খুবই সন্দেহ। তারপর দ্বিতীয়া পত্নী যৌবন সীমা অতিক্রম না করিতেই সম্ভবতঃ আমাকে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হইবে; তখন তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে আচার-ভ্রষ্টা হইলে এই উচ্চ বংশে নিষ্কলঙ্ক কুলে একটা কলঙ্ক কালিমার রেখা পড়িবে।"

রাজা বাহাদুরের এই যুক্তিগুলি অখণ্ডনীয়; সকলেই তাঁহাকে দেবপ্রকৃতি মানুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিলেন।

১৯১৯ এপ্রিল মাসের শেষভাগে মিঃ গ্যারেট স্থানান্তরিত হওয়ায় মিঃ জে, ই, স্কট (Mr. J. E. Scott. I. C. S.) সিংভুমের ডেপুটী কমিশনার হইয়া আসিলেন। ইনি একজন বহুদর্শী ও সুদক্ষ কর্ম্মচারী। ইঁহার শাসনকালে আমার জীবনে এবং সংসারে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, আখ্যায়িকার যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করা হইবে।

মে মাসের প্রথম হইতেই দেশে যাইবার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। বিগত পাঁচ বৎসর আমি দেশে যাই নাই। এবৎসর গৃহিণী ধরিয়া বসিলেন আমাকেও যাইতে হইবে। কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইল না। ২৫শে মে ডাকগাড়ীতে যাত্রা করা হইল। প্রমথ খড়গপুর হইতে আমাদের সঙ্গী হইল। বহুবাজারে বন্ধুবর রামলাল দে মহাশয়ের বাটিতে দুইবেলা অবস্থিতি করিয়া তারপর শান্তিপুর যাত্রা করিলাম। রামলাল বাবুর সুযোগ্য পুত্র প্রভাত চন্দ্র শিয়ালদহ ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইয়া আমাদিগকে ট্রেণে উঠাইয়া দিয়া আসিলেন। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখন রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর যাতায়াতের জন্য এতগুলি ট্রেণ চলিত না। চুর্ণী নদীর পুলের উপর দিয়া ছোট গাড়ী যাইত না। রাণাঘাট হইতে একখানি ট্রেণ যাত্রীদিগকে ঐ নদীতীরে নামাইয়া দিয়া আসিত। খেয়ার নৌকায় নদী পার হইয়া উচু নীচু জায়গার উপর দিয়া কিছু দূর পদব্রজে যাইয়া আইসতলা ঘাট ষ্টেশনে শান্তিপুরগামী ছোট লাইনের (Light Ry). ট্রেণ ধরিতে হইত। এই ছোট রেল পথটী (narrow gauge) ১৮৯৯

সালে মার্টিন কোম্পানী খোলেন। পরে ১৯০৬ সালে মুর্শিদাবাদ (লালগোলা) লাইন প্রস্তুত হইলে ই, বি, রেল ইহার কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করেন। পরে ১৯২৫ সালে শান্তিপুর পর্য্যন্ত বড় লাইন হয় ও ছোট রেল স্বরূপগঞ্জ ঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। শিয়ালদহ ছাড়িয়াই দেখিলাম পত্নীর ভয়ঙ্কর জ্বর। রাণাঘাটে নামিয়া তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর চূর্ণীঘাটগামী ট্রেণ উপস্থিত হইল। সেই সময় আবার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অতিকষ্টে পত্নীকে লইয়া আইসতলা ঘাট ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিলাম এবং রাত্রি ১০টার সময় শান্তিপুরে তাঁহার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলাম। শ্বশ্রুঠাকুরাণীকে (পত্নীর বিমাতা) পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়ায় তিনি আমাদের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরদিন প্রথমে আমার শ্বশুর বংশের বন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রবীণ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ হইল। কিন্তু পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া শান্তিপুরের তাৎসাময়িক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এলোপ্যাথী ডাক্তার বামাচরণ দাস (ভজ বাবু) মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে রাখা হইল। শ্যালক পরেশ নাথ সেই সময় রামেশ্বরপুর অঞ্চলের সম্পত্তির সেটেলমেণ্ট কার্য্যের জন্য সপত্নীক সেইস্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভগ্নীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে তৎপত্নী প্রভাবতীকে শান্তিপুরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

পীড়ার ষষ্ঠ দিবসে, যখন পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে বসিয়া একখানি পুস্তক পড়িতেছিলাম সেই সময়, পত্নী ধীরে ধীরে আসিয়া আমার

নিকট বসিলেন। দুই চারিটা অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর কহিলেন, "দেখ, একদিন ত মরিতেই হইবে, তবে এই সুযোগে মরাই ভাল। জন্মস্থান, গঙ্গাতীর, গুরুর চরণ সম্মুখে রাখিয়া (বিমাতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন) তোমাকে, প্রমথকে, নাতি-পুতিগুলিকে দেখিতে দেখিতে মরাই আমার ইচ্ছা।" আমি স্বভাব সুলভ ব্যঙ্গ ও রহস্যচ্ছলে কহিলাম,—"সেজন্য ভাবিও না ; এবার সুস্থ হইয়া সকলকে লইয়া চল চক্রধরপুরে যাই ; ইহার পর যখন মরিতে ইচ্ছা হইবে, দুই চারিদিন পূর্ব্বে আমাকে জানাইও. আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিব।" পীড়ার দশম দিনে সব ফুরাইল। ১৯১৯।৩রা জুন অপরাহ্ণ ৩-৪৫ সময় সাধ্বী নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিলেন। আমার এত সুখের, এত সাধের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। অর্দ্ধ শতাব্দীর জীবন-সঙ্গিনী, সুখদুঃখভাগিনী আজ আমাকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। সর্ব্বলোকপ্রিয়া, সুশীলা, পতিপরায়ণা, দয়ামায়ার আদর্শরূপিনী দেবীপ্রতিম রমণী, আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়া তাঁহারই যোগ্যধামে গমন করিলেন। রাধিকা প্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র রমা প্রসাদ সেইদিন অপরাহ্ণে আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। সেও শববাহীদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে যাইয়া শবদাহ করিয়া আসিয়াছিল। যথাসময়ে শান্তিপুরেই পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ, সপিণ্ডকরণ, ব্রাহ্মণাদি ভোজন সমাধা করিয়া একদিন দিগনগরে গিয়াছিলাম ; শান্তি সস্ত্যয়ন প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, পৈতৃক ভদ্রাসনের সংস্কারাদির বন্দোবস্ত করাইয়া, কেবল একজনকে

চিরদিনের মত হারাইয়া অপর সকলকে লইয়া চক্রধরপুরে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। পত্নীর শ্রাদ্ধের দিন দেবেন্দ্র নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীপদ উপস্থিত হইয়া বিশেষ পরিশ্রম সহকারে ব্রাহ্মণাদি ভোজন কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল। দিগনগর হইতে বৃন্দাবন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পরাণ ভায়া এবং প্রজাবর্গের মধ্যে দুই চারিজনও আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় দুই তিনদিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম। ঐ সময় প্রমথর বাল্যবন্ধু মিঃ বীরেন্দ্র নাথ শাসমল ব্যারিষ্টার এবং বন্ধুবর দেবেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক এক একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া পরমাদরে আমাদিগকে আহারাদি করাইয়াছিলেন। ইঁহারা এবং রামলাল বাবুর পুত্রগণ চক্রধরপুর যাইবার দিন আমাদের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ উৎকৃষ্ট আম ও সন্দেশ দিয়াছিলেন। ২৪শে জুন সন্ধ্যার প্রাক্কালে চক্রধরপুর উপস্থিত হইলাম। আবার সংসার যথানিয়মে চলিতে লাগিল। কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র ও সুশীলা পুত্রবধূ আমার সেবা যত্ন, আহারাদির ব্যবস্থা ও সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে সমধিক লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। তথাপি আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই একটা মহা অভাব অনুভব করিতে হইতেছে। সময় সময় কিছু অসুবিধাও যে ভোগ করিতে না হয় তাহা নহে।

ইহার তিন চারি মাস পরে সাম্বৎসরিক শারদীয়া মহাপূজা, ৺কালীমাতার সাম্বৎসরিক পূজা প্রভৃতি যথানিয়মে সর্ব্বসাধরণের ব্যয়ে নির্ব্বাহ হইল। এই সমস্ত পূজোপলক্ষে স্বর্গীয়া পত্নী সংযত থাকিয়া পূজার সমস্ত আয়োজন করিতেন। পরদিন নিজ ব্যয়ে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ সজ্জনকে ভোজন করাইয়া তৃপ্তি লাভ

করিতেন। সমস্তই যথানিয়মে নির্ব্বাহ হইল এবং এখন পর্য্যন্ত সেই প্রথাবলম্বনে প্রমথ ও বউমা সেইরূপ ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইয়া থাকেন।

দুই একমাস পরে দক্ষিণ চক্ষুতে একটা রোগ (Glcoaumma) হইয়া বড়ই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম। চাইবাসা ও পুরুলিয়ার ডাক্তারদের দেখাইয়া কোন ফল না হওয়ায় প্রমথ আমাকে লইয়া কলিকাতায় গিয়াছিল। মেডিকেল কলেজে চক্ষু চিকিৎসার হাসপাতালে একটী দ্বিতল গৃহের ঘর (paying room) ভাড়া লইয়া অস্ত্রোপচারের পর সেইখানে প্রায় একমাস অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তথা হইতে বাহির হইয়া রামলাল দে মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। পার্শ্ববর্ত্তী কোন আত্মীয়ের একটী দ্বিতল বাটীতে আমার থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। যুগ্‌লা পরিচর্য্যার জন্য প্রথম হইতেই সঙ্গে ছিল। এই সময় রামলাল বাবুর কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ অতি সমারোহে নির্ব্বাহ হইয়াছিল। কয়টা দিন উদরদেবের সেবা বিহিত বিধানেই হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে ও ভগবদ্‌কৃপায় ঐরূপ গুরু আহারাদিতে বিশেষ অসুখ হয় নাই। বিবাহ ব্যাপার শেষ হইলে মিঃ শাসমল, চারু বাবু, মোহিনী মোহন প্রভৃতি অনেক বন্ধুবান্ধব প্রমথকে এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহারাদি করাইয়াছিলেন। আবার চক্রধরপুর আসিবার সময় রামলাল বাবুর পুত্রগণ, মিঃ শাসমল, দেবেন্দ্র ও মণিমোহন উৎকৃষ্ট আম ও সন্দেশ উপহার দিয়াছিলেন।

চক্ষুরোগ ও তাহার চিকিৎসা উপলক্ষে ক্রমে ক্রমে অনারারী কাজ হইতে পাঁচ মাসের বিদায় লইতে হইয়াছিল। একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট চাইবাসা হইতে সপ্তাহে দুইদিন আসিয়া মোকদ্দমার বিচার করিয়া যাইতেন। আমার পেস্কারের কাজ করিতেন রাম চন্দ্র মিশ্র নামক একজন উৎকল ব্রাহ্মণ। ইনি বেশ কার্য্যদক্ষ লোক ছিলেন ; সেই সময় মিউনিসিপালিটীর হেড ক্লার্ক ও একাউণ্টেণ্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন। পেসকারী কাজের জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক দশ টাকা পাইতেন। নানা কারণে মিউনিসিপাল কমিশনারবর্গের অসন্তোষভাজন হওয়ায় তাঁহারা একযোগ হইয়া রামচন্দ্রকে পদচ্যুত করিবার এমন কি জেলে দিবারও চেষ্টা করিতেছিলেন। সুযোগও উপস্থিত হইল। এখানকার ফৌজদারী মোকদ্দমার নথিপত্র পরীক্ষা করিয়া সদরে লইয়া যাইবার জন্য ডেপুটী কমিশনার বাহাদুর একজন সুবিজ্ঞ পেস্কারকে পাঠাইয়াছিলেন। পরীক্ষার ফলে তিনি দেখিলেন, দুইখানি সমনজারীর তলবানা দেড় টাকা হিঃ তিন টাকা কোর্ট ফি দরখাস্তে বসান হয় নাই ; অথচ কোর্ট ফি রেজিষ্টারীতে লেখা হইয়াছে। কমিশনারদিগের প্ররোচনায় পেস্কার বাবু একটু রং চড়াইয়া রিপোর্ট দাখিল করিলনে ; ডেপুটী কমিশনার বাহাদুর রামচন্দ্রকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিলেন। একটি তরুণ ডেপুটীর বিচারে রামচন্দ্রের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইল। অবিলম্বে আপীল করিয়া সেসন জজের বিচারে রামচন্দ্র অব্যাহতি পাইলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, কমিশনারগণ তাঁহাকে পদচ্যুত

করিলেন। অনন্যোপায় হইয়া রামচন্দ্র জজ বাহাদুরের রায়ের নকল এবং সার্টিফিকেটাদির বলে জামসেদপুর টাটা কোম্পানীর অধীনে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনের একটী চাকরী এবং বিনা ভাড়ায় থাকিবার একটি ঘর পাইয়াছিলেন। চক্রধরপুরে মিউনিসিপালিটী হইতে পঁচিশ টাকা এবং পেস্কারী কাজে দশ মোট পঁয়ত্রিশ টাকা পাইতেছিলেন। ইহজন্ম বা পূর্ব্বজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্যস্বরূপ ব্রাহ্মণ পুত্রকে কিছুদিন লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। রামচন্দ্রের এই লাঞ্ছনা দেখিয়া তমলুকের সেই নায়েব নাজির বিজয় বাবুর লাঞ্ছনার কথা মনে পড়িল। বিজয়ও এইরূপে লাঞ্ছিত হইয়া ভগবানের কৃপায় উচ্চ বেতনের কাজ পাইয়াছিল। সংসারে কত নির্দ্দোষ লোক যে শত্রুপক্ষের চক্রান্তে এইরূপ নির্য্যাতিত হইতেছে তাহার ইয়ত্বা নাই।

এই সময় (১৯২১) দেশময় একটা ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। আন্দোলনের নাম "অসহযোগ আন্দোলন"" (Non-Co-operation Movement)। এই আন্দোলন বিভিন্ন আকারে ঐরূপ অন্যান্য আন্দোলনের সহিত জড়িত হইয়া এখন পর্য্যন্ত চলিতেছে। যথা—Civil Disobedience, Boycott of British goods; Picketting of Excise shops, oreign cloth, No-tax Campaign প্রভৃতি। এই সকল আন্দোলনের স্থিতি, বিচার, পরিবর্ত্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে কত কমিশন, কত কত রিফরমের প্রস্তাব, মতভেদ, গৃহবিচ্ছেদ ঘটিতে লাগিল। এই সকল ইতিহাসপ্রসিদ্ধ

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ছাড়িয়া পুনরায় ঘরসংসারের কথা আরম্ভ করিতেছি।

১৯২১ সালের জুলাই মাসে স্বর্গীয় পূর্ণ চন্দ্র গোস্বামীর (ইনি মাতৃদেবীর পিসতুত ভাই) বড় আদরের কনিষ্ঠা কন্যা মনোরমা একটি নাবালক পুত্র লইয়া বিধবা হইয়াছিল। মেয়েটী বাল্যে হাসিয়া নাচিয়া গান গাহিয়াই কাটাইত। সদ্বংশজাত, অতি সুপুরুষ ও সচ্চরিত্র পাত্রের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। ভাগ্যদোষে যৌবনের প্রারম্ভেই তাহার উপর এই বজ্রাঘাত হইল। স্বামী বিধবার ও শিশু পুত্রের ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই সকল সকরুণ বিবরণযুক্ত একখানি সুদীর্ঘ পত্র মনোরমা আমাদিগকে লিখিয়াছিল। সেইজন্য অনেক-দিন পর্য্যন্ত প্রমথ তাহাকে নানাপ্রকারে অর্থ সাহায্য করিয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইতিপূর্ব্বে স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া চক্রধরপুরের খ্যাতি ছিল। বাংলাদেশের নানাস্থান হইতে বিশেষতঃ কলিকাতা অঞ্চল হইতে বর্ষাশেষে বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য অনেকে এখানে আসিতেন। কেহ কেহ আত্মীয় স্বজনের বাটীতে, কেহ বা পৃথক বাটী ভাড়া লইয়া থাকিতেন। আমার ক্ষুদ্র কুটীরেও আত্মীয় বন্ধু সমাগমের অভাব ছিল না। প্রমথ নাথের শ্যালীপতি ভাই নগেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় সপরিবারে, রাধিকা প্রসাদের পুত্র রমাপ্রসাদ, বাথানগাছির হরিমোহন ঘোষ, কলিকাতা টালাবাসী চারুচন্দ্র বিশ্বাস সপরিবারে, বউমার পিসতুত ভগ্নী ও ভগ্নীপতি ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য ভদ্রলোক আসিয়া আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে নগেন্দ্র নাথ, চারুচন্দ্র, হরিমোহন এবং রমাপ্রসাদের একটু বিশেষ পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নগেন্দ্র নাথের নিবাস বড়িষা। বিষয় সম্পত্তি কিছু আছে। কলিকাতা টাকশালের ষ্টোর কিপার (Store-keeper of the Calcutta Mint) পদে নিযুক্ত থাকায় কলিকাতাতেই বারমাস বাস করিতে হয়। বেশ ভদ্রলোক, সদালাপী ও আড়ম্বর-শূন্য।

চারুচন্দ্রের সহিত প্রথম পরিচয় ১৮৯৫ সালে। যে সময় কোলহান গবর্ণমেণ্ট ষ্টেটের সেটেলমেণ্ট কাজে চাইবাসায় ছিলাম, সেই সময় চারুচন্দ্র কি একটা কোম্পানীর অধীনে কেরাণীগিরি পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরে নানাস্থানে নানাপ্রকার কাজ করিয়া অবশেষে কলিকাতার টাকশা:ে. একটী চাকরী পাইয়াছিলেন। চাকরী উপলক্ষে আমি যে যে স্থানে বদ্‌লী হইয়াছি, তাহার অনেক স্থানেই চারুচন্দ্র যাইয়া দুই চারিদিন আমোদ প্রমোদ করিয়া আসিয়াছেন। আমি এবং প্রমথ নাথও দুই চারিবার তাঁহার টালার বাটীতে অতিথি হইয়াছি। লোকটি অতি সরল, মিষ্টভাষী, পরোপকারী, আমোদপ্রিয় ও সুকণ্ঠ গায়ক।

হরিমোহনের নিবাস দিগনগরের নিকটবর্ত্তী বাথানগাছি গ্রামে। ইনি শেষ অবস্থায় হুগলির কালেক্টারীর নাজিরী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময় নিজগ্রামে নানারূপ ফলফুলের সুন্দর বাগিচা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইনি আমারই ন্যায় অমিত-ব্যয়ী, আমোদপ্রিয় এবং সদানন্দ লোক ছিলেন। ইঁহার কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেও উল্লেখ করিয়াছি। সাংসারিক অশান্তিতে নাকি ইঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল এবং সেই অবস্থাতেই মৃত্যু হয়।

রমাপ্রসাদ রাধিকা প্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রথমা পত্নী আরও একটী পুত্র এবং একটী কন্যাকে রাখিয়া পরলোক গমন করিলে রমাপ্রসাদের পিতা পুনরায় দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভেও দুইটি পুত্র ও তিনটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পিতামহ রঘুরাম ও তৎসহোদর পার্ব্বতী চরণ প্রভৃত সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। শৈশবে পিতৃবিয়োগের পর রাধিকা প্রসাদের মাতুলবংশ অভিভাবকস্বরূপ সংসারে প্রবেশ করিয়া অনেক কিছুই উদরস্থ করেন। পরে ভাগ্যদোষে দরপত্তনি তালুক কয়খানি বাহির হইয়া যায়। যাহাই হউক, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত রাধিকা প্রসাদ বেশ বাবুগিরির সঙ্গেই কাটাইয়া গিয়াছিলেন। সমস্ত সম্পত্তি এমন কি ভদ্রাসন বাটী পর্য্যন্ত বন্ধক রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। সুতরাং রমাপ্রসাদের ইউনিভারসিটি শিক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। পিতৃবিয়োগের পরেই তাহার উপর সেই বৃহৎ পরিবারের সমস্ত ভার পড়িল ; তাহাকে অগত্যা চাকুরীতে প্রবিষ্ট হইতে হইল। মিতব্যয়িতা গুণে, চাকরীর যৎসামান্য আয় এবং জমি জায়গার আয় হইতে নিজ পরিবার, বিমাতা এবং সমস্ত ভাই ভগ্নীগুলির ভরণপোষণ, বিদ্যাশিক্ষা এবং ভগ্নীগুলির বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পিতার রাশীকৃত ঋণ পরিশোধ করিয়া, বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধারের কোন উপায় না দেখিয়া, কতক ভূসম্পত্তি এবং পৈতৃক বিশাল অট্টালিকার কতকাংশ বিক্রয় করিয়া ঋণমুক্ত হইয়াছিল। সংসারে নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও রমাপ্রসাদ লেখাপড়ার চর্চ্চা পরিত্যাগ করে নাই। একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী অনেকের অপেক্ষা রমাপ্রসাদের উচ্চতর

শিক্ষালাভ হইয়াছিল। সাধারণের হিতকর কার্য্যেও রমাপ্রসাদ অগ্রণী হইয়া অদম্য উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছে। রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর পর্য্যন্ত বড় রেল লাইন (broad gauge) মাত্র এক রমাপ্রসাদের অদম্য চেষ্টার ফল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দিগনগরের ডাকঘর ও শান্তিপুর কৃষ্ণনগর ছোট রেল তাহার চেষ্টায় আজও বর্ত্তমান আছে। এক্ষণে (১৯৩২) রমাপ্রসাদ দিগনগর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত আছে; অতীব সুখ্যাতির সহিত কাজকর্ম্ম করিতেছে। কিছুদিন হইল বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুর প্রকাশ্য দরবারে কার্য্যদক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ রমাপ্রসাদকে একটী রৌপ্যমণ্ডিত মূল্যবান ছড়ি ও একখানি প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট উপহার দিয়াছেন। রমা-প্রসাদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে দিগনগরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে।

১৯২১ সালের সাম্বৎসরিক কালীপূজা ও তদানুসঙ্গিক যাত্রা-গানাদি সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ হইল। এই সময় হইতেই চক্রধরপুরে শীতের প্রারম্ভ, এবং সমস্ত শীতকালটাই আমি সর্দ্দি, কাসি প্রভৃতি রোগে কয়েক বৎসর কষ্ট পাইতেছি। বাটীতে সেবা যত্নের ও চিকিৎসার ত্রুটি ছিল না। সময় সময় বন্ধুবান্ধববর্গ আসিয়া নানারূপ গল্পগুজবে মনটাকে প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিতেন। কেহ কেহ নিজের মনোমত উপদেশও দিতেন। উদাহরণস্বরূপ দুই একটি নিম্নে লিপিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না :—

১। কেহ আসিয়া কহিলেন,—"মহাশয়, আপনি একেবারে শুকাইয়া যাইতেছেন ; সমুদ্রতীরে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া দুই তিনমাস থাকিলে আপনি বেশ উপকার পাইবেন।"

২, দ্বিতীয় বন্ধু কহিলেন,-"দাদা, এ কর্ম্মভোগ আর কেন ? সমস্ত ছাড়িয়া কাশীবাস করুন ; বাবা বিশ্বেশ্বরের কৃপায় আপনি নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন।"

৩। আর একজনের উপদেশঃ—"দাদা, ওসব কিছু নয়, দিবারাত্রি প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ করুন ; সেই সঙ্গে অন্ততঃ পাঁচশত বার গায়ত্রী জপ করুন ; দেখিবেন, সত্বরেই আপনার সমস্ত রোগ, জ্বালা, যন্ত্রণা দূর হইবে।"

৪। তারপর আর একজন আসিয়া কহিলেন ; "কর্ত্তা, আপনার ত তেমন কিছু হয় নাই। খুব শীত পড়িয়াছে, দুই তিনটা ভোজ হাতে রহিয়াছে ; কপি কড়াইসুটী, মাছ প্রভৃতি আজকাল খুব আমদানী ; বলুন ,এক একটা করিয়া হইয়া যাউক, আপনাকে কিছুই করিতে হইবে না ; আমরাই সব করিব।"

৫। আর একটী বন্ধু আসিয়া কহিলেনঃ—"শালাগো মাতায় পাচ ঘা যুতা মারুন ; একদণ্ড আপনাকে তিষ্ঠিতে দিবে না। গর্ব্বশ্রাবদের কতায় কাণ দিবেন না ; আপনার এই কাতর শরীর ; দুই বাই বশ্যা একটু ফুরতি করা যাবে ; সব সার্‌য্যা যাইবে।" তারপর গান, "বাকা শ্যাম বাজায় বাঁশী, চল একবার দেখ্যা আসি" ইত্যাদি। *

---

* কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না, এই সরলহৃদয় বন্ধুটী সুদূর পূর্ব্ব-

১ ও ২ নম্বর উপদেশ মনে লাগিল; কিন্তু প্রভূত অর্থের প্রয়োজন; কোথায় পাইব? ৩ নম্বর উপদেশটী শুনিতে সহজ হইলেও যেভাবে প্রণব উচ্চারণ ও গায়ত্রী জপ করা কর্ত্তব্য তাহা পারিব কিনা সন্দেহ। তাহা হইলেও উপদেশমত কাজ করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। ৪ ও ৫ নম্বর উপদেশ খুব মনে লাগিবারই কথা, কারণ উহাতে কেবল ভোজের ব্যাপার।

চক্রধরপুরে সে সময় বি, এন রেল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত একটী M. E. স্কুল ছিল। কিন্তু ঐ স্কুলে বাংলাভাষা শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেইজন্য নানা আলোচনার পর স্থির হইল, তমলুক সবডিভিসনের অন্তর্গত পাঁশকুড়া H. E. স্কুলে প্রমথর বড় ছেলে দুইটাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইবে। আমাদের বহুদিনের পরিচিত শ্রীযুক্ত কৃষ্টানন্দ দাস সবরেজিষ্ট্রার ঐ স্কুলের সেক্রেটারী এবং ঐ স্থানে পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া একরূপ স্থায়ীভাবেই বাস করিতেছিলেন। আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। স্থানটীও অস্বাস্থ্যকর নহে। অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়েই ছেলে দুটীর বাসা খরচ প্রভৃতি নির্ব্বাহ হইবে। এই সকল বিবেচনা করিয়া প্রভাত ও নসুকে (বীরেন্দ্র) পাঁসকুড়ায় পাঠান হইল।

৯।৪।২২ তারিখে আমাদের কৃষ্ণনগরের শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র

বঙ্গবাসী। সেই অঞ্চলের অধিবাসীরা কথাবার্ত্তা কহিবার সময় "থ" স্থানে "ত", "ড়" স্থানে "র", "ভ" স্থানে "ব" ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং "ঁ" টা বর্জ্জন করিয়া থাকেন।

সেন একজিকিউটিব (Executive) ইন্‌জিনিয়ার মহোদয়ের বিদায়ী ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া চাইবাসায় যাইতে হইয়াছিল। চাইবাসার সকল শ্রেণীর গণ্যমান্য বাঙ্গালী ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সবডিভিসনেল অফিসার শ্রীযুক্ত রাধিকা চরণ গুঁই মহাশয়ের উদ্যোগেই বিদায়ী ভোজটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে নির্ব্বাহ হইয়াছিল। ক্ষীরোদ বাবু অতি সদাশয়, সদ্বিবেচক এবং নিরহঙ্কার অমায়িক লোক। পরে ইনি রায় বাহাদুর উপাধি সহ সুপারিণ্টেণ্ডিং ইনজিনিয়ার পদে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

১৯২২ সালের ১৮ই জুন তারিখে বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর স্যর হেনরী হুইলার (Sir Henry Wheeler K C S. I. etc.) মহোদয় চাইবাসায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া চাইবাসায় গিয়াছিলাম। লাট বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎও (private interview) হইয়াছিল। পাঁচ মিনিট মাত্র সময়ের মধ্যে আমার নিজের এবং চক্রধরপুর সংক্রান্ত অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাঁহার সৌজন্যে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম।

প্রমথ নাথের মাতুল পরেশ নাথ অনেকদিন হইতে নানাবিধ কঠিন রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। জুন মাসে প্রমথ কয়েক-দিনের জন্য দেশে গিয়াছিল। মাতুলের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে চক্রধরপুরে আনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু পরেশের মাতা ও পত্নী এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় শান্তি-

পুরেই চিকিৎসা চলিতে লাগিল। ২১শে আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইলাম। পরেশের মাতাঠাকুরাণী দৃষ্টিহীনা ; পরিণত বয়সে অন্ধের যষ্টিস্বরূপ একমাত্র পুত্র এবং তাহার বিধবা পত্নী জীবনের একমাত্র অবলম্বন স্বামীকে হারাইয়া যে কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন, তাহা সকজেই অনুমেয়। প্রমথ নিজে এবং তাহার একটী পুত্র সে সময় পীড়িত থাকায়, গোপাল ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে অগত্যা আমাকেই শান্তিপুর যাত্রা করিতে হইল। উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, হৃদয়বিদারক দৃশ্য। একদিকে পরেশের মাতা, আর একদিকে সদ্য বিধবা পত্নী ভূমি শয্যায়। কয়েকটী প্রতিবেশিনী নিকটে বসিয়া কাঁদিতেছে। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। আমার উপস্থিতি সংবাদ প্রতিবেশিনীগণের মুখে শুনিয়া তাঁহাদের শোক প্রবল হইয়া উঠিল। হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শোকের বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, পরেশের পীড়া, চিকিৎসা, সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানাইলেন। বুঝিলাম, বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে নানাবিধ অযথা ব্যয়ে পরেশ নাথ পিতার সযত্ন সঞ্চিত ত্রিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ (Govt. Promissory Notes), বাদশাহী আমলের অনেকগুলি পুরাতন মোহর, পত্নীর অন্যূন তিন হাজার টাকার মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার, রূপার বাসন, সোণার ঘড়ি, টেবিল হারমোনিয়ম প্রভৃতি নষ্ট করিয়া অবশেষে মূল্যবান বাগবাগিচা, অনেকগুলি প্রজালী জমি, এমন কি সেই চারিমহল সুদৃশ্য অট্টালিকা বন্ধক রাখিয়া স্বর্গারোহণ

করিয়াছেন ; শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। শ্বশুর মহাশয়ের পুরাতন বন্ধু এবং অন্যান্য ভদ্রলোকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, কতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করাই সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। এই কাজগুলি সমাধা করিতে এবং বন্ধকী সোণার ঘড়ি ও এক প্রস্থ রূপার বাসন উদ্ধার করিতে অন্যূন চারি হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। সে সময় কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া প্রমথর সঙ্গে এই সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য চক্রধরপুরে ফিরিয়া আসিলাম।

১৯২২ সালের নবেম্বর মাসের প্রথম ভাগে প্রমথ শান্তিপুর গিয়াছিল। তাহার স্বর্গীয়া মাতার কিছু অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া মিঃ বি, বড়ুয়ার নিকট হইতে এক হাজার টাকা ঋণ লইয়া এবং একটী আম্র বাগান বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করা হইল। সোণার ঘড়িটা ও রূপার বাসনগুলি উদ্ধার করা হইয়াছিল, ভদ্রাসন বাড়ীটীও রক্ষা হইল। পরেশ নাথের মাতা ও বিধবা পত্নীর অবর্ত্তমানে প্রমথ নাথই মাতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। দিগনগরের সেই পৈতৃক বাটীর মালিক আমরা ছয়জন। কথায় বলে "ভাগের মা গঙ্গা পায় না।" আমাদের অংশ পত্নী বর্ত্তমানে বাসোপযোগী করিয়া রাখিতেন। প্রতি বৎসর দেশে যাওয়া ছিল তাঁহার একটী প্রধান কাজ। এখন ঐ বাড়ী ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইবার অধিক বিলম্ব নাই বুঝিয়াই শান্তিপুরের বাড়ীটা রক্ষা করা হইল। দেশে একটা আস্তানা থাকা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। মধ্যম সহোদর দেবেন্দ্র নাথের পুত্র কালীপদ ও কানাই নবদ্বীপে

মাতামহ প্রদত্ত একতালা পাকা বাড়ীর উপর দোতালা প্রস্তুত করাইয়া সেইখানেই বাস করিতেছে, মাতামহ কিছু জমি জায়গাও তাহদিগকে দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং দিগনগরের পুরাতন ঘর বা বাড়ীর উপর দৃষ্টি করিবার তাহাদের আর প্রয়োজন নাই। স্বর্গীয় রাজেন্দ্র নাথের পত্নী ৺কাশীধামে বাস করিতেছেন। রাজেন্দ্র নাথ তাঁহার বিধবা পত্নীর ভরণপোষণের জন্য (Hindu Family Annuity Fund) হিন্দু ফ্যামিলী এনুইটি ফণ্ড হইতে প্রতিমাসে কিছু টাকা পাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া-ছিলেন। কয়েক শত টাকার কোম্পানীর কাগজও রাখিয়া গিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত সম্পত্তির আয় হইতেও সময় সময় কিছু পাইতেছেন ; আমরা এখান হইতেও কখন কখন কিছু অর্থ সাহায্য করিতেছি। ব্রাহ্মণের বিধবার সম্ভবতঃ ইহাতে একরূপে কাশীবাসের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে। আমাদের সরিক শ্রীপতি, শচীপতি বা শ্রীশচন্দ্রও তাহাদের অংশের ঘর দুয়ারগুলি রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা না করায় সেগুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

অতঃপর চক্রধরপুর থাকিয়া প্রমথ নাথ ডাক্তারী ব্যবসায় চালাইবে স্থির হইলে ১৯২৩ এপ্রেল মাসে একটী ডাক্তারখানা গৃহ নির্ম্মাণ করা হইল। খড়্গপুর হইতে আলমারী, বেঞ্চ, টেবিল চেয়ার এবং সেখানকার সমস্ত আসবাব চক্রধরপুরে আনা হইল।

এই সময় বন্ধুবর দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক আমার সঙ্গে কয়েকদিন একত্রে থাকিবার অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, যে ভীম নাগের সন্দেশ, গলদা চিংড়ী, নূতন পটল

প্রভৃতি নানাবিধ উপাদেয় জিনিষ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। অনেক দিন পরে তাঁহাকে পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। কিন্তু দেখিলাম, তাঁহার সেই বীর কলেবর আর নাই; সেই উজ্জ্বল চক্ষু, সহাস্য বদন আর নাই; একেবারে যেন শুকাইয়া গিয়াছেন; রোগে তাঁহাকে একেবারে ম্রিয়মান, স্ফূর্ত্তিহীন করিয়া ফেলিয়াছে। আছে কেবল সেই অনন্যসাধারণ গোঁফজোড়াটী। যাহা দেখিয়া তমলুকের একটী মুন্সেফ তাঁহার নাম দিয়াছিলেন, "Master Moustache"। ১৮৯১ সালে আমার বর্দ্ধমান অবস্থিতি-কালে ইনি একটী বন্ধুর সহিত বাজি রাখিয়া বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ দীঘি "রাণীসায়ের" উত্তর দক্ষিণে সন্তরণ পূর্ব্বক পার হইয়াছিলেন। বাজি ছিল উপর্য্যুপরি তিন শনিবারে তিনটী ভোজ। ভোজগুলি যথাক্রমে আদায় করা হইয়াছিল। পরাজিত ব্যক্তি ছিলেন রায় বাহাদুর রামগতি মুখোপাধ্যায়ের পুত্র অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়। দেবেন্দ্র ও অঘোরনাথ দুইজনেই সেই সময়ে বর্দ্ধমানে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এপ্রেল মাসটা এবং মে মাসের কিছু দিন কেবল ভোজের ব্যাপারেই কাটিয়া গেল। চাইবাসার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্থানান্তরে বদলী উপলক্ষে বিদায়ী ভোজ, দ্বিতীয় পৌত্র নন্তু বাবুর উপনয়নের ভোজ, পঞ্চম পৌত্র টুনু বাবুর কঠিন পীড়া আরোগ্যের পর ৺কালীমাতার পূজা ও তদানুসঙ্গিক ভোজ, আমার মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনের ভোজ, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং ধীরেন্দ্র সান্ন্যালের প্রীতি-ভোজ

প্রভৃতি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। মে মাসের প্রথমেই গোকুল বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্রনাথের (ভুতু ভাই) বিবাহ ব্যাপারেও বড় রকমের ভোজ। মহামিতব্যয়ী গোকুল বাবু বৈবাহিক প্রদত্ত নগদ টাকা সমস্তই বউভাতের ভোজে ব্যয় করিয়াছিলেন।

নস্থু বাবুর (প্রমথনাথের দ্বিতীয় পুত্র) উপনয়নের কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ৺কালীঘাটে নস্থুর উপনয়ন হইয়াছিল। নস্থু বাবুর সেই মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিক বসন, প্রকাণ্ড একগুচ্ছ শুভ্র উপবীত, মুদ্রিত নয়নে, একাগ্র চিত্তে সন্ধ্যা আহ্নিক, আহারকালে মৌনব্রত অবলম্বন এবং অসাধারণ গাম্ভীর্য্য, সেই সঙ্গে পাঁউরুটি, বিস্কুট, পলাণ্ডু প্রভৃতি দর্শনে নাসিকা কুঞ্চন প্রভৃতি দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতাম না। দেখিলাম, "দিলজান সেখ এক দিনেই পয়গম্বর বনে গ্যাছে।" ভায়ার বাহাদুরী, প্রায় এক বৎসর কাল সাত্ত্বিক ভাবেই কাটাইয়াছিলেন।

চক্রধরপুরের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী বাসিন্দা মহেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় ১৯২৩ সালের ১৯শে মে তারিখে পরলোক গমন করেন। প্রায় ৩৫ বৎসর বা তদুর্দ্ধকাল সাহা কোম্পানীর (W. C. Shaw & Co.) দোকানে মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনের চাকরী করিয়া অসাধারণ অধ্যবসায়, অকাতর পরিশ্রম, মিতাচার, মিতব্যয়িতা দূরদৃষ্টি প্রভৃতি সদ্‌গুণের সাহায্যে মৃত্যুকালে চক্রধরপুরে ৭।৮ খানি পাকা বাড়ী ১০।১৫ বিঘা চাষের জমি, কয়লা, চূণ, সিমেণ্ট প্রভৃতির কারবার রাখিয়া গিয়াছিলেন। মহেন্দ্র বাবুর জীবন

একটী আদর্শ জীবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গলাভ করেন। দ্বিতীয় পুত্র রাধিকাপ্রসাদ এবং কনিষ্ঠপুত্র ত্নলালকিশোর পিতার অনেকগুলি সদ্‌গুণ, বিশেষতঃ বিষয়বুদ্ধির, উত্তরাধিকারী হইয়া ভগবানের কৃপায় কারবারের সমধিক বিস্তার ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং দিন দিন তাঁহাদের পসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইতেছে।

১৯২৩।৩রা জুন তারিখে গবর্ণমেণ্ট হইতে তারযোগে সংবাদ পাইলাম, সম্রাটের জন্মদিনে আমাকে "রায় সাহেব" উপাধি দেওয়া হইয়াছে। জীবনসন্ধ্যায় এই রাজসম্মানটুকু পাইয়া নিশ্চয়ই একটু আনন্দ হইয়াছিল; এবং ইহার জন্য জগদম্বার নিকট অবশ্যই আমি কৃতজ্ঞ। তবে পুলিশের বিষ নজরে না পড়িলে ১৯০৮।৯ সালেই "রায় বাহাত্নর" উপাধি লাভ করিতে পারিতাম। জীবনীর প্রথম খণ্ডে যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

স্বর্গীয় রাধিকাপ্রসাদের মধ্যম পুত্র বিজয়প্রসাদ এই সময় এখানকার মিউনিসিপালিটীর হেড ক্লার্ক ও একাউণ্টেণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিল; পত্নী ও পুত্রকেও আনিয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে অন্য স্থানে একটী অধিক বেতনের চাকরী পাইয়া চলিয়া গিয়াছিল।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ত্নই চারিটী কথা এই স্থানে লিখিতেছি। জলপ্লাবনে ভারতের নানা স্থানে অনেক জনপদ, সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং কৃষিপ্রধান স্থানের সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল।

হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিবাদসূত্রে নানা স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। কংগ্রেস (Congress) ও অসহযোগী (Non-Co-operation) দলের মধ্যে মতভেদ এবং বিচ্ছেদ; বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত উপনিবেশ-গুলিতে ভারতবাসীর নানারূপ নির্য্যাতন প্রভৃতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯২৩।৩রা অক্টোবর তারিখে আমার মধ্যম সহোদর শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ একটি ভক্ত সঙ্গে হঠাৎ চক্রধরপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড়ই আনন্দ হইল। এখানে দুই দিন অবস্থিতি করিয়া পল্লীস্থ আবালবৃদ্ধবণিতাকে হরিনাম মাহাত্ম্য শুনাইয়া-ছিলেন এবং নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার তৃপ্তির জন্য একদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞ অনেকগুলি ভদ্রলোক এবং মেদিনীপুরের অন্যতম জমিদার প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গী চৌধুরী যামিনীনাথ মল্লিক মহাশয় (সেই সময় বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য এখানে আসিয়াছিলেন) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত হইয়া নাম সংকীর্ত্তনে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এখান হইতে দেবেন্দ্রনাথ সম্বলপুরে গিয়াছিলেন এবং ফিরিবার পথে পুনরায় দুই দিন এখানে অবস্থিতি করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া-ছিলেন। সেই সময় দেবেন্দ্রনাথের পত্নী ও মধ্যমা কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী আদ্রায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই পথে দেশে ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় প্রমথ নাথ ও বৌমা দেবেন্দ্র নাথের সঙ্গে মিষ্টান্ন ও নানাবিধ শাকসব্জী দিয়া-

ছিলেন। দেবেন্দ্র নাথের নিজ ব্যবহারের জন্য একখানি নূতন কম্বল, একজোড়া ধুতি, এবং নগদ অর্থও কিছু দিয়াছিলেন।

পূর্ব্ব সংকল্পানুসারে ১৬।১০।২৩ তারিখে এখান হইতে যাত্রা করিয়া ১৭।১০।২৩ কলিকাতায় অবস্থিতির পর ১৮ই অক্টোবর শান্তিপুর উপস্থিত হইয়া শুনিলাম পরেশনাথের মাতাঠাকুরাণী পূর্ব্ব রাত্রিতে স্বর্গলাভ করিয়াছেন। স্বর্গীয় রায় বাহাদুর শশী ভূষণ দত্ত মহাশয়ের পুত্র সৌরীন্দ্র মোহন ডাক্তার যোগেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে আমার আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। শচিপতির জ্যেষ্ঠপুত্র প্রকাশ চন্দ্র আমার পূর্ব্বেই শান্তিপুর উপস্থিত হইয়াছিল। প্রতিবেশিনী নিরাশ্রয় প্রাচীনা মনোমোহিনী ঠাকুরাণী পরেশনাথের মাতার নিকট থাকিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছিলেন। পরেশনাথের আত্মীয়া বীণাপাণি নাম্নী একটি স্ত্রীলোকও তাঁহার পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা উপলক্ষে ঐ বাটীতে বাস করিতেছিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ২১।১০।২৩ তারিখে চক্রধরপুরে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম।

১৯২৩ সালের ২৬শে অক্টোবর চক্রধরপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচনের দিন। স্থানীয় অনেকগুলি ভদ্রলোক প্রমথনাথকে কমিশনারের পদে নির্ব্বাচন করিবার অভিপ্রায়ে নিজ ব্যয়ে মোটর ভাড়া করিয়া ভোট সংগ্রহ জন্য ছুটাছুটী করিতেছিলেন। এদিকে নির্ব্বাচনের পূর্ব্বদিনও প্রমথ এবিষয়ে মনোযোগ না দিয়া কলিকাতা হইতে সমাগত কয়েকটী বন্ধুর সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াইয়া রাত্রি দশটার সময় ফিরিয়া আসিল। তৎ-

পূর্ব্বেই আমি আহারাদি করিয়া শয়ন করিয়াছিলাম। পরদিন নির্ব্বাচনের সময়ও প্রমথ উপস্থিত হইল না, তাহার এইরূপ আচরণে বিরক্তি প্রকাশ করায় দুঃখিত না হইয়া বরং উত্তেজিত হইয়া উঠিল। প্রমথ যখন স্থায়ীরূপে চক্রধরপুরে ডাক্তারী ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে তখন যাহাতে রাজপুরুষদের এবং ছোট বড় সর্ব্বসাধারণের সহিত সুপরিচিত হয়, যাহাতে সমাজের ও সাধারণের হিতকর কার্য্যে অভিজ্ঞতা জন্মে, যাহাতে তাহার মান সম্মান বৃদ্ধি হয় এই উদ্দেশ্যেই তাহাকে কমিশনার পদে নির্ব্বাচিত করিবার জন্য আমাদের বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ, কাজেই তাহা হইল না।

নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে ইন্‌কমট্যাক্স কমিশনার রায় বাহাদুর সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয়ের আগমন এবং একদিন অবস্থিতি ; তাঁহার সেই সুকণ্ঠ-নিঃসৃত মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ। রমাপ্রসাদের আগমন ও কয়েকদিন অবস্থিতি ; বন্ধুবর মিঃ সুকুমার বসুর নানাবিধ ফলমূল, মৎস্য, মিষ্টান্ন, ভাল তামাক প্রভৃতি উপহার লইয়া আগমন এবং কয়েকদিন অবস্থিতি। শরীরটাও একটু ভাল ছিল ; বেশ আনন্দেই দুইটা মাস কাটিয়াছিল। কেবল সময় সময় সুখদুঃখ-ভাগিনী জীবন-সঙ্গিনীর অভাবে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিত।

আজ ১৯২৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ; একটী বৎসর পূর্ণ হইল। "ক্ষুদ্র জীবনের কথার" দ্বিতীয় খণ্ডের এই পরিচ্ছেদ এই স্থানেই শেষ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আজ রাজকীয় নববর্ষ, ১৯২৪ সালের প্রথম দিন। বাংলা ১৩৩০ সালের ১৬ই পৌষ। যথারীতি প্রাতঃকৃত্য সমাধান্তর বন্ধুবর হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের (Asst. Accountant, Doubling Dept. B. N. Ry.) ভবনে যাইয়া, তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে নববর্ষের প্রথম দিনের (New Year's Day) আমোদ প্রমোদের আয়োজন সম্বন্ধে একটা কিছু স্থির করিতে বাহির হইব, এমন সময় চৌধুরী যামিনী নাথ মল্লিক আসিয়া আমাদের সমস্ত সংকল্প উল্টাইয়া দিলেন। শুনিলাম তাঁহার শ্বশুর তমলুকের সুপ্রসিদ্ধ ত্রৈলক্য নাথ রক্ষিত মহাশয় স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কন্যা (যামিনী নাথের পত্নী) পিতার চতুর্থী শ্রাদ্ধ এই-খানেই সম্পন্ন করিয়া ব্রাহ্মণ সজ্জন এবং বন্ধুবান্ধবদিগকে সেই রাত্রিতেই আহারাদি করাইবেন। সন্ধ্যার পর সংকীর্ত্তনের আয়োজনও করিতে হইবে। ভগবানের কৃপায় সমস্ত কাজই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ হইয়াছিল। প্রকৃতই সেদিনকার মনোমুগ্ধকর সংকীর্ত্তনে ভাবে বিভোর হইয়া বৃদ্ধ রাজকুমার সরকার, হেমচন্দ্র, আমি নিজে এবং যামিনী নাথ প্রভৃতি সকলেই, হেড পণ্ডিত রামপদ পালের সেই গগনভেদী মৃদঙ্গের তালে তালে একরূপ উন্মত্তভাবে নাচিয়া, নাচিয়া গাইয়া

গাইয়া, প্রেমাশ্রু বিগলিত নেত্রে সংসারের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পরমানন্দে কাটাইয়াছিলাম।

এই স্থলে হেমচন্দ্রের একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী জয়নগর গ্রামে ইঁহার বাসস্থান। উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইলেও, ইনি একজন অসাধারণ মার্জ্জিত রুচির সদাশয় ও হৃদয়বান্ লোক ছিলেন। পরের উপকার করিবার সুযোগ উপস্থিত হইলে ইঁহার অপরিসীম আনন্দ হইত। কোন একটা বিশেষ কারণে বিবাহিতা পত্নীর সহিত মনোমালিন্য হওয়ায়, যৌবনের শেষ সীমায় কাশীধামে যাইয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রায় সমবয়স্ক একটি বাঙ্গালী বিধবার সহিত কোন দেবমন্দিরে সন্ধ্যারতির পর ইঁহার আলাপ পরিচয় হয়। এই রমণী প্রতি সন্ধ্যায় দেবমন্দিরে সুমধুর স্বরে স্তোত্র পাঠ এবং নাম সংকীর্ত্তন করিতেন। অনেক স্ত্রী পুরুষ তন্ময় হইয়া সেই উচ্ছ্বাসপূর্ণ সংকীর্ত্তন শুনিতেন। হেমচন্দ্রও ক্রমে এমনই মুগ্ধ হইলেন যে পরিশেষে এই রমণীকে বৈষ্ণবমতে কণ্ঠি বদল করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। তারপর এই রমণী চিরদিনই হেমচন্দ্রের জীবন-সঙ্গিনী হইয়া সর্ব্বত্রেই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহাদের ক্ষুদ্র সংসারে “বারমাসে তের পার্ব্বণ” লাগিয়াই থাকিত। প্রতি বৎসর ৺অন্নপূর্ণা মাতার পূজা করিতেন। কলিকাতা হইতে প্রতিমা এবং পূজার সমস্ত উপকরণ, গঙ্গাজল প্রভৃতি আনাইতেন ব্রাহ্মণ, সজ্জন ও বন্ধুবান্ধবদিগকে সেইদিন পরিপাটীরূপে আহার

করাইতেন। কাঙ্গালীদিগকে পরিতোষরূপে আহার করাইতেন। একবৎসর স্থানীয় ভূম্যাধিকারী রাজা নরপৎ সিং দেও বাহাদুর নিমন্ত্রিত হইয়া সদলবলে হেমচন্দ্রের ক্ষুদ্র কুটীরে উপস্থিত হইয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রও রাজা বাহাদুর এবং পারিষদবর্গের জন্য কলিকাতা হইতে সংগৃহীত প্রচুর পরিমাণ উপাদেয় মিষ্টান্ন এবং এখানে দুষ্প্রাপ্য উৎকৃষ্ট ফলমূল পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রমথ নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাত নাথ লেখাপড়া ছাড়িয়া বসিয়া আছে দেখিয়া, হেমচন্দ্র তাহাকে নিজের অধীনে একটী কেরাণী-গিরী পদে নিযুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। প্রভাত বেশ বুদ্ধিমান্ এবং উদ্যমশীল হইয়াও, নিতান্ত অস্থিরচিত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। নচেৎ সেই সময় একটু চেষ্টা করিলেই বি, এন, রেল কোম্পানীর একাউন্ট বিভাগে (Accounts Department) একটী স্থায়ী চাকরী পাইত। সেটা ১৯২৪ সাল, আর আজ ১৯৩২ সাল; এই আট বৎসরে প্রভাতের যথেষ্ট পদোন্নতি হইতে পারিত। এ সমস্ত ভগবানের ইচ্ছা এবং আমাদের কর্ম্মফল।

আজ ১৯২৪ সালের ১১ই জানুয়ারী। এখানে নূতন চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন হইবে বলিয়া খুব একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। প্রাতে রাজকুমার বাবুর সঙ্গে নিয়মিত ভ্রমণের পর বাসায় ফিরিবার সময় দেখিলাম এই জেলার ডেপুটী কমিশনার জে, ই, স্কট (Mr. J. E. Scott I. C. S.) মহোদয় মিউনিসিপাল আফিসের দিকে যাইতেছেন। আমাকে

দেখিয়া মোটর থামাইলেন। ইলেক্সন (election) সম্বন্ধে দুই চারিটী কথাবার্ত্তার পর, "All right Rai Sahib" বলিয়া মোটর হাঁকাইয়া দিলেন। আমি বাসায় ফিরিয়া বেশ পরিবর্ত্তনের পর একছিলিম তামাকু নিঃশেষ করিয়া তৈল মর্দ্দন আরম্ভ করিয়াছি, এমন সময় তিন চারিটী নব নির্ব্বাচিত কমিশনার, আফিসের কেরাণী এবং অন্যান্য অনেকগুলি ভদ্রলোক আসিয়া সংবাদ দিলেন যে নির্ব্বাচনের ফলে আমাকেই চেয়ারম্যান পদ দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন যে সেই সময় উপর হইতে Reform Schemeএর ফলে (Official Chairman) অফিসিয়াল চেয়ারম্যানের পদ উঠাইয়া দিয়া (Non-official Chairman) বে-সরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবার আদেশ হইয়াছিল। মিউনিসিপাল কমিশনার, মিউনিসিপাল কর্ম্মচারীবর্গের ত কথাই নাই ; সকল সম্প্রদায় ও সকল শ্রেণীর লোক আসিয়া আমার এই অভাবনীয় রাজসম্মানে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন (to congratulate me on this unexpected honour)। বলা বাহুল্য এই সকল ভদ্রলোকের মধ্যে দুই চারিটী ব্যতীত আর সকলেই সময় 'সেবক' ও স্বার্থ পরিচালিত।

অপরাহ্ন ৪টার সময় চা পানের ব্যবস্থা করিতেছি, এমন সময় বউমা (প্রমথ নাথের পত্নী) আসিয়া কহিলেন ;—"বাবা একটু প্রসাদ খাইয়া পরে চা খাইবেন।" সঙ্গে সঙ্গে এক টুকরা বিল্বপত্র, একটী তুলসীপত্র সহ একখানি বাতাসা হাতে দিলেন।

কারণ জিজ্ঞাসায় কহিলেন,—"এই সাহেবের অভদ্র ব্যবহারে আপনি ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; সেই সাহেবই আবার আপনা হইতেই নিজের চেয়ারম্যানের কাজ আপনাকে দিলেন। সেইজন্য আজ মায়ের পূজা দিয়াছি।"

মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান হইয়া অধিককাল কার্য্য পরিচালন করিতে হয় নাই। বহুদিন নানাবিধ রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, কাজের প্রণালী, শৃঙ্খলা সম্বন্ধে কতকটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। দেখিলাম, এই চাকরীতে সেরূপভাবে কাজ করিবার উপায় নাই। কাজের মধ্যে দ্বেষাদ্বেষী রেষারেষী এবং হট্টগোল। আর একদিক হইতে দেখা গেল, চেয়ারম্যান-রূপে মিউনিসিপাল মোকদ্দমার আসামীদিগকে আমিই বিচারার্থ পাঠাই; আবার আমিই ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে তাহাদের বিচার করিয়া থাকি। অতঃপর কর্ত্তৃপক্ষের সহিত এই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পর চেয়ারম্যানের পদ পরিত্যাগ করিয়া সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

প্রমথ নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাত নাথ এই বৎসর পাঁশকুড়া স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। আমার নিজ ব্যবহারের সোণার বোতাম তাহাকে উপহার দিয়াছিলাম। প্রমথ এই সময় প্রভাত, নস্তু, টুঙ্গীর ঠাকুরাণী (বউমার মাতামহী) এবং পাচক ব্রাহ্মণ লইয়া দেশে গিয়াছিল। চিতাবাঘ, খরগোস এবং নানাবিধ পক্ষী শিকার করিয়া, দেশের আম, কাঁঠাল, মিষ্টান্নাদি

উপভোগের পর, আমাদের জন্যও প্রচুর পরিমাণ মিষ্টান্ন, ফলমূল শাকসব্জী এবং মৎস্য লইয়া এখানে ফিরিয়া আসিয়াছিল। সংসারের প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষও আনিয়াছিল।

১৯২৪ জুন মাসের শেষভাগে রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় আসিয়া দুইদিন অবস্থিতি করিয়া তাঁহার সেই ওস্তাদি ধরণের সুমধুর গান শুনাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু এখান হইতে যাইবার একদিন পরেই হঠাৎ সন্ধ্যার সময় ডিষ্ট্রীক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বসু সপরিবারে এবং সবজজ্ নরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধ্যানুসারে তাঁহাদের অভ্যর্থনা ও আহারাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন,— "যোগেন দাদা! আপনার বাড়ীটা একটা হোটেল বলিলেই হয়"। কথা বড় মিথ্যা নয়।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই প্রভাত বোধ হয় মনে করিয়াছিল সে কৃতবিদ্য হইয়াছে, একটী ভাল চাকরী পাইবার উপযুক্ত হইয়াছে। আমি যেমন "গরুপার" (Cattle ferried over) হইয়াছিলাম; অথবা রাজেন্দ্রনাথ ও শ্রীপতি যেরূপ সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এখন অন্ততঃপক্ষে বি, এ পাশ না করিতে পারিলে সেইরূপ উচ্চ পদ লাভ করিবার আশা নাই। প্রভাতের পীড়াপীড়িতে অগত্যা তাহাকে লইয়া জেলার কর্ত্তা মিঃ জে, ই, স্কট বাহাদুরের নিকট

যাইয়া প্রভাতের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। সে সময় প্রভাতের বয়ঃক্রম মাত্র ১৭ বৎসর শুনিয়া সাহেব বাহাদুর হাসিয়া কহিলেন, —"যাও আবার কলেজে যাও, বি, এ পাশ কর, অন্ততঃ আই, এ পাশ করিয়া আমি যেখানে থাকিব, সেইখানে আমার সঙ্গে দেখা করিও ; সেই সময় তোমার জন্য যাহা পারি, তাহার চেষ্টা করিব।" ইহার পর প্রভাত কিছুদিন কলিকাতায় আই, এ পড়িয়াছিল। কিন্তু বারম্বার পীড়িত হওয়ায় চিরদিনের জন্য কলেজের সঙ্গে সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। চাকরীর চেষ্টাও হইতে লাগিল। মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনের একটী চাকরী (Astt. Sub-Inspector Watch & Ward Dept. B. N. R.) শীঘ্রই জুটিয়া গেল। কলিকাতা সালিমার যাইবার আদেশ হইল। ভায়া সেখানে যাইতে অসম্মত হওয়ায় চাকরীটি হারাইলেন। প্রভাতের জীবনে এই আর একটা বিষম ভুল। হায় রে, ঐ ৪০৲ টাকা বেতনের একটী কেরাণীগিরি পাইয়া আমি কত কষ্টভোগ করিয়া, কখন রেল, কখন ষ্টীমার, কখনও বা ছেকড়াগাড়ী অবলম্বনে, অবশেষে অশ্বারোহনে দার্জ্জিলিং উপস্থিত হইয়াছিলাম। ১ম খণ্ডে সেই সমস্ত বিবরণ লেখা আছে। প্রভাত W. & W. ডিপার্টমেণ্টের চাকরী হারাইয়া ডেপুটী কমিশনার আফিসে কিছুদিন কাজ করিবার পর তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছিল। অবশেষে অনেক চেষ্টায় B. N. Ry তে District Commercial আফিসে একটী কেরাণীগিরিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে গত বৎসর আমাকে "রায় সাহেব" উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমান সনের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে দরবারে উপস্থিত হইয়া সনন্দ গ্রহণ করিবার আদেশ পাইয়া, পূর্ব্বদিন মোটর যোগে রাঁচি যাইয়া বন্ধুবর কান্তিভূষণ সেন মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করা হইল। বাদসাহী আমলের দরবারের যেরূপ বিবরণ ইতিহাসে দেখা যায়, তাহার তুলনায় বৃটিশ রাজ্যেব একজন প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তার দরবার নগণ্য হইলেও একটা দেখিবার জিনিষ বটে। কত মহারাজা, রাজা, বড়দরের জমিদার, রায় বাহাদুর, রায় সাহেব, খাঁ বাহাদুর, খাঁ সাহেব, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, সাহেব, মেমসাহেব, পাদরীর দল দরবারে উপস্থিত। ব্যাণ্ড বাজনা, ঘন ঘন তোপ ধ্বনি, ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদধারী ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারীবর্গ। স্বর্ণ, রৌপ্য খচিত জমকালো পরিচ্ছদে ভূষিত, আসাসোটা ধারী গাম্ভীর্য্যপূর্ণ চোপদারের দল প্রভৃতির একত্রে সমাবেশ সে একটা দেখিবার জিনিষ তাহাতে সন্দেহ নাই।

তারপর মেদিনীপুরে চৌধুরী যামিনীনাথ মল্লিকের বাটীতে শারদীয়া পূজা এবং তাঁহার দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে চারিদিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম। বিরাট আয়োজন ; সহরের প্রসিদ্ধ গায়ক বৃদ্ধ খাঁ সাহেব, ডাক্তার কালীপ্রসন্ন রায়, প্রবোধচন্দ্র দত্ত এবং প্রধান প্রধান সঙ্গতগুলি মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তারপর ভূরীভোজন। কয়টা দিন যেন দেখিতে দেখিতে উড়িয়া গেল। মেদিনীপুর হইতে কলিকাতায় যাইয়া দুই তিন দিন

অবস্থিতির পর ১০।১০।২৪ তারিখে চক্রধরপুরে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম।

ইহার পর কালীমাতার সাম্বৎসরিক পূজা, বিভাগীয় কমিশনার মহামতি ডিক্‌সন (Mr. F. P. Dixon I C. S.) মহোদয়ের চক্রধরপুরে আগমন, স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান বাবু জয়নারায়ণ মাড়োয়ারীর অকাল মৃত্যু প্রভৃতিই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জয়নারায়ণ ছিলেন বাবু রঘুরাম মাড়োয়ারীর জ্যেষ্ঠপুত্র ; সকল কার্য্যেই বেশ পারদর্শী হইয়াছিলেন। রঘুরাম বাবু বিপত্নীক ; পরিণত বয়সে উপযুক্ত পুত্রের হস্তে সমস্ত বিষয়ের ভার দিয়া নিশ্চিন্তভাবে দেবারাধনা, শাস্ত্রালোচনা ও ভজন সাধনে সময় কাটাইতেছিলেন। স্বপ্নেও ভাবেন নাই—যে অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত হইবে। আবার তাঁহাকে বিষয় কর্ম্মে, সংসার ধর্ম্মে মনঃ সংযোগ করিতে হইল। আবার সেই মায়া মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন মায়া, মোহ, অহঙ্কারকে সর্ব্বথা দমন করা শ্রেয়ঃ। আমরা অনেকটা অগ্রসর হইয়া থাকিলেও কয়টা রিপু যেন জোর জবরদস্তী করিয়া নামাইয়া দেয়। উদাহরণস্বরূপ দুই একটী ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

১। আমাদের ক্ষুদ্র বাসভবনের সম্মুখেই রঘুরাম বাবু প্রাসাদতুল্য সুরম্য বাগানবাড়ী ও মনোরম পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আমি চিরদিনই ফুল ভালবাসি ; এক একদিন রঘুরাম বাবুর বাগানে যাইয়া দুই চারিটা ফুল লইয়া আসিতাম।

একদিন রঘুরাম বাবু প্রকারান্তরে ফুল লইতে নিষেধ করিলেন। সামান্য দুইটা ফুলের মায়ায় যে ব্যক্তি বিচলিত হইয়াছিলেন, অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি উপযুক্ত পুত্রের মায়া ভুলিয়া পুনরায় বিষয় কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হইলেন।

২। দ্বিতীয় উদাহরণ আমি নিজে। একটা কামিন (মেয়ে-মজুর) কলমের গাছ হইতে গোপনে পাঁচটী আম পাড়িয়াছিল। তাহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়াছিলাম। সেই রাত্রিতেই বৃষ্টি ও প্রবল বাতাসে বহু আম ভূমিসাৎ হইল ; ডাল ভাঙ্গিয়া অন্যূন পাঁচশত অপরিণত আম নষ্ট হইল, বেশ একটু শিক্ষা পাইলাম। এইরূপেই আমাদের দর্প-চূর্ণ হইয়া থাকে।

৩। রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ। এখানে কয়েকখানি পাকাবাড়ী ও সুন্দর পুষ্পোদ্যান প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া সস্ত্রীক কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। ভাগ্যবান্ পুরুষ, জ্যেষ্ঠ পুত্র কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার (Homœopath), মধ্যম পুত্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, তৃতীয় পুত্র একটা বড় ফারমে চাকরী করিতেছেন, চতুর্থ পুত্র পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। পঞ্চম পুত্রও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানজনক উপাধিধারী। রায় বাহাদুর অতঃপর কাশীবাসী হইলেন। জপ, তপ, পূজা, অর্চ্চনা, হোম, শাস্ত্রালোচনা সাধুসঙ্গ প্রভৃতি কাজে বেশ আনন্দে কাটাইতে লাগিলেন। Statesman প্রভৃতি খবরের কাগজে বাহির হইতে লাগিল :— তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন (leading the life of

an ascetic) সংসারে কোন বিষয়েই আর স্পৃহা বা আশক্তি নাই ইত্যাদি। এই সময় শুনিলেন যে তাঁহার চক্রধরপুরস্থ বাটীর নিকটে একজন মাড়োয়ারী লাহার কুঠী (Lac factory) প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিতেছে। অমনি দাদা, জপ, তপ, ভজন, সাধন, হোম আর সংসার বৈরাগ্য সব পরিত্যাগ করিয়া একেবারে বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির এই দশা দেখিয়া মনে হইল "সংসার বিরাগী" হইয়াছি মুখে বলিলেই হয় না ; খবরের কাগজে প্রকাশ হইলেও হয় না ; এটী বড়ই কঠিন ব্যাপার।

মার্চ্চ মাসটার উল্লেখযোগ্য বিষয়—রায় বাহাদুর সুরেন্দ্র নাথ মহাশয়ের এখানে কয়েকদিন অবস্থিতি। রমাপ্রসাদের আগমন এবং কনিষ্ঠ বিজয় প্রসাদের বাসায় অবস্থিতি। বিজয় এই সময় রাঁচি চাইবাসা মোটর কোম্পানীর একজন এজেণ্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন। করালী বাবুর পুত্র মাণিকের (ভগবতীচরণ) বিবাহ। করালী বাবু তখন কেরা ষ্টেটের দেওয়ান। বেশ সৌষ্ঠবের সঙ্গে পুত্রের বিবাহ ব্যাপার সমাধা করিয়াছিলেন। ষ্টেটের প্রথা অনুসারে কর্ম্মচারীদের বাটীতে ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহারা পদানুযায়ী অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকেন। দেওয়ান সাহেবও বেশ মোটা রকম একটা সাহায্য পাইয়াছিলেন।

১৯২৫।১৯শে এপ্রিল একটা বড় দুঃখের দিন। ঐ দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্বর্গীয় বন্ধু রামলাল দে মহাশয়ের মধ্যম পুত্র (বর্ত্তমান জ্যেষ্ঠ) ক্ষীরোদ চন্দ্র হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া

পরলোক গমন করেন। হৃষ্টপুষ্ট, সুস্থ সবল শরীর, ব্যবসায় উপলক্ষে দিবারাত্র অকাতর পরিশ্রম করিতেছেন; কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে অকস্মাৎ এইভাবে তাঁহার মৃত্যু হইবে। ক্ষীরোদের সদ্য বিধবা পত্নী এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়াই শয্যা গ্রহণ করেন; আর শয্যা ত্যাগ করেন নাই। এক সপ্তাহ মধ্যেই, অসময়ে একটী কন্যা প্রসব করিয়া, সাধ্বী পতির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ভগবানের কৃপায় এবং পরিজনবর্গের যত্নে মেয়েটী বাঁচিয়া উঠিয়াছিল।

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয় ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চক্রধরপুরে আসিয়া তাঁহার বৈবাহিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চক্রধরপুরস্থ "কুসুম কুঞ্জ" নামক বাটীতে কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রের সহিত নগেন্দ্র বাবুর একটী কন্যার বিবাহ কয়েকমাস পূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে নগেন্দ্র বাবুর বাটীতে একদিন কয়েকটী বন্ধুবান্ধবকে ভোজ দেওয়া হইয়াছিল। আমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। দেখিলাম বিচারপতি মন্মথনাথ অতি নিরহঙ্কার এবং অমায়িক ব্যক্তি। কলিকাতায় অনেক সদানুষ্ঠানের সঙ্গেই ইঁহার সংশ্রব আছে এবং সর্ব্বপ্রকার সদানুষ্ঠানেই ইনি যোগদান করিয়া থাকেন।

চক্রধরপুর হইতে রাঁচি যাইবার পথে সাত আট মাইল পাহাড়ের উপর দিয়া আঁকা, বাঁকা, উচু, নীচু পথের উপর দিয়া যাইতে হয়। সেইস্থান দিয়া যাইবার সময় মনে হয় এটা যেন

(Darjeeling road in miniature) দার্জ্জিলিং যাইবার একটা ছোটখাটো রাস্তা। বৈবাহিককে পাহাড় পর্ব্বতে বেড়াইয়া আনিবার জন্য সকলে একদিন টেবো নামক স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সে সময় এখনকার ন্যায় মোটরবাস, ট্যাক্সি প্রভৃতির এতটা সুবিধা ছিল না। রঁাচি হইতে চাইবাসাগামী একখানি গাড়ী ছিল ; তাহার কল খারাপ হওয়ায় জাষ্টিস্‌কে সদলবলে সেই রাত্রিটা প্রায় অনশনে নানা কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। পরদিন এখান হইতে একখানি ট্যাক্সি পাঠাইয়া তাঁহাদের আনা হইয়াছিল। হাইকোর্টের দুইটী উকীলও এই দলভুক্ত ছিলেন। আমরা তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়াছিলাম ; তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে দেখিলাম বিচারপতির সেই মহাদেবের ন্যায় সৌম্য মূর্ত্তি এক রাত্রির কষ্টভোগে যেন শুকাইয়া গিয়াছে ; এই পিক্‌নিক্ পার্টির কথা (picnic party) বোধ হয় বিচারপতির অনেকদিন মনে থাকিবে।

ইহার পর বৎসরাধিক কাল রাজকার্য্য, সাধারণের কাজ, সংসারের কাজ, ৺কালীমাতার সাম্বৎসরিক পূজা, পিতৃমাতৃ সাম্বৎসরিক দিনে ব্রাহ্মণাদি ভোজন প্রভৃতি ব্যাপার লইয়াই অতিবাহিত হইয়াছিল।

আর দুইটী শোকাবহ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ১৯২৬ ২৯শে আগষ্ট তারিখে স্থানীয় রাজা নরপৎ সিং দেও বাহাদুরের পত্নী স্বর্গারোহণ করেন। অনেকগুলি সদ্‌গুণের জন্য রাণী সাহেবা আবালবৃদ্ধবণিতার প্রিয় ছিলেন। রাজা বাহাদুর অতি

সমারোহে পত্নীর শ্রাদ্ধাদি নির্ব্বাহ করিয়া সকল শ্রেণীর প্রজা-বর্গকে পরিতোষরূপে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ইচ্ছানুরূপ আয়োজন করিয়া, আহার করাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এই যে ঐ সনের ১২ই নভেম্বর তারিখে প্রভাত ও নস্তু সীতারাম মহান্তি নামক একটী ভৃত্য সঙ্গে লইয়া পক্ষী শিকার করিতে গিয়াছিল। একটী বন্যহাঁস আঘাত প্রাপ্ত হইয়া একটী বাঁধের (পুষ্করিণী) মধ্যস্থলে পড়িয়াছিল। সেই পক্ষীটি আনিবার জন্য সাঁতার দিয়া পক্ষীর নিকটে উপস্থি ত হইবার পরেই সীতারাম জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। সীতা-রামের ন্যায় প্রভুভক্ত, বিশ্বাসী. মিষ্টভাষী, সদা হাস্যবদন অনুচর বর্ত্তমান সময়ে তুর্ল্লভ।

এই সময় বরিশালবাসী স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাস এখানে সদলবলে শুভাগমন করিয়া ক্রমান্বয়ে চারিদিন যাত্রাভিনয় করেন। স্বদেশের, সমাজের, সাংসারিক বিষয়ের উন্নতি সাধন-মন্ত্রে স্ত্রীপুরুষ সকলকেই দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়েই মুকুন্দ দাস এই সকল অভিনয় বঙ্গদেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত দেখাইয়া বেড়াইতেছেন। পরের মুখাপেক্ষী না হইয়া, বিলাসিতা ও আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সত্যনিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বতো-ভাবে দেশের ও দশের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা যে সকলেরই কর্ত্তব্য, মুকুন্দ দাস অভিনয়ের দ্বারা তাহাই বুঝাইতেছেন। এটি একটী পূর্ণমাত্রায় সময়োপযোগী স্বদেশী জিনিষ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চক্রধরপুরেই স্থায়ীরূপে বাস করা স্থির হইল; পরিবারও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কাজেই পেন্‌সন্ হইতে এবং বেঞ্চের কাজে চাইবাসা যাতায়াতের ভাতা হইতে কয়েক বৎসর কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া এখানকার বাসাবাটীর আয়তন একটু বাড়াইয়া লওয়া হইল। এই সময় শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথের প্রথমা কন্যা হিরণ্ময়ী, দ্বিতীয়া কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী, তাহাদের সন্তান সন্ততি এবং দেবেন্দ্রনাথের পুত্রবধু দুইটীকে লইয়া দেবেন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কানাই এবং কনিষ্ঠ জামাতা কামাখ্যাপদ হঠাৎ একদিন প্রাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন নূতন রন্ধনশালা নির্ম্মাণ জন্য রাজমিস্ত্রী, কুলী কামিন, কাজ করিতেছে। চূণ, সুরকি, ইট প্রভৃতির দ্বারা ক্ষুদ্র উঠানটী পরিপূর্ণ। কোন রকমে আগন্তুকদের থাকিবার ও রন্ধনাদির ব্যবস্থা করা হইল। কন্যা দুইটী কিছুদিন পরেই চলিয়া গিয়াছিল; বধু দুইটী প্রায় দুই মাস এখানে ছিলেন। ইহার পর কয়েক মাস নিত্যনিয়মিত কাজ ব্যতীত বিশেষ কিছু সংঘটন হয় নাই।

পর বৎসর বর্ষার প্রারম্ভে দক্ষিণ পায়ে বাতের বেদনা হইয়া প্রায় দুই মাস শয্যাগত ছিলাম। যাহাদের বাতের শরীর তাদের পক্ষে চক্রধরপুর বেশ উপযোগী নয়। প্রমথও সময় সময় বাতের বেদনায় খুবই কষ্ট পায়।

১৯২৭ সেপ্টেম্বর মাসে প্রমথর চতুর্থ পুত্র বেচুকে (সোমেন্দ্র) লইয়া দেবতার স্থানে তাহার মস্তক মুণ্ডন করিবার জন্য গোপালঠাকুর ও যুগলাকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুর গিয়াছিলাম। প্রভাতের জন্য একটী সুপাত্রীর অন্বেষণও এই সময় হইতেছিল। বন্ধুবর স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রকুমার গুপ্ত, চারুচন্দ্র বিশ্বাস ও রমাপ্রসাদ কলিকাতা এবং সহরতলীতেও পাত্রীর সন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু সে পর্য্যন্ত আমাদের মনোমত পাত্রী পাওয়া যায় নাই।

এই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতেই ভারতের নানাস্থানে হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষ, সাইমন কমিশনের অধিবেশন, অস্পৃশ্য জাতির উদ্ধার, মেয়েদের বিবাহের বয়স বৃদ্ধি, বিদেশী বর্জ্জন, খদ্দর ব্যবহার, পল্লী সংস্কার ইত্যাদি নানা বিষয় লইয়া দেশে খুবই আন্দোলন চলিতেছিল। আবার এই সময় আমেরিকার মিস্ মেয়ো (Miss Mayo) নাম্নী একটী রমণী ভারতের নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া "মাদার ইণ্ডিয়া" (Mother India) নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। সেই পুস্তকে তিনি আমাদের আচার, ব্যবহার, জাতীয় চরিত্র, সামাজিক রীতি নীতি, এমন কি আমাদের মেয়েদের ও দেবদেবীর চরিত্রের উপরেও অযথা ও অসত্য মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; আমরা যে একেবারে পশু, আমাদের দেশের মেয়েরা যে চরিত্রহীন বর্ব্বর, এই সকল বিষয় প্রতিপন্ন করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এদেশ হইতেও প্রতিবাদস্বরূপ অনেকগুলি গবেষণা এবং প্রকৃত

অবস্থার বিবৃতিযুক্ত অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। আমেরিকার সামাজিক অবস্থা, সেখানকার স্ত্রীজাতির অধঃপতন, নিগ্রো এবং মিশ্র অধিবাসীদের নির্য্যাতন, ঘোর স্বার্থপরতা প্রভৃতিই অতি বিশদরূপে চিত্রসহ কোন কোন পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছিল।

উদ্যম, উৎসাহ, পরিশ্রম এবং কষ্টসহিষ্ণুতার ফলে সামান্য অবস্থা হইতে অল্প দিনের মধ্যেই কয়েকটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক এখানে কিরূপ বৈষয়িক উন্নতি করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। এই সিংভুম জেলায় অবস্থিতি সময়েই তাঁহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। শ্রীযুক্ত আশুতোষ গুঁই এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ খুলনা জেলাবাসী সদ্বংশজাত কায়স্থ সন্তান ও শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস যশোহর জেলার বনগ্রাম সবডিভিসনের অন্তর্গত একটী গ্রামে। সর্ব্বপ্রথম আশুতোষ, তারপর নগেন্দ্রনাথ ও বিজয়গোপাল ভাগ্যান্বেষণে এখানে আসিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ আশুতোষের মাতুলপুত্র। চা বাগানের কুলী সংগ্রাহক (Recruiting Agent) বাবু রাজকুমার সরকারের নাম ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইঁহার নিবাস বাখরগঞ্জ জেলায়। আশুতোষ, নগেন্দ্রনাথ ও বিজয়গোপাল প্রথমে একরূপ সদাশয় রাজকুমার বাবুর আশ্রয়েই ছিলেন। চাকরীর চেষ্টা না করিয়া প্রথম হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঠিকাদারী (contract) কাজ লইতে আরম্ভ করিয়া এই জেলার পাবলিক ওয়ার্কস, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও

মিউনিসিপ্যালিটীর সমস্ত কাজ আশুতোষ ও নগেন্দ্রনাথ হস্তগত করিয়া লইলেন। নগেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলাতে বিস্তীর্ণ ঠিকাদারী কাজ পাইয়াছেন; চক্রধরপুর ও মেদিনীপুরে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন এবং মেদিনীপুরে একটি বাহাদুরী কাঠের কারবার খুলিয়াছেন; নিজে কয়েকটা জঙ্গলও বন্দোবস্ত লইয়াছেন। কলিকাতা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের (Improvement Trust) মধ্যেও কাজ পাইয়াছেন। আজকাল (১৯৩২) তিনি এখানকার অর্থশালী ব্যক্তিগণের অন্যতম। আশুতোষও চাইবাসায় পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া, সেখানেও জঙ্গল বন্দোবস্ত লইয়া, বাহাদুরী কাঠের এবং কাষ্ঠনির্ম্মিত নানাবিধ জিনিষের কারবার খুলিয়াছেন। নিজে একটী ছাপাখানাও করিয়াছেন। কয়েক বিঘা উৎকৃষ্ট উর্ব্বর জমি পাইয়া তাহাতে নানাবিধ ফলমূল ও শাকসব্জী উৎপন্ন করাইতেছেন। নগেন্দ্রনাথের সমকক্ষ না হইলেও আশুতোষও বেশ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন। বিজয়গোপালের ভাগ্য এতটা না খুলিলেও তিনি ঠিকাদারী কাজ করিয়া একরূপ স্বচ্ছল ভাবেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। চক্রধরপুরে একটী পাকা বাড়ী ক্রয় করিয়া তাহার সৌষ্ঠবসাধন করিয়া লইয়াছেন। তিনজনই অতি সজ্জন, নিরহঙ্কারী, আতিথেয় এবং স্বজন-প্রতিপালক।

এই প্রসঙ্গে আর একটী বাঙ্গালীর নাম উল্লেখ করিতে হইতেছে। কলিকাতাবাসী সুবর্ণবণিক জাতীয় যুগলকিশোর চন্দ্র নামক একটী যুবক পীড়িত অবস্থায় বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য

এখানে আসিয়া ধরম্‌শালায় প্রবেশ করেন। তাঁহার পিতাও সঙ্গে আসিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রোগমুক্ত হইয়া যুগলকিশোর চক্রধরপুর বাজারের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র ঘর ভাড়া লইয়া ডিসপেন্সারী (Dispensary) সাজাইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। সেই সঙ্গে চাউল, লাহা এবং অন্যান্য দ্রব্যেরও ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ফিরিঙ্গী মহলে এবং মফঃস্বলে বেশ পসার প্রতিপত্তি করিয়া লইলেন। অসাধারণ পরিশ্রমশক্তি, মিতব্যয়িতা এবং বিষয়বুদ্ধির প্রভাবে পনের বৎসরের মধ্যেই সুপ্রসিদ্ধ সাহা কোম্পানীর (W. C. Shaw & Co.) সুন্দর পাকা বাড়ী, তৎসংলগ্ন একটী ফলের বাগান ও উক্ত কোম্পানীর বিলাতি মদের দোকানটীও ক্রয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

পরলোকগত উদারহৃদয়, সর্ব্বলোকপ্রিয় ডাক্তার জহরুল্লার সুযোগ্য পুত্র ডাক্তার হবিবর রহমানের নামটাও এই স্থানে উল্লেখযোগ্য। অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া হবিব শিক্ষা সম্বন্ধে ম্যাট্রিক পর্য্যন্তও অগ্রসর হইতে পারে নাই। যাহা হউক কটক মেডিক্যাল স্কুলে চারি বৎসর অধ্যয়ন করিয়া শেষ পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল। চক্রধরপুরে ফিরিয়াই পিতার ডিস্পেন্সারী জাঁকাইয়া তুলিল। প্রায় সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের এবং অনেক হিন্দু পরিবারের চিকিৎসা তাহার একচেটিয়া হইল। চা বাগানে কাজ করিতে গমনইচ্ছুক কুলীদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ভারও তাহার উপর ন্যস্ত হইল। ইহাতে তাহার

আয় বেশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একটী নূতন পাকা বাড়ী ইতি-মধ্যেই নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং পৈতৃক বাংলোটীরও অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়া, কিছুদিন পরে ভাইস চেয়ারম্যানের পদও লাভ করিয়াছে। সামাজিকতায়, সাধারণের হিতকর কার্য্যে, গান বাজনার মজলিস প্রভৃতি বিষয়ে হবিবের বিশেষ উৎসাহ আছে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই সর্ব্বসাধারণের এবং রাজপুরুষদিগের নিকট যথেষ্ট প্রতি-পত্তি লাভ করিয়াছে। হবিবের পৈতৃক বাসস্থান ছিল নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালি। তাহার পিতা ডাঃ জহরুল্লা বিশ্বাস চাকরী উপলক্ষে এখানে আসিয়া, এখানেই সদ্বংশজাত একটী মুসলমান কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিয়া-ছিলেন।

উপরে যে কয়েকটী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাদের আর্থিক উন্নতির পথ ছিল কনট্রাক্টারী, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি। কিন্তু ইহা ছাড়া সামান্য বেতনে ক্ষুদ্র চাকরীতে প্রবেশ করিয়া অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা এবং দূরদৃষ্টি প্রভাবে দুইটী বাঙ্গালী হিন্দু এবং একটী মুসলমান এই জেলা হইতেই ক্রমে ক্রমে উচ্চপদ, রাজদত্ত উপাধি ও গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহাদের কথাও সংক্ষেপে লিখিতেছি। প্রথমেই বাবু রজনীকান্ত সেন। ইনি পূর্ব্ববঙ্গবাসী। ১৮৯৪ বা ১৮৯৫ সালে তিনি এই জেলার তৎসাময়িক "রোডসেস্ কমিটীর" (Road Cess Committee) অধীনে ওভারসিয়ার পদে নিযুক্ত

হইয়া ক্রমে ক্রমে কানুনগো, সবডেপুটী, ডেপুটী কলেক্টর, ডিরেক্টার অব ল্যাণ্ড রেকর্ড (Director of Land Records) এবং বিভাগীয় কমিশনারের (Divisional Commissioner) পার্শনাল এসিষ্ট্যাণ্ট পদে উন্নতি লাভ করিয়া 'রায় সাহেব" উপাধি পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন।

তারপর মৌলবী আব্দুল হাকিম। ১৮৯৫ হইতে ১৮৯৭ সাল পর্য্যন্ত, যে সময় আমি কোলহান গবর্ণমেণ্ট ষ্টেটের অন্যতম এসিষ্ট্যাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার পদে চাইবাসায় অবস্থিতি করিতেছিলাম, সেই সময় আব্দুল হাকিম আমার আফিসে নকল নবীস (copyist) পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে আফিসের পেস্কার, কানুনগো, সবডেপুটী এবং সেটেলমেণ্ট অফিসারের পদে উন্নতি লাভ করিয়া "খাঁ সাহেব" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

ইঁহার পরেই শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর রায় মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি সামান্য বেতনের ক্ষুদ্র কেরাণী হইতে ক্রমে ক্রমে কানুনগো ও সবডেপুটী পদে উন্নতি লাভ করিয়া যোগ্যতার পুরস্কারস্বরূপ "রায় সাহেব" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। খনি ও খনিজ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হইয়াছেন। সিংভূম জেলার কোথায় কি প্রকার খনিজ পদার্থ আছে তাহার মানচিত্র (chart) প্রস্তুত করিয়াছেন। চাকরীর নিম্নস্তর হইতে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া ইঁহাদের কাহারও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় নাই। এখন পর্য্যন্ত সকলেই পূর্ব্বের ন্যায় বিনয়ী, এবং নিরহঙ্কার আছেন। তিনজনেই এখন পর্য্যন্ত আমাকে সেই পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধা, ভক্তি

করিয়া আসিতেছেন। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত প্রতি নিয়তই চক্ষের সম্মুখেই দেখিতেছি। কিন্তু এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও যেসকল যুবকের চক্ষু প্রস্ফুটিত হয় না, সেটা তাহাদের কর্ম্মফল বা ভগবানের অভিসম্পাতই বলিতে হইবে।

১৯২৮ সালের ২৭শে জুন তারিখে প্রমথনাথের মাতুলানী প্রভাবতী দেবী ৺কাশীধামে স্বর্গারোহণ করেন। নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় মাতামহের উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রমথ প্রভাবতীর পরিত্যক্ত সমস্ত স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্ববান হইয়াছিল। প্রভাবতীর স্ত্রীধন সম্বন্ধে স্বহস্তে তিনি একখানি উইল লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; তদনুসারে শ্রীপতি, শচীপতি, নারায়ণ দাস (শ্রীশ চন্দ্র) ও প্রমথ সকলেই কিছু কিছু পাইয়াছিল। প্রমথর অংশে পড়িয়াছিল বাদসাহী আমলের কয়েকটা স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, একছড়া সোণার হার, এবং কয়েকটী রূপার বাসন। প্রভাবতীর অনেকগুলি সদ্‌গুণ ছিল; তাহার মৃত্যুতে পরিবারস্থ সকলেই যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন। শচীপতি একেবারে অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার বৃহৎ পরিবার, ব্যয়ও অধিক; প্রভাবতী শচীপতিকে অনেক সময় অনেক সাহায্য করিত।

১৯২৮ সালের বাকী কয়টী মাস প্রভাতের জন্য একটি সুপাত্রী অন্বেষণ, ৺কালীমাতার সাম্বৎসরিক পূজা, রোগের সেবা প্রভৃতি ব্যাপারেই অতিবাহিত হইয়াছিল। কৃষ্ণনগর ঘূর্ণী নিবাসী শ্রীযুক্ত চক্রপাণী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সে সময় মিঃ এম,

পাল চৌধুরীর অধীনে শান্তিপুর মহালের তহশীলদার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী পূর্ণিমা দেবীকেই প্রমথ মনোনীত করিয়াছিল। ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমেই এই পাত্রীটীর সহিত প্রভাতের বিবাহ হইয়াছিল। এই বিবাহোপলক্ষে দেবেন্দ্র নাথের পত্নী, আমার মাতুলপুত্র পরাণ, চাইবাসার সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারবর্গের অনেকেই চক্রধরপুরের বাটীতে উপস্থিত হইয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। আর আসিয়াছিলেন তমলুক সবডিভিসনের মহিষাদল থানার অন্তর্গত রামপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণ চন্দ্র মণ্ডল। সঙ্গে আনিয়াছিলেন মহিষাদলের সুপ্রসিদ্ধ মিঠাই সের দশ। ১৯০৮ সালে ইঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। একুশ বৎসর পরে পূর্ব্বের বন্ধুত্ব মনে করিয়া প্রভূত অর্থ ব্যয়, শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিয়াও পূর্ণ বাবু এই দূর দেশে আসিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে প্রকৃত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বন্ধুত্ব। বলা বাহুল্য, প্রভাতের বিবাহ উপলক্ষে একরূপ দিগ্‌বিদিগ জ্ঞানশূন্য হইয়া অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিলাম। কানুনগো-গিরি চাকরীতে স্থায়ী হইবার পর হইতে যে একটা ভয়ানক অমিতব্যয়িতা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম, বোধ হয় জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই রোগে ভুগিতে হইবে। একটু বুঝিয়া চলিতে পারিলে, একটু দূরদৃষ্টি থাকিলে, মিতব্যয়ী ব্যক্তিগণের আদর্শে চলিতে পারিলে, এই দারুণ অর্থ সঙ্কটের দিনে প্রমথকে একদিনও অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে হইত না।

বউভাত ভোজের দুই তিনদিন পূর্ব্ব হইতে শরীরটা অসুস্থ বোধ হইতেছিল। বউভাতের দিন পীড়া প্রবল হইল। প্রায় দুই মাসকাল একরূপ শয্যাগত থাকিয়া নানারূপ চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু জরাজীর্ণ অস্থি চর্ম্মসার ক্ষুদ্র দেহটী আরও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

স্থানীয় রাজা বাহাদুরের মাসতুত ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত প্রতাপ সিং বি,এ, স্বর্গীয় গোকুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ধীরেন্দ্র নাথ প্রমুখ সমগ্র বাঙ্গালী সম্প্রদায় ১৯২৯ সালের ২৬শে জুন তারিখে কালীমন্দির প্রাঙ্গণে একটী বিশেষ সভার অধিবেশন করিয়া আমাকে একটী মানপত্র এবং নানাবিধ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে মিঃ সুকুমার বসু এবং শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী হালদার প্রভৃতি কয়েকটী বন্ধুও সুন্দর সুন্দর উপহার এবং প্রীতি সম্ভাষণ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই প্রীতি সম্মিলনে মাদ্রাজী, মারহাট্টা, উৎকল সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই যোগ দিয়া প্রচলিত প্রথামত আমার নানাকার্য্যের প্রশংসা দ্বারা সম্মানিত করেন। উক্ত অভিনন্দন পত্রখানির ইংরাজী অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

To

Rai Sahib J. N. Chakrabartty,
Honorary Magistrate,
Chakradharpur.

Respected Rai Sahib,

On this fragrant eve we have all assembled here to meet you and pay you our lovely respects

It is known to one and all of us here how patiently and industriously you strove hard in the ladder of life from the post of a poor Government servant to high and esteemed position of Deputy Magistrate, from which you retired after rendering meritorious services. It is now nearing over ten years that you have been conferred the post of Hony. Magistrate by the Government, which post you are even to-day in your eighties holding with the same vigour and energy. The Government in recognition of your services also conferred on you the title of "Rai

Sahib". You have also discharged the responsible duties of Chairman of the Municipality and retired from the post only recently.

As a Bengalee you established a name and fame for your countrymen at large and besides have carried the love and respect of one and all of the residents of Chakradharpur with whom you have been connected for over one score of years.

The great Kali Temple at which we have met to-day owes its existence to your untiring energies only ; you have also been the President of the Bengalee Primary School Committee.

Though you are now past seventy, yet you are blessed with the necessary vigour of life to carry on public activities. As a voluminous and conscientious writer you stand unique at Chakradharpur and your taste for music and sport is unlimited. As a socialist you are to be envied by one and

all of the public Though you have grown sufficiently old, we join with you in your grief at this age for having lost your beloved wife and it is surprising to note that inspite of such hard adversities you carry on with the same iron frame of mind and do all things cooly to the astonishment of one and all.

In this mortal world you have enjoyed all pleasures of life and have been bestowed with health and also have seen your sons, grandsons ana great-grandsons in their health. May God therefore in His infinite glory shower on you and your children His choicest blessings for continued days of prosperity and longevity.

We remain,

Dated 26th June, '29 } Respected Rai Sahib,
Your most loving Bengalee
Public of
Chakradharpur Town.

নোয়াখালি, তমলুক প্রভৃতি অন্যান্য স্থান হইতে যে সকল অভিনন্দন পাইয়াছিলাম, সেগুলি ইহাতে সন্নিবেশিত করিতে হইলে "ক্ষুদ্র জীবনী" অনেক বৃহৎ হইয়া পড়িবে ; জীবন সন্ধ্যায় চক্রধরপুরে যে সকল অভিনন্দন পাইয়াছিলাম, বংশধর এবং আত্মীয় বন্ধুদিগের অবগতির জন্য এবং ভবিষ্যতে উল্লেখের প্রয়োজন হইবে বলিয়া কেবল তাহার মধ্যে একখানিরই প্রতিলিপি এখানে মুদ্রিত হইল। একটা ক্ষণজন্মা পুরুষ বলিয়া পরিচিত হইবার বাসনায়, অথবা নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যে এই সকল বিষয় লেখা হইতেছে না। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত বংশধর এবং আত্মীয়বর্গের মধ্যে কেহ যদি আমার আদর্শে সংসারে কিয়ৎপরিমাণ ভাগ্যবান ও যশস্বী হইতে পারে, একমাত্র সেই আশাতেই বিষয়গুলি লিখিয়া রাখিতেছি। জীবন অভিনয়ের প্রথম অঙ্ক হইতে এই শেষ অঙ্ক পর্য্যন্ত কত শত ভুল করিয়া বিপথগামী হইয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। পুত্র বা পৌত্রগণ আমার যে সকল ভুল ভ্রান্তি বা ত্রুটি লক্ষ্য করিতেছেন এবং যেগুলি দোষ বা ত্রুটি বলিয়া বুঝিতেছেন, সেইগুলি যাহাতে তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে, সে বিষয়ে একাগ্রমনে যত্নবান হইবেন।

১৯২৯ সালের নভেম্বর মাস হইতে ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত কয়টী বিষয়ই উল্লেখযোগ্য। শান্তিপুরের বাড়ীটা সম্পূর্ণরূপে মেরামত করাইবার জন্য গোপাল ঠাকুরকে পাঠান হইয়াছিল। চৌধুরী যামিনী নাথ মল্লিক মহাশয়ের দুইটী

নাতিনীর বিবাহোপলক্ষে মেদিনীপুরে যাইয়া তিন চারিদিন অবস্থিতি। সেই সময় স্বর্গীয় মহেন্দ্র লাল বসু মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র জ্ঞানেন্দ্র লালের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হইল। তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ভক্তিতে বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। দেখিলাম, জ্ঞানেন্দ্র লাল মেদিনীপুরের পরলোকগত গভর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় বাহাদুর বিপিন বিহারী দত্ত মহাশয়ের পুত্রের নিকট হইতে দুইটী সুসজ্জিত পাকা দ্বিতল বাড়ী, মূল্যবান তৈজস পত্র, নানাবিধ পুস্তকপূর্ণ লাইব্রেরী প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য অতি অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়াছে। খুবই আনন্দ হইল। পক্ষান্তরে ভাবিলাম, কাহার যত্নার্জ্জিত সম্পত্তি ভগবানের ইচ্ছায় কে ভোগ করে! মেদিনীপুর হইতে শান্তিপুর যাইয়া প্রভাতের শ্বশুর চক্রপাণি বাবুর বাটীতে দুই তিন দিন অতি আদর যত্নে অবস্থিতি করা হইয়াছিল। সেই সময় একদিন দিগনগর যাইয়া আমাদের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তীকে অবসর দিয়া বৃন্দাবনের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর্গীয় পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র পরাণচন্দ্রকে তৎপদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তারপর কলিকাতা হইয়া চক্রধরপুরে প্রত্যাবর্ত্তন।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে শান্তিপুরের বাড়ীটা মেরামত করাইবার জন্য গোপাল ঠাকুরকে পাঠান হইয়াছিল। সংবাদ পাইলাম ১৯৩০ সালের ১৭ই মার্চ্চ তারিখে বিস্থচিকা রোগে গোপালের মৃত্যু হইয়াছে। এই সংবাদে বড়ই ব্যথিত হইয়াছিলাম। ১৮৯৫ সালে যখন আমি চাইবাসায় সেটেলমেণ্টের

কাজে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময় গোপাল আমার নিকট চাকরী গ্রহণ করিয়া এ পর্য্যন্ত আমার নিকটেই ছিল। তাহার ন্যায় সুদক্ষ পাচক আমি এপর্য্যন্ত পাই নাই। শাক্, সুক্তা, ঘণ্ট ডাল্না, ঝোল, ঝাল হইতে আরম্ভ করিয়া সাহেবী ও মোগলাই ধরণের প্রায় সকল রকম আহার্য্যই অতি উৎকৃষ্ট প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল। তাহার ন্যায় পরিশ্রমী, সর্ব্বকার্য্যে পারদর্শী ও প্রভুভক্ত বিশ্বাসী অনুচর আজকাল দুর্ল্লভ।

১৯৩০ সালের মে মাসে নস্থু, মণ্টু, বেচু, এবং প্রভাত-পত্নী পূর্ণিমাকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরে পূর্ণিমার পিত্রালয়ে পরম সমাদর ও যত্নে তিন দিন অবস্থিতি করা হইয়াছিল। ঐ সময় একদিন বেচুকে সঙ্গে লইয়া অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় চন্দ্রভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গোয়াড়ী মালোপাড়ার বাটীতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। ইঁহার সহিত ১৮৭৭ সালে প্রথম পরিচয় হয়। ইনি সেই সময় দার্জ্জিলিং তরাইয়ের (Darjeeling Tarai) তহশীলদার (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতাযুক্ত) পদে নিযুক্ত ছিলেন। আমি সেই সময় সবে মাত্র নানাক্লেশ ভোগ করিয়া দার্জ্জিলিং উপস্থিত হইয়া স্বর্গীয় ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আফিসে একটী কেরাণীগিরি চাকরীতে প্রবিষ্ট হইয়াছি। তাবপর প্রায় আট নয় বৎসর পরে যখন তিনি নোয়াখালিতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময় আমি সবডেপুটী পদে সেখানে গিয়াছিলাম এবং প্রায় দুই বৎসর কাল তাঁহার সঙ্গে কাটাইয়াছিলাম।

ইনি অতি আমোদপ্রিয়, নিরহঙ্কার ও সদাশয় লোক ছিলেন। অফিসার হিসাবে ইনি খুবই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, নির্ভীক এবং স্বাধীন মতাবলম্বী ছিলেন। যে সময় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য কৃষ্ণনগর গিয়াছিলাম, তখন তিনি খুব প্রাচীন হইয়াছেন। বহুদিন পরে চন্দ্রভূষণ দাদার কৃপায় কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ সরপুরিয়া, সরভাজা সেই সঙ্গে চমচম্, বরফি, রসগোল্লা, লুচি, তরকারী. আম, লিচু প্রভৃতি উপভোগ করিয়া সন্ধ্যার সময় শান্তিপুর ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। তারপর চক্রধরপুরে ফিরিবার পথে দুইদিন কলিকাতায় রমেশ বাবাজীদের বাটীতে অবস্থিতি করা হইয়াছিল। ঐ সময় একদিন সন্ধ্যায় বন্ধুবর স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রকুমার গুপ্ত মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র ডাক্তার সৌরীন্দ্র কুমার গুপ্ত ব্যারিষ্টার মহোদয়ের ভবানীপুরস্থ ভবনে সদলবলে যাইয়া নানাবিধ মৎস্য, মাংস, মিষ্টান্নাদি যোগে ভূরি ভোজন হইয়াছিল। পরদিন পূর্ব্বাহ্নে বন্ধুবর দেবেন্দ্র চন্দ্র মল্লিকের বাটীতে প্রায় ঐরূপ আয়োজনের আহার। আবার সেইদিন রমেশদের বাটীতে জামাইষষ্ঠীর উৎসব; রাত্রিতেও অপরিমিত আহার। পরদিন প্রাতের ট্রেণে চক্রধরপুর যাত্রা। কয়েকদিন আহারাদির অনিয়মে ট্রেণেই পেটের পীড়া আরম্ভ হইল। সেকেণ্ড ক্লাসে ছিলাম; দুইটী সাহেব যুবক খড়গপুরে ঐ কামরায় উঠিয়াছিলেন। আমার অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন, আমি কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছি; পরের ষ্টেসনে তাঁহারা অন্য গাড়ীতে উঠিলেন। আমি তখন "Monarch of all I survey"; কাপড় চোপড় খুলিয়া বেশ

একটু আরাম বোধ করিতে লাগিলাম। যথাকালে চক্রধরপুরে উপস্থিত হইয়া কয়েকদিন চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ফলে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলাম। সময় সময় মনে হয় এই উদরপরায়ণতাজনিত পেটের পীড়াতেই হয়ত আমাকে ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে।

১৯১৭ সাল হইতে প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাযুক্ত অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ একরূপ সুখ্যাতির সঙ্গেই নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলাম। মিঃ স্কট, মিঃ ডেন, মিঃ গ্যারেট, মিঃ ফিলিপ প্রভৃতি প্রবীণ ডেপুটী কমিশনারগণ সমভাবে আমার কার্য্য-প্রণালীর প্রশংসা করিয়া প্রতি বৎসরই গবর্ণমেণ্টে জানাইতে-ছিলেন। ১৯২৯ সালে মিঃ টি, এ, ফ্রেসটন (Mr. T. A. Freston I. C S.) নামক একটী যুবক ডেপুটী কমিশনার হইয়া আসিলেন। ইনি আমায় সুনজরে দেখেন নাই। আমাকে আর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা না দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছিলেন; অজুহাত ছিল :—"He is definitely a very old man and very deaf." সুতরাং ১৯৩০ সালের অক্টোবর মাসের ৭ই তারিখে আমার "হাকিমী" শেষ হইল।

সকল সময় সকল দেশেই দেখিয়াছি অধিকাংশ লোকই অর্থ ও শক্তি-সেবক (power and mammon worshipper), বিশেষতঃ এই সকল অশিক্ষিত, অর্দ্ধ-সভ্য দেশের লোকের নিকট সম্মান পাইতে হইলে একখান কোনরূপ অফিসিয়াল চাপরাসের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ করিতেছি। তিনটী অল্পবয়স্কা কামিন (স্ত্রী মজুর) আমার বাগানে কাজ

করিত। একদিন তাহাদের দুইজনের মধ্যে একটা কি বিষয় লইয়া ঝগড়া বাধিয়াছিল। সেই সময় তৃতীয়া বালিকাটি ঐ দুইটির একটিকে কহিল;—"ওরে, ওকে কিছু বলিস না, ও হাকিমের বেটী।" অনুসন্ধানে জানিলাম, "হাকিমের বেটীর" পিতা গ্রামের চৌকিদার। যাহা হউক, ম্যাজিষ্ট্রেটী কাজ হইতে অব্যাহতি পাইয়া অনেকটা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলাম। হাকিমীর অনুরোধে এখন আর আবদ্ধ থাকিতে হইবে না; অবাধে যথা ইচ্ছা যাইতে পারিব; সংসারের ও সাধারণের কাজে অধিকতর মনোসংযোগ করিতে পারিব।

১৯৩০ সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগেই বেচুকে ও যুগলাকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুর গিয়াছিলাম; লক্ষ্মীতলার বাটীর জিনিষপত্র গুছাইয়া, ঘর দুয়ারগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছিল। প্যারীলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাটীতে মহাসমারোহের দুর্গোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া অপরাহ্নে পঞ্চাশ ব্যঞ্জনসহ খিচুড়ি প্রসাদ, রাত্রিতে লুচি এবং ছয় সাত রকম মিষ্টান্নযুক্ত বৈকালিক প্রসাদ ভোজনে আমার ও বেচুর সামান্য জ্বর ও পেটের পীড়া হইয়াছিল। ঔষধ সেবনে কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়া চক্রধরপুরে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। শান্তিপুরে অবস্থিতি সময়ে যুগলা সময়মত পেট ভরিয়া খাইতে না পাইয়া বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল। যুগলার সবিশেষ পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে কিনা মনে হইতেছে না। ১৯০৫ সালে যে সময় পুরুলিয়ায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময় যুগলা আমাদের

সংসারে প্রবেশ করে। তখন তাহার বয়ঃক্রম ১২ বা ১৩ বৎসর। প্রমথ নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাতের সেই সময় জন্ম হয়। আফিসের পেস্কার বাবুর অনুরোধে যুগলাকে মাসিক ৪৲ টাকা বেতনে পাখা টানা কাজে নিযুক্ত করিয়া বাটীতে প্রভাতকে লইয়া বেড়াইবার জন্য পরিবারভুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। সেই সময় হইতে আমার পেন্সন লওয়ার পর পর্য্যন্ত কয়েক বৎসর আমাদের নিকট থাকিয়া যুগলা কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল এবং পরে বিবাহ করিয়াছিল। কিছুদিন পরে কলিকাতায় তাহার ভাগিনেয়দের সঙ্গে একযোগে মোটরের যন্ত্রপাতির একটা কারবার খুলিয়াছে। ভবানীপুরে কিছু জমি লইয়া একটী পাকা বাড়ীও নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছে। তবে আমাদের প্রয়োজনের সময় সংবাদ পাইলেই এখানে বা কলিকাতায় আমাদের নিকট আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকে। অবসর সময়ে বাটীর ভিতর বউ, ঝি এবং চাকর চাকরাণী মহলে কলিকাতার গল্প করিয়া থাকে। গল্পের মধ্যে কংগ্রেসের কথা, ভলন্টিয়ারদের কথা, বিদেশী বর্জ্জন, খদ্দর ব্যবহার, পুলিসের অত্যাচার, শোভাযাত্রা, বাঙ্গালী মেয়েদের স্বাধীনতা, দেশভক্তি ও সাহস প্রভৃতির বর্ণনাই অধিক ; শ্রোতৃবর্গ একেবারে পাড়াগেঁয়ে, ঐ সকল গল্প হাঁ করিয়া শুনিয়া খুব আনন্দ উপভোগ করিত।

১৯৩০ সালের ১১ই ডিসেম্বর আলিপুরের প্রাচীন উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সঙ্গে দ্বিতীয় পৌত্র নসুভায়ার

বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। এই বিবাহের বউভাত ও অন্যান্য ভোজেও (যথা পূর্ব্বং তথা পরং) অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছিল। S D. O. রায় সাহেব সর্ব্বরীকান্ত গুপ্ত, মিউনিসিপালিটার চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাঁকেবিহারী বর্ম্মন, শ্রীযুক্ত করালীচরণ বিশ্বাস প্রভৃতি কয়েকটী ভদ্রলোকের তত্ত্বাবধানে নিমন্ত্রিত এবং অতিথি অভ্যাগতদিগকে পরিতোষরূপে আহার করান হইয়াছিল। তমলুক সবডিভিসনের পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় এই বিবাহ উপলক্ষেও এক হাঁড়ি উৎকৃষ্ট মিঠাই লইয়া আসিয়াছিলেন। ঐ সবডিভিসনের অন্তর্গত ময়না থানার আসনান গ্রামবাসী শ্রীযুত কুমেদাচরণ দাস মহাশয় তাঁহাদের গৃহজাত উৎকৃষ্ট বড়ী প্রচুর পরিমাণ তাঁহার নাতি রমেন্দু শেখরের সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বোধহয় ঐ বড়ী আমরা দুই তিন মাস উপভোগ করিয়াছিলাম।

অন্যান্য রেলওয়ে ডিষ্ট্রীক্ট হেড কোয়াটারের ন্যায় বি, এন, রেলওয়ে কোম্পানী চক্রধরপুরে ইউরোপীয় এবং ভারতবাসীদের জন্য দুইটী পৃথক প্রমোদ ভবন (Institute) প্রস্তুত করাইয়াছেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গের জন্যই এগুলি প্রস্তুত করা হইয়াছে। বাহিরের লোকেও মাসিক চাঁদা দিলে তাঁহারাও এই ইনষ্টিটিউটে যাইয়া পড়াশুনা, আমোদ প্রমোদ করিতে পারেন। সকলে তাহা পারিয়া উঠে না। তারপর শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার সময় সহর হইতে প্রায় একমাইল দূরবর্ত্তী স্থানে যাইয়া আমোদ প্রমোদ করা যুবকদল ব্যতীত আমাদের মত লোকের পক্ষে অসম্ভব।

কালীমন্দির সগরের মধ্যস্থলে ; মন্দির প্রাঙ্গনে দুইটী পাকা ঘর নির্ম্মাণ করিয়া একটি ক্লাব (Club) এবং লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করিয়া সর্ব্বপ্রথম রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নেপাল সাউ মহাশয়ের কৃপাতেই প্রধানতঃ ঘর দুইটীর নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। অন্যান্য স্থান হইতেও অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনা পরম্পরায় বাধ্য হইয়া কালীমন্দির ও ক্লাব প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করায় এই অতীব প্রয়োজনীয় সাধারণের হিতকর কাজটি বোধহয় অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি এদেশের একটা মহাপর্ব্ব। উড়িয়া বা উড়িয়াভাবাপন্ন অন্য সম্প্রদায়ের আবালবৃদ্ধবণিতা এই সময় আনন্দে মাতিয়া উঠে। শারদীয়া মহাপূজার সময় বাংলাদেশ যেরূপ আনন্দে বিভোর হয়, স্থানীয় লোক মকর সংক্রান্তিতে সেইরূপ আনন্দোন্মত্ত হয়। এই সময় কয়দিন ধরিয়া তাহারা মনের সাধে নানাবিধ পিষ্টক, মৎস্য, মাংস, মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপভোগ করিয়া থাকে। কেরা অধিষ্টাত্রী শ্রীশ্রী৺ কালীমাতা সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন হইতে ভক্তদের জন্য প্রচুর পরিমাণ প্রসাদী ছাগমাংসের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন।

এই প্রদেশের আর একটি বিশেষত্ব এইস্থানে একটু লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। ১৮৯১ সাল হইতে প্রায় তিন বৎসর কাল এই জেলার অধিকাংশ স্থানেই চাকরী উপলক্ষে যাইতে হইয়াছিল। পুনরায় ১৯১১ সাল হইতে এই জেলাতেই বাস করিতেছি। কোনস্থানেই কোকিলের ডাক শুনি নাই, ভ্রমর দেখি নাই, বসন্তও

নাই, সুতরাং মলয় পবনও বহে না। আছে কেবল প্রবল শীত, গ্রীষ্ম আর বর্ষা, আর আছে মার্চ্চ এপ্রেল হইতে আরম্ভ করিয়া জুলাই আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রবল বাতাস। গরমের সময় ধূলিমিশ্রিত বাতাস (dust storms) এক একদিন ঝড়ের ন্যায় বহিতে থাকে।

এ প্রদেশের আদিম অধিবাসী কোল জাতির অধিকাংশই কৃষিজীবি। ধান্যচ্ছেদন করিয়া গৃহজাত হইলে, ইহারা প্রথমে জমিদারের ও মহাজনের প্রাপ্য পরিশোধ করে। তাহার পর ইহাদের মাঘীপরব আরম্ভ হয়। প্রায় একমাস ধরিয়া তাহারা গৃহজাত "হাঁড়িয়া" বা "পচাই" পান, নৃত্যগীত প্রভৃতি আমোদে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করে। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। মাঘী পরবের সময় যুবক যুবতী আপন মনোমত জীবন সঙ্গী বা সঙ্গীনী স্থির করিয়া লয়। তারপর পাত্র কন্যার অভিভাবকদের অনুমোদন এবং পাত্র পক্ষ হইতে পণের পরিমাণ স্থির হইলেই একদিন উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বজন, গ্রামের মুণ্ডা, এবং গ্রামবাসীদের সভায় বিবাহ হয়। সেই রাত্রিতে পান ভোজনেরও বিশেষ ব্যবস্থা হয়। পণের সঙ্গে নগদ টাকা ব্যতীত গরু, মহিষ, ভেড়া ছাগল, চাউল এবং হাঁড়িয়ার (পচাই মদ্য বিশেষ) ব্যবস্থাও হইয়া থাকে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৯৩১ সালের ১২ই মার্চ্চ তারিখে পৌত্র প্রভাতনাথের একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। বন্ধুবান্ধববর্গ খুবই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন প্রপৌত্রের মুখ দেখা পুণ্যবানের লক্ষণ। এরূপ সহজ উপায়ে পুণ্যবান হওয়ার প্রলোভন আমি সম্বরণ করিতে পারি নাই। ধরিয়া লইলাম, অতঃপর আমি একটী পুণ্যবান ব্যক্তি। শিশুর পিতামহ, পিতামহী তৈল ও মিষ্টান্ন বিতরণ করিলেন। দেবালয়ে শিশুর দীর্ঘজীবন কামনায় পূজা দেওয়া হইল, কয়েকটি বন্ধু বান্ধবকেও ভোজ দেওয়া হইল। স্বর্গীয়া পত্নী তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পৌত্র প্রভাতকে নিজ গর্ভজাত সন্তান প্রমথ অপেক্ষাও সমধিক স্নেহ করিতেন। সেই প্রিয় পৌত্রের পুত্রমুখ দেখিতে পাইলে আজ তিনি কতই না আনন্দ অনুভব করিতেন !

ইহার পর ১৯৩১।১৯শে এপ্রিল তারিখে যুগলাকে সঙ্গে লইয়া ২০শে ও ২১শে কলিকাতায় থাকিয়া ২২শে এপ্রিল শান্তিপুরে প্রভাতের শ্বশুর শ্রীযুক্ত চক্রপাণি বাবুর বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। ২৪শে তারিখে দিগনগর যাইয়া প্রায় চারিঘণ্টা অবস্থিতি। আমার প্রপৌত্র এবং চক্রপাণি বাবুর দৌহিত্র হওয়

উপলক্ষে একযোগে আনন্দ প্রকাশ জন্য কলিকাতা হইতে মিষ্টান্ন, কমলালেবু প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। দিগনগরে যাইবার সময় শান্তিপুর হইতে কিছু পানিতুয়া লইয়া গিয়া দিগনগরের বন্ধু-বান্ধবকে মিষ্টিমুখ করান হইয়াছিল। "শান্তিপুর স্মৃতি" রচয়িতা শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ মণ্ডল মহাশয়ের সহিত চক্রপাণিবাবুর বাটীতে অবস্থিতি সময়ে চাক্ষুষ পরিচয় হয়। তাহার পূর্ব্বেই তিনি একখানি "শান্তিপুর স্মৃতি" উপহার দিয়াছিলেন। শান্তিপুর সংক্রান্ত যে সকল প্রাচীন তত্ত্ব এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিতে গ্রন্থকার যথেষ্ঠ পরিশ্রম করিয়াছেন।

বাল্যবন্ধু চিরসুহৃদ স্বর্গীয় মতিলাল রায়ের পুত্র প্রিয়নাথ এবং মতিলালের সহোদর স্বর্গীয় হীরালালের পুত্র গোকুল ঐ সময়ের কিছু পূর্ব্বে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিল। স্থায়ীভাবে দিগনগরে বাস করিবার জন্য পৈতৃক দ্বিতল পাকা বাড়ীর সংস্কার করিয়া চতুস্পাশ্ববর্ত্তী জায়গার জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়াছে। গোকুল ছিল পি, ডবলিউ বিভাগের ওভারসিয়ার। ভদ্রাসনের সম্মুখবর্ত্তী সমস্ত জায়গাটিতে নানাবিধ শাকসব্জী উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া, কুলীদের সঙ্গে সমভাবে নিজেও বাগিচায় কাজ করিতেছে। কি যে আনন্দ হইল তাহা আর কি বলিব। আবার ইউনিয়ন বোর্ডের সুযোগ্য প্রেসিডেন্ট রমাপ্রসাদের চেষ্টায় একটি টিউব ওয়েল (tube well) হইয়াছে। রাস্তা ঘাট, পয়ো-প্রণালী প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ইহাদের দৃষ্টান্তে কাজ করিলে দিগনগর গ্রামের অধিবাসীবর্গ অচিরেই দিগনগরের সাধারণ

স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে সক্ষম হইবেন। ছোট বড় সকলেরই শ্রদ্ধা-ভক্তি, আদর অভ্যর্থনায় বড় প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের পৈতৃক বাসভবন এবং তৎসংলগ্ন রমাপ্রসাদের প্রপিতামহ পার্ব্বতীচরণ ও রঘুরামের সেই সুবিশাল অট্টালিকার পরিণাম দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইতে হইয়াছিল। কালের কুটিল গতিতে সর্ব্বত্রই এইরূপ ঘটিতেছে। পার্ব্বতীচরণের পূজার দালানের ন্যায় দালান আমাদের অঞ্চলে খুব কমই ছিল। চিলেকোঠা ও গম্বুজ ৪।৫ মাইল দূর হইতে দেখা যাইত। বাড়ীটি গ্রামের সদর রাস্তার উপর ; ঐ পথে সর্ব্বদাই নানাস্থানের ভদ্রলোকের গতি-বিধি ছিল, এখনও আছে। তাঁহারা বাড়ীটার নাম দিয়াছিলেন "কাসেল্ অব দিগনগর" (Castle of Dignagar)। হায়, সেই কাসেলের চিহ্নস্বরূপ মাত্র পশ্চিমাংশ এখন বর্ত্তমান আছে এবং সমস্তই যে অস্থায়ী তাহারই প্রমাণ দিতেছে।

দিগনগর হইতে চক্রধরপুর ফিরিবার সময় কলিকাতায় তিন-দিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম। ঐ সময় ডাক্তার বিমলাচরণ লাহা M. A., B. L., Ph. D., মিঃ চন্দ্রকুমার সরকার, প্রসিদ্ধ ইন্‌জিনিয়র, মিঃ সুকুমার বসু, নোয়াখালির ভূতপূর্ব্ব উকীল স্বর্গীয় বন্ধু গুরুনাথ সেনের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ সেন, সতীর্থ পরলোক-গত বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বন্ধুবর দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, শিবকালী কুমার (নান্থু বাবু) আমার জন্য নানাবিধ আমোদ প্রমোদের এবং আহারাদির

আয়োজন করিয়াছিলেন। ডাঃ বিমলাচরণ লাহা একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও অমায়িক, নিরহঙ্কার। সর্ব্বপ্রকারে কৃতবিদ্য হইয়া তিনি কয়েকখানি পুস্তকও মুদ্রিত করিয়াছেন। বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য ইনি যে সময় চক্রধরপুরে আসিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই সময় ইঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন কয়েক বৎসর চক্রধরপুরে বি, এন্, রেলের ব্রিজ ইনসপেক্টর (Bridge Inspector) পদে নিযুক্ত ছিলেন। যোগ্যতার পুরষ্কারস্বরূপ ক্রমে Bridge Engineer পদে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। হাওড়া শিবপুরে অন্যূন পঁচিশ ত্রিশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে একটী সুরম্য বাসভবন প্রস্তুত করিয়াছেন।

আর একটী কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। হাজারিবাগের অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ইনজিনিয়র শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিমলাবাবুর সঙ্গে চক্রধরপুরে আসিয়াছিলেন। পরিচয়ে জানিলাম, তাঁহার পূর্ব্বনিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সাতগেছিয়া গ্রামে। প্রতিদিন প্রায়ই বিমলা বাবু ও নবীন চন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইত। ক্রমে মনে হইল যে সময় আমরা বাঁকুড়া স্কুলে পড়িতাম (১৮৬৯-৭২) সেই সময় সাতগেছিয়া নিবাসী স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন; নবীনচন্দ্র নামক তাঁহার একটী পুত্র আমার সহপাঠী ছিল। এই নবীনই কি সেই নবীন, তাহা জানিবার নিমিত্ত একদিন বাহির হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার

পর দেখিলাম, নবীনচন্দ্র আসিতেছেন। উভয়েই রাস্তার ধারে দাঁড়াইলাম, প্রথমে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম;—"তুমি কোন্ নবীন হে?" তাহার উত্তরে নবীন চন্দ্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কোন যোগীন হে?" উভয়েই উভয়কে চিনিলাম; চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল, বাল্যকালের কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল। প্রায় ৫৮ বৎসর পরে বাল্যবন্ধু নবীন চন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইল; উভয়েই এখন প্রাচীন; কিন্তু দেখিলাম, নবীনচন্দ্র এখন পর্য্যন্ত বেশ বলিষ্ঠ আছেন। হাজারীবাগে পাকা বাড়ী এবং কিছু সম্পত্তিও করিয়াছেন।

প্রমথনাথ স্থায়ীভাবে চক্রধরপুরে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পর আমরা নিজেদের মধ্যে স্থির করিয়া লইয়াছিলাম যে আমার পেন্সানের টাকা হইতে আমার নিজ খরচের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা রাখিয়া, চক্রধরপুরের এবং শান্তিপুরের বাটী দুইটীর আবশ্যকীয় সংস্কারাদি করিতে হইবে এবং সংসার খরচের জন্য প্রমথকেও মাসে মাসে কিছু দেওয়া হইবে। ভাবিয়াছিলাম, ঐ টাকা হইতেই কিছু কিছু বাঁচাইয়া আমার শ্রাদ্ধাদির ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য রাখিব। এইভাবে কিছু টাকা জমিয়াছিল। কিন্তু পুত্রবধূ, তাঁহার পুত্রকন্যাগণ এবং নাতিবউ দুইটীর বিশেষ আগ্রহে চক্রধরপুরের নূতন একতলা ঘরের ছাদে উঠিবার সিঁড়ি এবং ছাদের চারিদিকে তিনফুট উচ্চ আলিসা প্রস্তুত করাইতেই ঐ টাকাগুলি ব্যয় হইয়া গেল। আর অধিক দিন বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। ইহধাম পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই আমার এই "ক্ষুদ্র

জীবনের কথা" পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবার বাসনা প্রবল হইয়াছে। বুঝিতেছি এটা বাতুলতা মাত্র, তথাপি ঐজন্যও কিছু কিছু বাঁচাইতে হইতেছে। যদি শীঘ্রই মৃত্যু ঘটে, তখন প্রমথকে নিজ অবস্থামত "তিল কাঞ্চনে" শ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে।

১৯৩১ সালের ১৬ই অক্টোবর (১৩৩৭।২৯ আশ্বিন) শুক্রবারে প্রভাতনন্দনের অন্নপ্রাশন আড়ম্বরশূন্যভাবে সমাধা করা হইয়াছিল। বাহিরের ব্রাহ্মণ দুই একটী হইলেও, ঘরের সাত আটটী ব্রাহ্মণ (পৈতাধারী) বালকবালিকাবৃন্দ, দাসদাসী, কুলীকামিন দশ বারটা, নাপিত, নাপিতাণী, মুড়ী-চিড়া-ডাল ভাজনী, মেথরাণী প্রভৃতি সকলকে বউমা অতীব যত্নে নানা উপচারে পরিতোষরূপে আহার করাইয়াছিলেন। সকলেই আপন আপন সাধ্যমত শিশুটিকে উপহার দিয়াছিল। যুগলাও ক্ষুদ্র হস্তের ক্ষুদ্র অঙ্গুলীর মাপমত একটি স্বর্ণাঙ্গুরী আনিয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শচীনন্দন,—নদীয়ার চাঁদ শচীনন্দন নহেন,—আমার খুল্লতাতপুত্র শচীপতি ভায়ার মধ্যম নন্দন বিকাশচন্দ্র, (যাহাকে প্রভাতপ্রমুখ সমস্ত ছেলেমেয়েগুলি "বোঁচাকাকা" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে) বি, এন রেলওয়েতে সাত বৎসর চাকরী করিয়া কি একটা পরীক্ষায় পাশ করিতে না পারায় পদচ্যুত হইয়াছিল; নানা চেষ্টা করিয়াও ভাগ্যদোষে আর চাকরীটি পায় নাই। প্রমথ ও তাহার ছেলেগুলি বোঁচাকাকাকে খুবই ভালবাসে, বোঁচাকাকাও অনেক সময় তাদের সঙ্গে শান্তিপুর, দিগনগর, চক্রধরপুর আসিয়া থাকিত। তাহাকে বেকার অবস্থায় সর্ব্বদাই ম্রিয়মান হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সকলেরই মনে উদয় হইল সেই মহাজন বাক্য—"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"। অতঃপর কোনরূপ একটা ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা ভাগ্যপরিবর্ত্তনের চেষ্টা করাই সঙ্গত স্থির হইল। প্রভাতভায়া ভাগ্যদোষে বা বুদ্ধিদোষে নানাবিধ ভাল চাকরী এবং উন্নতির পথ "হেলায় হারাইয়া" বোঁচাকাকার সঙ্গে একযোগে একটি ক্ষুদ্র কারবার খুলিবার সংকল্প করিলেন। কল্পনাটা মাথায় আসিবামাত্রই একটা কার্য্য-প্রণালী (prospectus) প্রস্তুত হইল; সঙ্গে সঙ্গে সহরের প্রকাশ্যস্থলে একটী ঘরভাড়া করিয়া, শান্তিপুর হইতে একটী সুদক্ষ দরজী (tailor) আনা হইল। সেলাইয়ের কল

আসিল ; ঘর হইতে টেবিল চেয়ার, বেঞ্চী প্রভৃতি দোকানে পাঠান হইল। মহা উৎসাহে শ্রীশ্রী৺কালীমাতার পূজা দিয়া ১৯৩১ সালের ২৬শে অক্টোবর সোমবার শুভক্ষণ, শুভলগ্নে দোকান খোলা হইল। কারবারের নাম হইল "চক্রবর্ত্তী এম্‌পোরিয়ম" (Chakravarti Emporium)। সমস্তই হইল, কিন্তু প্রভাত এবং বোঁচাকাকার মূলধন সামান্য ; স্বচ্ছল, অবস্থাপন্ন আর দুই একটী অংশীদার না পাইলে কারবার চালান কঠিন, এই চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিল। ঠিক এই সময় ভগবানের কৃপায় যুগলা আসিয়া দোকানের মূলধনে টাকা দিয়া দোকানের অবস্থা ফিরাইল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যুগলাও আমার ন্যায় সর্ব্বপ্রথমে মাসিক ৪৲ টাকা বেতনের চাকরীতে প্রবেশ করিয়া অধ্যবসায়, বিষয়বুদ্ধি এবং মিতব্যয়িতার গুণে ভাগিনেয়দের সঙ্গে এজমালিতে কলিকাতায় একটী কারবার চালাইতেছে। ভবানীপুরে একটু জায়গা লইয়া একটী পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহাকে একরূপ ভাগ্যবানই বলা যাইতে পারে। ভাগ্যবানের সঙ্গে ভাগ্য জড়াইয়া বোঁচাকাকার এবং প্রভাতের ভাগ্যও খুলিতে পারে। কোন একটী বিজ্ঞ ব্যক্তি এক সময় আমাকে বলিয়াছিলেন ;—"Link your luck with the lucky." অর্থাৎ—"ভাগ্যবানগণের সহিত তোমার নিজ ভাগ্য সংযুক্ত করিবে।"

২৯।৫।৩১ তারিখে প্রমথ সপরিবারে শান্তিপুর যাত্রা করিয়া প্রায় তিন সপ্তাহ সেখানে অবস্থিতির পর এখানে ফিরিয়া

আসিয়াছিল। পরিবারস্থ পুরুষ মাত্রেই আমার স্বর্গীয় পিতামহ হইতে প্রভাতনন্দন পৃথ্বীনাথ পর্য্যন্ত সকলেই একটু উদরপরায়ণ। বিশেষতঃ আমি প্রাচীন; বালকের ন্যায় "ভালমন্দ" খাইবার ইচ্ছা প্রবল জানিয়া, আসিবার সময় প্রমথ শান্তিপুর হইতে পানিতুয়া, রসগোল্লা, কলিকাতা হইতে ভেট্‌কী, বাগ্‌দা চিংড়ী, ইলিস, তপসী (Mangoc fish) এবং নানাবিধ তরিতরকারি প্রচুর পরিমাণ সঙ্গে আনিয়াছিল। বলা বাহুল্য, ইহার প্রায় অর্দ্ধাংশ বিতরণেই নিঃশেষ হইয়াছিল। দেশে খাজনাপত্র আদায় করিয়া যে কয়টী টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল, এইরূপে তাহার সদ্গতি হইল।

আর একটী লিপিযোগ্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। সর্ব্ব-লোকপ্রিয়, সদাশয় সবডিভিসনাল অফিসার রায় সাহেব সর্ব্বরী কান্ত গুপ্ত মহাশয়ের পত্নী ১৯৩১ সালের ৩রা জুন তারিখে হৃদরোগে হঠাৎ ইহধাম পরিত্যাগ করেন। এই সংবাদে জনসাধারণ সকলেই যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন। প্রেমিক স্বামী পত্নীর স্মৃতি রক্ষা জন্য চাইবাসা নগরে একটী মঠ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মঠ প্রতিষ্ঠার দিনে নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য, বিশেষতঃ পরলোক-গত পত্নীর প্রিয় আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব এবং দরিদ্রনারায়ণদিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই বিদায় লইয়া পুরী যাত্রা করিয়াছিলেন প্রেমিক সম্রাট সাহজাহানের প্রিয়তমা মহিষীর স্মৃতিচিহ্ন জগৎ-বিখ্যাত "তাজমহল" এবং প্রেমিক সর্ব্বরী কান্তের এই ক্ষুদ্র মঠের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

১৯৩১ সাল ২৫শে মে রাত্রিকালে বউমা স্বপ্নাবেশে দেখিয়া-

ছিলেন যেন তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা তিপিকে (তৃপ্তি) ৺কালীমাতার সম্মুখে বলিদান দিবার জন্য সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। বউমা মায়ের সম্মুখে কান্নাকাটি করিতেছেন, মেয়েটীকে রক্ষা রিবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইতেছেন। কিছুক্ষণ পরে যেন প্রত্যাদেশ পাইলেন ;—"জোড়া পাঁঠা দিয়া আমার পূজা দাও, তা'হলে তোমার মেয়েটী বাঁচিবে।" এই প্রত্যাদেশানুসারে ২।৭।৩১ তারিখে "জোড়া পাঁঠা" দিয়া মায়ের পূজা দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পর হইতেই মায়ের কৃপায় মেয়েটীর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভাল হইয়া আসিতে লাগিল।

৺কালীবাটীতে আমাদের প্রস্তাবিত ক্লাব ও লাইব্রেরী ঘরের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে ১৯শে জুলাই তারিখে মেদিনীপুর যাইয়া বন্ধুবর যামিনীনাথ মল্লিকের বাটীতে দুই দিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান নাড়াজোলাধিপতি কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ ও তৎসহোদর কুমার বিজয়কৃষ্ণ খাঁ এবং স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকীল মহোদয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। কোন ফল হইল না। কেবল কুমার বিজয়কৃষ্ণ আমার মানরক্ষা করিয়াছিলেন। রেলের ও ট্যাক্সির ভাড়া, কুলীর মজুরী, ছেলেপুলেদের জন্য মিষ্টান্ন, চাকরদিগের বখসিস্ প্রভৃতি বিষয়ে খরচ খরচা বাদে ঘরের ১০।১২৲ টাকা বাহির হইয়া গেল। বিগত বিশ বাইশ বৎসরের মধ্যে এইরূপ ভাবে ঘরের অনেকগুলি টাকাই সাধারণের কাজে ব্যয় করা হইয়াছে। সকলেই সমস্বরে কহিলেন, "মহাশয় আজকাল সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করাই কঠিন হইয়াছে ; দেশের

ভবিষ্যৎ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। রাজা, জমিদার, ব্যারিষ্টার, উকীল, বাণিজ্য ব্যবসায়ী, দরিদ্র কৃষিজীবি সকল শ্রেণীর লোকের মাথার উপর দিয়া একটা প্রবল ঝড় বহিতেছে, এই সকলের বুঝি কিছু খবর রাখেন না, ইত্যাদি।” এই সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতার পর আমার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। নিঃশব্দে চক্রধরপুরে ফিরিয়া আসিয়া নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলাম।

এই সময় বড়ই একটী দুঃসংবাদ পাইয়াছিলাম। প্রমথর শ্যালক পাঁচুগোপাল রায় চৌধুরী বিধবা মাতা, বিধবা পত্নী, একটী অপোগণ্ড শিশু রাখিয়া অপরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বউমা এই দুঃসংবাদে বড়ই শোক পাইয়াছিলেন।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকীল স্বর্গীয় বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ একটী লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর একজন উচ্চ দরের এজেণ্ট। এখানে আসিয়া প্রভাত ভায়াকে চেলা করিয়া লইলেন। চাইবাসাতেও দুই একটী এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। যতীন্দ্রনাথের পিতৃব্য শ্রীযুক্ত অটল বিহারী ঘোষ মহাশয় কলিকাতা ছোট আদালতের (Small Cause Court) উকীল। চাইবাসায় সুপরিসর প্রাঙ্গনযুক্ত একটা বাংলো ক্রয় করিয়া দেশী ও বিদেশ হইতে আনিত নানাবিধ ফুলের গাছে বাংলোটার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। নানাবিধ ইংরাজী, বাংলা এবং সংস্কৃত গ্রন্থে আট দশটি আলমারী পূর্ণ। শাস্ত্রানুশীলন, নানাবিধ দুরূহ বিষয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটন এবং এই সকল বিষয় সংক্রান্ত গবেষণাপূর্ণ পুস্তক রচনাই ইঁহার জীবনের একটী

প্রধান ব্রত। স্বভাব নিরহঙ্কার ও অমায়িক। প্রথম পরিচয়ের সময় হইতেই আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়া আসিতেছেন।

এই সময় দিগনগর ইউনিয়ন বোর্ড, তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়, আমার "ক্ষুদ্র জীবনের কথা" মুদ্রাঙ্কন সংক্রান্ত প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় সাক্ষাতকার আলোচনার জন্য মণি। (রমাপ্রসাদ) ৮।১১।৩১ রবিবার প্রত্যূষে চক্রধরপুরে উপস্থিত হইবে সংবাদ পাইয়া, শেষ রাত্রি ৪টার সময় উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া, অন্ধকারে আন্দাজে আন্দাজে পা ফেলিয়া প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী রেল ষ্টেসনে ঠিক সময়েই উপস্থিত হইয়াছিলাম। মণিকে দেখিলাম, সুটকেস হস্তে ট্রেণ হইতে নামিয়াছে। ৺কালীমাতার সাম্বৎসরিক পূজার গঙ্গাজল এবং পূজার উপকরণ প্রভৃতি লইয়া যুগলাও ঐ ট্রেণে আসিয়াছিল। যথারীতি পূজা ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি নির্ব্বাহ হইবার পর ৺কালী পূজার পর দিবস মণি কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছিল।

শান্তিপুর ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থানের বাসিন্দা প্রজাবর্গের নিকট প্রমথনাথের প্রাপ্য খাজনা অনেকগুলি টাকা বাকী পড়িয়াছিল। সেইগুলি আদায় করা প্রয়োজন। আবার এই সময় দেশে নানাবিধ সুখাদ্য পক্ষী, খরগোস এমন কি চিতাবাঘ (leopard) প্রভৃতি শিকারও পাওয়া যায়। প্রমথ নিজে এবং তাহার দ্বিতীয় পুত্র বীরেন্দ্র ও তৃতীয় পুত্র রবীন্দ্র খুবই শিকারপ্রিয়। তাহাদিগকে এবং চতুর্থ পুত্র সোমেন্দ্র ও পুত্রবধূ পূর্ণিমা দেবীকে সঙ্গে লইয়া ১৯৩১ ২২শে ডিসেম্বর তারিখে শান্তিপুর

যাত্রা করিয়াছিল। আমিও কলিকাতায় যাইয়া সর্ব্বপ্রথমে দাঁত বাঁধান, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত দেখাসাক্ষাৎ, কয়েকটী প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় করিয়া পরে দিগনগরে যাইয়া একদিন অবস্থিতি করিবার অভিপ্রায়ে ঐ সঙ্গে যাত্রা করিয়াছিলাম। বি, এন, রেলের চক্রধরপুরের ভূতপূর্ব্ব দেশীয় খাদ্যের কনট্রাক্টর (Indian Catering Contractor) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায় কালীঘাটে শ্রীশ্রী৺কালী মাতার চরণ দর্শন এবং নিকটবর্ত্তী আরও কয়েকটী দ্রষ্টব্য স্থান দেখিবার পর তাঁহার বাটীতে (১৪৭ বি, সদানন্দ রোড, কালীঘাট) মধ্যাহ্ন আহার সম্পন্ন করা হইল। তারপর ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত ব্যারিষ্টার এবং শচীপতির সহিত দেখা করিয়া বহুবাজারের আড্ডা অনিল বাবাজীদের বাটীতে ফিরিয়াছিলাম। ভূপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্র একটি কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য বিদায় লইয়া ভবানীপুরে অবস্থিতি করিতেছিল। তাহার সঙ্গে দেখা হইল না ; শুনিলাম একটী বন্ধু নিমন্ত্রণ করিয়া সেই দিন প্রাতে তাহাকে হাওড়ায় লইয়া গিয়াছে।

ইহার কয়েক দিন পূর্ব্বে বন্ধুবর দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিকের কনিষ্ঠ পুত্র ভূপতির অকাল মৃত্যু সংবাদে বড়ই ব্যথিত হইয়াছিলাম। ছেলেটীর জন্য দেবেন্দ্র কয়েক বৎসর ধরিয়া অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য ইউ, পি, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার সমস্ত স্বাস্থ্যকর স্থানেই লইয়া গিয়াছিলেন ; চিকিৎসার কোনই ত্রুটি ছিল না ; কিন্তু নিয়তি কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

২৫শে ডিসেম্বর প্রাতে যুগলাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা হইতে দিগনগর যাত্রা করিলাম। শান্তিপুর হইতে দিগনগর তিন ক্রোশ মাত্র ব্যবধান এবং ইহাই শান্তিপুরের পরবর্ত্তী ছোট লাইনের রেল ষ্টেশন। পূর্ব্ব পরামর্শমত প্রমথ ও তার ছেলে তিনটী শান্তিপুর হইতে আমার সঙ্গে দিগনগরে আসিয়াছিল। অনেকগুলি স্বগ্রামবাসী ভদ্রলোক আমাদের প্রতীক্ষায় ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মহানন্দে সদলবলে ভগ্নপ্রায় পৈতৃক বাস-ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, গোকুল বাবাজী (স্বর্গীয় হীরা-লালের পুত্র) আমার নিজের শয়ন ঘরটী ও সম্মুখবর্ত্তী দালান অতি সুন্দর ভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, টেবিল, চেয়ার, ফুলদানি, ফুলের তোড়া প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিয়া-ছেন। আবার নিজ বাগিচার উৎপন্ন কপি, আলু, বেগুণ, শাক, বিলাতি বেগুণ প্রভৃতির একটী ডালি সাজাইয়া ঘরের এক পার্শ্বে রাখিয়াছেন। কি যে একটা আনন্দ হইল, তাহা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। অন্যদিকে মণি (রমাপ্রসাদ) নিজ বাটীতে আমা-দের আহারের আয়োজন করিয়াছিল। প্রথম খণ্ডেই উল্লেখ করা হইয়াছে, বাড়ী দুইটী পরস্পর সংলগ্ন। কৃষ্ণনগর হইতে কই, মাগুর, রোহিত মৎস্য, সরপুরিয়া প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য সংগ্রহ করিয়াছিল।

অপরাহ্নে দিগনগর ইউনিয়নের বাসিন্দা হিন্দু মুসলমান অনেকগুলি বিশিষ্ট ভদ্রলোককে লইয়া একটী সভার অধিবেশন করা হইয়াছিল। কতিপয় অপরিণামদর্শী, বিকৃতমস্তিষ্ক যুবক ও

বালিকার দ্বারা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও পুলিস কর্ম্মচারীর নৃশংস হত্যায় অতীব ঘৃণা ও দুঃখ প্রকাশ করা এবং এইরূপ ভীতিব্যঞ্জক দুষ্কার্য্যের বিষময় ফল সম্বন্ধে আলোচনা করাই ছিল সভার উদ্দেশ্য।

সন্ধ্যার পর শ্রীমান প্রবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ভায়ার কন্যা শ্রীমতী প্রতিভার গান শুনিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। যদি উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট বিশুদ্ধ রাগ রাগিনী, তান লয় সম্বন্ধে উপদেশ পাইবার সুযোগ ঘটে, তাহা হইলে সময়ে মেয়েটী একটী ভাল গায়িকা বলিয়া পরিচিত হইবে, সন্দেহ নাই।

পরদিন প্রাতরাশের পর দিগনগর হইতে কলিকাতা আসিয়া অনিল বাবাজীদের বাটীতে দুই দিন অবস্থিতি। ১৮৯০ সালে যখন মেদিনীপুর হইতে সবডেপুটী পদে বর্দ্ধমানে বদ্‌লী হইয়া বন্ধুবর স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের বাসায় প্রথম কয়েক দিন অবস্থিতি করি, সেই সময় কলিকাতা ১৭নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট নিবাসী বঙ্গবাসী কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত কালীদাস মল্লিক এম, এ, মহাশয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। ইনি সে সময় বর্দ্ধমান রাজ কলেজের অন্যতম প্রফেসার ছিলেন। প্রথম হইতেই তাঁহার সরল, অমায়িক, আড়ম্বরশূন্য ব্যবহারের পরিচয় পাইয়াছিলাম। তারপর বোধ হয় ১৯১২ সালে তাঁহার সহিত আর একবার দেখা হইয়াছিল। ১৯৩১ সালে ৺শারদীয়া মহাপূজার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার একখানি সুদীর্ঘ পত্র পাইয়া শেষজীবনে তাঁহার সহিত আর একবার দেখা করিবার ইচ্ছা

প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯৩১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর দিগ-নগর হইতে ফিরিয়া ঐ দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহার সঙ্গে দেখা করি এবং তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পরদিন তাঁহার বাটীতে পরমাদরে প্রাতভোজন সমাধা হইল। কালীদাসের দুইটী পুত্র, মণিলাল ও চূণীলাল, দুইটী রত্ন। উভয়েই কৃতবিদ্য। দ্বিতীয় পুত্র চুণীলাল প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে। এখন উভয়েই ব্যবহারজীবি হইয়াছেন। কালিদাস বাবুর চালচলনের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, সেই সাদাসিধা ধুতি, চাদর, জামা, চটিজুতা খেলো হুঁকায় ধূম পান প্রভৃতি অভ্যাস ঠিক সেই ১৮৯০ সালের ন্যায়ই বর্ত্তমান রহিয়াছে। দেখিলাম, বসত বাটীর সম্মুখে গোল দীঘির দক্ষিণ পার্শ্বে পিতামাতার স্মৃতিকল্পে পথশ্রান্ত বা আরামপ্রয়াসীদের জন্য একটী সুন্দর চাঁদনী প্রস্তুত করাইয়া, বসিবার স্থান, জলপানের ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন। ঘোড়া ও গবাদি পশুর জলপানের জন্য সম্মুখস্থ রাস্তার ধারে চৌবাচ্চা প্রস্তুত করাইয়াছেন। চাঁদনীর মধ্যস্থিত স্তম্ভে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা খোদিত করা হইয়াছে ;—

"পিতা স্বর্গ ; মাতা স্বর্গাদপি গরিয়সী।"

কালীদাসের ন্যায় পুত্রেরাই প্রকৃতপক্ষে পিতৃমাতৃভক্ত, পিতা মাতার কৃতীপুত্র। ইনি সম্প্রতি স্বর্গলাভ করিয়াছেন।

আর একটী ভদ্রলোকের কথা এইস্থলে বিবৃত করা প্রয়োজন। ৺শারদীয়া মহাপূজার কিছুদিন পরে আলিপুরের

অ্যাডিসনেল জজ শ্রীযুক্ত পশুপতি বসু মহাশয়ের একখানি পোষ্ট কার্ড পাইলাম। তিনি তাহাতে লিখিয়াছিলেন, ১৯০২ সালে যখন তিনি একটিং মুন্সেফ পদে দিনাজপুর গিয়াছিলেন, সেই সময় যে যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল, আমি সেই যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কি না? কলিকাতায় যাওয়া হইলে তাঁহার বাটীতে যাইতেও অনুরোধ করিয়াছেন। ২৭শে ডিসেম্বর প্রাতে কালীদাস বাবুর মোটর লইয়া প্রথমেই জজ বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করিতে বাহির হইলাম। দেখিলাম, অতি সুন্দর খোলা জায়গায় একখানি সুন্দর দোতালা বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। (P. 136, Beckbagan Lane. P. O Park Circus, Calcutta)। মোটর হইতে নামিয়া পরিচয় দিবা মাত্র কোলাকুলি করিয়া নীচের একটী বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। পোষাক পরিচ্ছদ খুব সাদাসিধা, সাধারণ রকমের। আমাকে বসাইয়া একবার উপরে উঠিয়া গেলেন; একটু পরে নীচে নামিয়া আসিয়া কহিলেন;—"দাদা চলুন, একবার উপরটা দেখিয়া আসিবেন।" উপরে উঠিয়া দেখিলাম, তাঁহার গৃহিণী, দুইটী কন্যা, একটী পুত্র এবং ছোট ছোট কয়েকটী ছেলেমেয়ে এক লাইনে বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া আছে। ভায়া পরিচয় দিলেন, একটী মেয়ে বি, এ পাশ করিয়াছে, আর একটী আই, এ, পড়িতেছে, ছেলেটী এম, এ, পরীক্ষা দিবে। সকলেই ভক্তিভরে আমাকে প্রণাম করিলেন। কাহার কোন্ শয়ন ঘর, কোন্টী পড়াশুনার ঘর, কোন্ বারাণ্ডায় কি কি পাতাবাহার ও ফুলের

গাছ বসাইয়াছেন তাহা সমস্তই দেখাইলেন। দেখাইলেন না কেবল পাকের ঘর ও ভাণ্ডার। ভাগ্যবান্ পুরুষ! তাঁহাকে বেশ মিতব্যয়ী বলিয়া মনে হইল; কারণ তাহা না হইলে বহুদিন মুন্সেফী, কিছুকাল সব জজ এবং শেষ আডিসনাল জজ হইয়া কেহই বোধ হয় পশুপতি ভায়ার ন্যায় সংসারের সকল দিকেই সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন না।

২৯শে ডিসেম্বর প্রাতে প্যাসেঞ্জারে চক্রধরপুর ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। ট্রেণেই শরীরটা খুব খারাপ এবং অবসন্ন হইয়াছিল। ক্রমে পীড়া বৃদ্ধি হইয়া প্রায় দেড়মাস শয্যাগত ছিলাম। কলিকাতার প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া এখন (১৫।৩।৩২) অনেকটা সুস্থ হইয়াছি।

১৯৩২ সাল ২রা জানুয়ারী প্রমথ সদলবলে চক্রধরপুরে ফিরিয়া আসিল। দেখিলাম, বেচু (সোমেন্দ্র) সর্ব্বাঙ্গে বাতের বেদনা ও জ্বরে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ধরাধরি করিয়া অতি কষ্টে তাহাকে ভিতরে আনিতে হইল। বি, এন, রেলওয়ের সুযোগ্য আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন ডাক্তার নরেন্দ্র নাথ দে মহাশয়ের চিকিৎসায় এবং অকাতর পরিশ্রমে চার মাস পরে বোধ হইতেছে বেচু এযাত্রা রক্ষা পাইল; কিন্তু এখনও তাহাকে কিছুকাল ঔষধ সেবন করাইতে হইবে। এই ছেলেটির আকৃতি প্রকৃতি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের ন্যায়, লেখাপড়া শিক্ষা বিষয়েও বেশ আগ্রহ আছে। সেই জন্য ইহার প্রতি আমার স্নেহ মমতা অপেক্ষাকৃত একটু অধিক।

নবম পরিচ্ছেদ

আমাদের দেশে চলিত কথায় বলে, "ধান ভানিতে মহীপালের গীত"; আমারও হইয়াছে তাহাই। ঘর সংসারের কথা, বন্ধু-বান্ধবদিগের ও সমাজের অবস্থা প্রভৃতি নানা কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ মনে পড়িল বর্ত্তমান সময়ের কথা। আজকাল দেখিতেছি, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র, রায় বাহাদুর বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়দিগের আমলে যে সকল ভাষা, যথা "ভাতার", "শালা", "গর্ব্বস্রাব", "পুঙ্গিরপুত", ইত্যাদি কেহই অশ্লীল বিবেচনা করিতেন না, বর্ত্তমান সময়ের লেখকদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সকল কথা ব্যবহার করিতে হইলে শ্লীলতার অনুরোধে "ভাতারের" স্থলে লিখিতেছেন "ভা—র", শালারা স্থলে "শা—রা", একি বিড়ম্বনা। একটী ভদ্রলোক আজকালকার মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটী অর্দ্ধনগ্ন রমণী মূর্ত্তির তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে অন্য জন বলিয়াছিলেন ;—"সেটা চিত্রের দোষ নয়, চিত্তের দোষ।" এই যুক্তিটী ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। অনেক সাধনায় চিত্তসংযম অভ্যাস না হইলে উদ্দীপনা-ব্যঞ্জক কথাসঙ্গীত বা নাট্যাভিনয় প্রভৃতি মনকে যেরূপ বিচলিত করে, সেইরূপ বিশিষ্ট বিশিষ্ট চিত্রে খোদিত মূর্ত্তিতে অসংযমীদের মনের উপর একটা আধিপত্য যে বিস্তার করে, এটা ধ্রুব সত্য, এবং ইহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপমান করা হয়। সময়ের

গতির সঙ্গে মানুষের রুচি পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আজকাল যখন দেখিতেছি প্রাচীন কাব্য, প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন কলাবিদ্যা, বাউল সঙ্গীত, রায়বাঁস নাচ, পাইক নাচ, হাডুডু, বাতাবন্দি ইত্যাদি সেকালের খেলা প্রভৃতি লুপ্ত বিষয়ের পুনরুদ্ধারের জন্য দেশময় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, তখন হরু ঠাকুর ও এণ্টনি সাহেবের কবির লড়াই, গোপাল উড়ের "বিদ্যাসুন্দর" লোকনাথ রায়ের "নল দময়ন্তী", গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা, বউ মাষ্টারের "ধ্রুবচরিত্র", আনন্দ পণ্ডিতের "শ্রীমন্ত সদাগরের কমলে কামিনী দর্শন" এবং "সিংহল কারাগার হইতে পিতৃ উদ্ধার", ভগবতী পালের 'রাবণ বধ' প্রভৃতি পৌরাণিক যাত্রাগান ও দাসরথী রায়ের পাঁচালী পুনঃপ্রচলন করিতে পারিলে, প্রাচীন খাঁটী জিনিষের প্রকৃত সম্মান রক্ষা করা হয়। বর্ত্তমান কালের সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় এবং শিক্ষিতা রমণীবর্গের পক্ষে এগুলি নূতন। তাঁহারা যে ইহাতে একটা নূতনত্ব দেখিয়া আনন্দলাভ করিবেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে নানাস্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া চক্রধরপুরের শ্রীশ্রী৺কালীমন্দির নির্ম্মাণ, প্রতিমা প্রতিষ্ঠা, নিত্য সেবার একটা বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। কতিপয় ভদ্রলোককে লইয়া একটী কমিটী গঠিত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে এপর্য্যন্ত কাহারও মৃত্যু, কাহারও স্থানান্তরে গমনে সময়ে সময়ে নূতন নূতন সদস্য মনোনীত করা হইয়াছিল। সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে আমার দ্বারাই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত

হইত। এই স্থলে আর একটু বিশদ ভাবে সেই সকল বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিতেছি। ১৯১১ সালে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এখানে আসিয়া দেখিয়াছিলাম, হিন্দুদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের (মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী, উৎকল) ভিন্ন ভিন্ন দেব-মন্দির রহিয়াছে ; খ্রীষ্টিয়ানদিগের তিন চারিটি গির্জ্জা রহিয়াছে। নাই কেবল বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের কোন দেবালয় বা পূজোপাসনার স্থান। এই অভাবটী পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকজন শ্রীশ্রী৺কালীমাতার সাম্বৎসরিক পূজা সমাধার অব্যবহিত পরেই মিঃ বি, বড়ুয়া মহোদয়ের অত্রস্থ নূতন বাসাবাটীর পশ্চিম সংলগ্ন পতিত জায়গায় সম্মিলিত হইয়া এই সম্বন্ধে আলোচনার পর স্থির হইয়াছিল যে একটী কালীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, মন্দির ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠা এবং নিত্য সেবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। স্বর্গীয় গোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস, বড়ুয়া মহোদয়ের ভাগিনেয় পরলোকগত হরনারায়ণ বড়া, স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত করালীচরণ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত রঘুরাম মাড়োয়ারী প্রভৃতি অনেকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ঐ পতিত জায়গাটী কালীমন্দির নির্ম্মাণ জন্য হরনারায়ণ বাবু দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন ; সভাস্থলেই কিছু চাঁদা স্বাক্ষরিত হইল। তাহার পর হইতেই ১৭।১৮ বৎসর ধরিয়া, নানা ক্লেশ ভোগ এবং নিজ অর্থ ব্যয়ে নানাস্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ এবং প্রতিমা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রঘুরাম মাড়োয়ারী নিজে দুই তিন বারে

যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত করালী বাবু ও স্বর্গীয় গোকুল বাবুও স্থানীয় লোকদিগের নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ইহার পর চক্রধরপুরের "নারায়ণ জেনানা হাঁসপাতাল" যে দিন খোলা হইল তাহার পরদিন চাইবাসার উকীল শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ দেবীপদর বিবাহের বউভাত উপলক্ষে পরিবারস্থ অনেককে লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। এই ছেলেটী বিলাত হইতে (Mining Engineer) হইয়া আসিয়াছে। প্রমথনাথের ভায়রাভাই মুড়াগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত রামদয়াল রায়ের কন্যার সহিত দেবীপদর বিবাহ হইল। সেই বিবাহ ব্যাপারে রাখাল বাবু অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, আহারাদির আয়োজনও উপযুক্তরূপ হইয়াছিল।

চক্রধরপুরের উন্নতিকল্পে ভগবান আমার হাত দিয়া যে সমস্ত কাজ করাইয়াছেন সে সমস্ত ছাড়িয়া দিলেও, কেবল কালীমন্দির ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা তিনি যাহা করাইয়াছিলেন, অন্ততঃ সেজন্য ১৯৩২ সালের যুবকবৃন্দকে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ আমার নিকট একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা ত দূরের কথা; কখন কোথায় আমার কি ত্রুটি হইয়াছে তাহা ধরিতেই তাঁহারা বিশেষ ব্যস্ত। ১৯২৯ ২৬শে জুন তারিখে অত্রত্য বাঙ্গালী সম্প্রদায় কালীমন্দির প্রাঙ্গণে একটী বিশেষ সভার অধিবেশন করিয়া আমাকে একটী অভিনন্দন পত্র এবং নানাবিধ দ্রব্য উপহার দিয়াছিলেন সেই

ঘটনাটী এই তিন বৎসরের মধ্যেই অপরিণতবুদ্ধি যুবক সম্প্রদায় ভুলিয়া গিয়াছেন। কেবল অপরিণতবয়স্ক যুবকদের উপর সমস্ত দোষ অর্পণ করিলে আখ্যায়িকার নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ণ থাকে না। সেই জন্য দুঃখের সহিত লিখিতে হইতেছে যে দুই একটী প্রবীণ ব্যক্তিও একরূপ প্রকাশ্যভাবেই ইহাদের সহ-যোগিতা করিয়া কিছুদিন তাহাদিগকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী সমাজের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া ১৯৩২ সালের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে আমাদের বাটীতে একটী সভার অধিবেশন করিয়া, মন্দির সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় হইতে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলাম। নব্য সম্প্রদায়ও মহানন্দে সমস্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

বাঙ্গালী সমাজের এই ঘোর মেঘাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে নিজ সংসারের ভিতর একটু আলোকরশ্মি দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। এই সময় প্রমথনাথ নানাকারণে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাতনাথ অম্লান বদনে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া নিজের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা পিতাকে ঋণমুক্ত করিয়া-ছিল। ভগবান চিরদিন তাহাকে যেন এই ভাবে পিতৃমাতৃভক্ত করিয়া রাখেন।

এই ঘটনার কিছু পূর্ব্বে বর্ত্তমান সালের (১৯৩২) ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে মিঃ সুকুমার বসুর আত্মীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র-লাল মিত্র মহাশয় সস্ত্রীক চক্রধরপুরে আসিয়া মিঃ বসুর "Hill

View") নামক বাটীতে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইনি সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহোদর। প্রায় প্রতি দিনই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। দেখিলাম ইনি একজন পরম ভক্ত; শাস্ত্রজ্ঞ এবং সুপণ্ডিত ব্যক্তি। বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি আছে এবং ঐ তিন ভাষাতেই অনর্গল কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন। সংস্কৃত শ্লোক তাঁহার ন্যায় বিশুদ্ধভাবে আবৃত্তি করিতে এবং তাহার বিশদ ব্যাখ্যা অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেও বোধ হয় করিতে পারেন না। এই ত গেল তাঁহার নিজের কথা। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর কথাও এস্থানে কিছু উল্লেখের প্রয়োজন। প্রাতে উঠিয়া স্নানাহ্নিক, পূজা অর্চ্চনা সমাধা করিয়াই নানাবিধ মিষ্টান্ন—সিঙেড়া, কচুরী, ডালপুরী, দুই তিন রকমের পাঁপড় প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া প্রতিবেশী ভদ্র-লোক এবং অতিথি অভ্যাগতদিগকে ভোজন করাইয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাঁহার স্বহস্ত রচিত মনোহরা, সরভাজা, সন্দেশ, ডালপুরী কচুরী, সিঙেড়া, পাঁপড় প্রভৃতি পাকা পেশাদারী মোদকদিগের প্রস্তুত করা দ্রব্যাদি হইতেও অনেক শ্রেষ্ঠ। আমি একটী ঘোর উদরপরায়ণ প্রাচীন ব্রাহ্মণ; সেই সকল উপাদেয় দ্রব্য উপভোগ করিয়া মিত্র দম্পতিকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিতাম।

দশম পরিচ্ছেদ

দেখিতেছি "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি" মহাজন বাক্যটী অনেক সময় আমার অক্ষরে জীবনে অক্ষরে ফলিতেছে। আমাদের দিগনগরের পৈতৃক বাসভবন পত্নী বর্ত্তমানে তিনি দেশে যাইয়া প্রতিবৎসর একরূপ মেরামত করাইয়া রাখিতেন। ১৯১৯ সালে তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তির পর আমি সেদিকে আর বড় একটা দৃষ্টিপাত করি নাই। মধ্যম সহোদর দেবেন্দ্র নাথ ও তাঁহার পুত্রদ্বয় নবদ্বীপধামে বহু পূর্ব্ব হইতে একটী দ্বিতল পাকা বাড়ী প্রস্তুত করাইয়া সেইস্থানেই একপ্রকার স্থায়ীরূপে বসবাস করিতেছেন। কনিষ্ঠ রাজেন্দ্র নাথের বিধবা পত্নী ৺কাশীধামে বাস করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই ঘটিতে লাগিল। দুই তিনটি ঘর পড়িয়া গেল, বাটীর ভিতরে নানারূপ লতাগুল্ম জন্মিতে লাগিল। অন্যান্য ঘরগুলিতে ইঁদুর, চামচিকা, সর্প, ছুঁচা, উইপোকা এবং অন্যান্য নানাবিধ সরীসৃপ এবং কীট পতঙ্গ নির্ব্বিরোধে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিল। এইরূপ সময়ে দিগনগরে ইউনিয়ন বোর্ড এবং তাহার কিছুদিন পরে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইল। আমি নিজে, আমার পুত্র ও পৌত্রগুলি চক্রধরপুরে স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছি। দেবেন্দ্র নাথ ও তাঁহার পুত্রেরা নবদ্বীপের স্থায়ী বাসিন্দা, রাজেন্দ্র-পত্নী কাশীবাসিনী। দিগনগরের সেই ভগ্ন, জরাজীর্ণ, সসর্প বাটীতে

ম্যালেরিয়া এবং জঙ্গলপূর্ণ গ্রামে আমাদের মধ্যে কেহ যে কখন বাস করিবেন, তাহার সম্ভাবনা একেবারেই নাই। এই অবস্থায় পৈতৃক ভিটাটী বজায় রাখিবার একটা উপায় হইল দেখিয়া আমি বাড়ীটা ইউনিয়ন বোর্ডের হস্তে সমর্পণ করিলাম। এই সর্ত্ত রহিল যে ইউনিয়ন বোর্ড নিজ ব্যয়ে যেখানে যেরূপ প্রয়োজন সেইরূপ মেরামত ও পরিবর্ত্তন করিয়া লইবেন এবং তিন চারিটী ঘর তিন মাসের নোটীসে প্রয়োজন হইলে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন। শেষোক্ত সর্ত্তটী এই উদ্দেশ্যে লেখা হইল যে যদি কখন প্রমথ বা তাহার পুত্রেরা, দেবেন্দ্র বা তাহার পুত্রগণ কোন বিশেষ কারণে দিগনগরে আসিয়া বাস করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহাদের যেন কোন অসুবিধা না হয়। পৈতৃক ভদ্রাসনটী রক্ষা এবং আমাদের তিন ভ্রাতার জন্মস্থান দিগনগর এবং তন্নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি গ্রামের বাসিন্দা সকল শ্রেণীর লোকের বিশেষরূপ হিতসাধন কল্পেই উপরের লিখিত সর্ত্তে ইউনিয়ন বোর্ডকে বাড়ীটী দেওয়া হইয়াছিল। দিগনগরের স্থাবর, অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমার বুদ্ধি বিবেচনা মত দান বিক্রয়, বন্ধক বা অন্য যে কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিব, এই মর্ম্মে দেবেন্দ্র ও রাজেন্দ্র নাথ ইতিপূর্ব্বে আমার নামে একটী আমমোক্তার নামা (power of attorney) রেজেষ্টারী করিয়া দিয়াছিলেন। আমার নিকট হইতে আদেশ পত্র পাইবার পর ইউনিয়ন বোর্ড যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া বাড়ীটার যেখানে যেরূপ সংস্কার ও পরিবর্ত্তন প্রয়োজন তাহা করিয়া লইয়াছিলেন ; বাটীর ভিতরকার এবং বাহির প্রাঙ্গনের

সমস্ত জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া, একটী সুন্দর নলকূপ (tube well) প্রাঙ্গন পার্শ্বে সদর রাস্তার নিকট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। একজন উপযুক্ত ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত করিয়া উপযুক্তরূপ ঔষধ পত্রের বন্দোবস্ত সহ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। নিজেদের স্বার্থ কতকটা বজায় রাখিয়া এই দেশহিতকর কার্য্যে দেবেন্দ্র বা তাহার পুত্রদের অথবা রাজেন্দ্র-পত্নীর কিছুমাত্র আপত্তি নাই বিবেচনাতেই প্রথম হইতে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ না করিয়াই এই কাজটী সমাধা করিয়াছিলাম। রাজেন্দ্র-পত্নী প্রথমে আমার মতেই মত দিয়াছিলেন। পরে দেবেন্দ্র নাথ ও তাঁহার পুত্রগণ যখন আমার উক্তরূপ কৃত কার্য্য অনুমোদন করিলেন না, তখন রাজেন্দ্র-পত্নীও তাহাদের মতাবলম্বী হইলেন। এই সময় তিনি কিছুদিনের জন্য দেবেন্দ্র ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীপদর সঙ্গে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা ইউনিয়ন বোর্ডকে এবং আমাকে জানাইলেন যে একেবারে স্বত্বত্যাগ করিয়া কোন অংশই দেওয়া হইতে পারে না ; আমরা নোটীশ দিলেই ইউনিয়ন বোর্ডকে স্থানান্তরে উঠিয়া যাইতে হইবে। আমি অনেক বুঝাইলাম, কিন্তু কোনই ফল হইল না। ইহাকেই বলে, "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।"

অতঃপর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে উপদেশ দিলাম, "যেরূপ চলিতেছে সেইরূপ চালাইয়া যাও, হাত ধরিয়া, বা ঘাড় ধরিয়া উঠাইয়া দিবার সাধ্য ইংরাজ রাজত্বে কাহারও নাই।" তারপর দীনের বন্ধু, গরীবের বন্ধু

দয়াময় ভগবান উপরে আছেন ; তিনি যা হয় একটী সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন।”

পোড়াহাট ষ্টেটের বর্ত্তমান সেটেলমেণ্ট সংক্রান্ত সমস্ত কাজ শেষ হইয়া আসিয়াছে। পরচা বিলি ও খরচা আদায়ের জন্য কালনার প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত নীললোহিত ভট্টাচার্য্য আসিষ্ট্যাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার মহাশয় ১৯৩২ সালের এপ্রিল হইতে এখানে অবস্থিতি করিতেছেন। ইনি অতি অমায়িক, বিশিষ্ট ভদ্রলোক। সামান্য কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া পরচা (parcha) লওয়া হইল এবং চক্রধরপুর মৌজার নক্সার (settlement map) এক প্রস্থ নকল লইবার জন্যও টাকা জমা দেওয়া হইল।

কয়েকদিন পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে দেখিলাম মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, ডগলাস ৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধিবেশন সময়ে কোন দুর্ব্বৃত্তের গুলিতে নিহত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এই জেলারই আর একজন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডীও আততায়ীর গুলিতে নিহত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাংলার অন্যান্য স্থানে আরও কয়েকজন ইংরাজ ও পুলিশ কর্ম্মচারীও ঐভাবে নিহত হইয়াছেন। এই সকল নৃশংস হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য কি? ব্যক্তিগত শক্রতা নহে। তবে এই ঘৃণিত উপায়ে ভারতকে স্বাধীন করিতে পারা যাইবে, ইহাই কি উদ্দেশ্য? অপরিণামদর্শী বিকৃতমস্তিষ্ক, কাণ্ডজ্ঞানবিহীন না হইলে কেহই স্বপ্নেও ইহা ভাবিতে পারে না।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

চিত্তরঞ্জন দাশ, দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, রাস বিহারী ঘোষ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গমাতার অনেকগুলি উজ্জ্বল রত্ন ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। আবার বঙ্গমাতা আর একটী কৃতীপুত্র হারাইলেন। ১৯৩২।২০শে মে তারিখে বাংলা দেশের নবজাগ্রত জাতীয় জীবনের পথপ্রদর্শক, বাগ্মী, সুলেখক এবং অক্লান্ত স্বদেশসেবক বিপিন চন্দ্র পাল ৭৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস রোগে ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার ন্যায় চিন্তা-শীল রাজনৈতিক দেশে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

দিগনগর ইউনিয়ন বোর্ড, তত্রত্য ডিস্‌পেন্সারী, ছাপাখানার কাজ প্রভৃতি সংক্রান্ত কয়েকটী বিষয়ের সাক্ষাৎকার আলোচনার জন্য মণিকে (রমাপ্রসাদ) একবার আসিতে লিখিয়াছিলাম। তদনুসারে ১৯৩২।৩রা জুন শুক্রবার প্রাতে মণি এখানে আসিয়া আবার রবিবার সন্ধ্যার ট্রেণে কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছিল। এবৎসর অধিকাংশ স্থলেই প্রচুর পরিমাণ আম জন্মিয়াছিল। আমাদের সামান্য ১৫।১৬টা গাছেও অপর্য্যাপ্ত আম হইয়াছিল। বার বার প্রবল ঝড়ে হাজার হাজার আম অপরিণত অবস্থায় পড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাতে আমরা, সকলে বিশেষতঃ ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি, মনের সাধে আম উপভোগ করিয়াছিল। স্থানীয় ভদ্রলোকগণকেও কিছু কিছু দেওয়া হইয়া-ছিল। মণিকেও কলিকাতা যাইবার সময় কতকগুলি বাছাই করা উৎকৃষ্ট আম সঙ্গে দেওয়া হইয়াছিল।

প্রভাত ও বোঁচার একযোগে "Chakravartti Em-

porium" নাম দিয়া একটী Tailoring এবং Miscellaneous (দর্জ্জি ইত্যাদি) দোকান খুলিবার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে যুগলা তাহার প্রদত্ত মূলধন উঠাইয়া লইয়াছিল। সম্প্রতি প্রভাত ও বোঁচার মধ্যে মতভেদ হওয়ায় প্রভাত দোকানের সঙ্গে সমস্ত সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছে। পরে বোঁচা দোকানটী বাজারে উঠাইয়া লইয়া গিয়া নিজে চালাইতেছে ; দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইহাও সম্ভবপর হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে আমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিছু কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে। কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে যাইয়া নূতন নূতন দৃশ্য দেখিয়া শরীর ও মনের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে এই আশায় বাহিরে যাইবার ইচ্ছা ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিল। প্রমথ নাথের বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সাশমল (Mr. B. N. Sasmal Bar-at-law) তাঁহার কলিকাতার বাটীতে যাইয়া দুই চারিদিন থাকিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে দুই তিনবার লিখিয়াছিলেন। এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদিগের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিবার অভিপ্রায়ে তৃতীয় পৌত্র মণ্টুকে সঙ্গে করিয়া ৮ই জুন প্রাতের ট্রেণে কলিকাতা যাত্রা করিলাম। পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়ায় যুগলা মিঃ সাশমলের মোটরগাড়ী লইয়া হাওড়া ষ্টেসনে উপস্থিত ছিল। মিঃ সাশমলের বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম তিনি ডগলাস (Mr. Douglas) সাহেবের হত্যার মামলায় আসামীর পক্ষ সমর্থন জন্য মেদিনীপুরে রহিয়াছেন। তাঁহার পত্নী আমার

প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ের সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। বড়ই আনন্দ হইল।

পরদিন বৃহস্পতিবার অতি প্রত্যুষেই সামান্য বৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং রবিবার পর্য্যন্ত সমভাবেই বৃষ্টির সঙ্গে প্রবল বাতাস বহিতে লাগিল। যাহা হউক, মিঃ সাশমলের মোটরে বাহির হইয়া প্রথমে দাঁত বাঁধান হইল; তারপর অনিলদের বাটীতে দুইবার যাইয়া সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিলাম। শরীরটা একটু ভার ভার থাকায় রাত্রিতে লঘু আহার ব্যবস্থা করিতে হইল। ১০ই জুন শুক্রবার প্রাতে প্রথমেই স্বর্গীয় বন্ধু ভুপেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র ডাক্তার সৌরীন্দ্র কুমার গুপ্ত ব্যারিষ্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া চেতলায় নম্মুর শ্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখি ভায়া জামাই-ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে একটু পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থিতি ও জলযোগের পর নম্মুর দাদাশ্বশুর বৃদ্ধ যোগেন্দ্র বাবুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের পর বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন এবং স্নানাহার সমাধা করা গেল। অপরাহ্নে বাহির হইয়া কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয়ের পর বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম, মণি (রমাপ্রসাদ) এবং স্বর্গীয় বিপিন চন্দ্র পালের পুত্র, "বিজয়া প্রেসের" ম্যানেজার জ্ঞানাঞ্জন বাবু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা-বিষয়ের আলোচনা হইল। মিসেস সাশমল ইঁহাদিগকেও জলযোগ করাইলেন।

১১ই জুন শনিবার প্রাতে বাহির হইয়া মিঃ সুকুমার বসু ও

বন্ধুবর দেবেন্দ্র চন্দ্র মল্লিকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের পর বাটীতে ফিরিয়া ১১টার পর আহার। তারপর তিন চারি ঘণ্টা ঘোর বৃষ্টি ও মেঘ গর্জ্জন। অপরাহ্ন ৪টার সময় আকাশ পরিষ্কার হইল। সেই সময় গুপ্ত বাবাজী নিজের মোটরে Lake এবং তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি দেখাইয়া আনিলেন। কি মনোরম স্থানই হইয়াছে।

মণ্টু আজ প্রাতে দিগনগর গিয়াছে। রবিবার হইতে আকাশ পরিষ্কার থাকায়, দুই বেলাই কতকটা হাঁটিয়া বেড়াইবার সুবিধা হইয়াছিল। মণ্টু রবিবার ৩টার সময় দিগনগর হইতে ফিরিয়া আসিল। নন্তুর দাদাশ্বশুর প্রাতে আসিয়া অনেকক্ষণ নানা বিষয়ের আলোচনা করিলেন; সংসারের অশান্তি এবং পুত্রদিগের ব্যবহারই আলোচনার প্রধান বিষয়। সত্বরেই কাশীবাসী হইবার সংকল্প করিয়াছেন। ১২ই জুন রবিবার পরিষ্কার থাকায় খানিকটা হাঁটিবার সুযোগ হইয়াছিল। আজ মিসেস সাশমল আমার অনেক অনুরোধে সাধাসিধা রকমের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সোমবার ১৩ই জুন প্রাতে বউবাজারে অনিলদের বাটীতে আসিয়া ১৫ই বুধবার প্রাতঃ সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত সেখানে অবস্থিতি। সাড়ে ছয়টার পর প্রভাতের সাহায্যে নেংড়া আম ও মাছ ক্রয় করিয়া আনা হইল। অল্প সময়ের মধ্যে বামুণ ঠাকুর নানাবিধ তরকারী প্রস্তুত করিয়া অতি তৃপ্তির সহিত আহার করাইল। মিসেস সাশমল এবং ডাক্তার সৌরীন্দ্র কুমার আমাদিগকে হাওড়া পৌঁছিয়া দিবার জন্য তাঁহাদের মোটর গাড়ী

দুইখানি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গুপ্ত বাবাজী আবার অনেক-গুলি ন্যাংড়া আম এবং চারি পাঁচ রকম মিষ্টান্ন পাঠাইয়াছিলেন। স্বর্গীয় ক্ষীরোদের জ্যেষ্ঠ পুত্র সনৎ কুমার ষ্টেসন পর্য্যন্ত আসিয়া আমাদিগকে অনেক সাহায্য করিয়াছিল। বেলা ১১টার সময় খড়গপুরে ষ্টেসনে উপস্থিত হইবা মাত্র মিঃ পি, জি, কৃষ্ণস্বামী (Manager, Catering Dept B. N. Ry.) রুটি, মাখন ও কাফি লইয়া ট্রেণে আমাদিগকে জলযোগ করাইলেন। মণ্টুর বাল্য সহপাঠী ভূতপূর্ব্ব রেলওয়ে ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত দাশরথী ঘোষের পুত্র শ্রীমান্ মাখন লালের সহিত সাঁতারাগাছিতে তাহার দেখা হইল। মাখনের সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট ছিল ; কিন্তু বাল্য-বন্ধুকে পাইয়া সেও মণ্টুর সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে টাটানগর পর্য্যন্ত আসিল। সেখান হইতে উভয়েই চক্রধরপুর পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসিয়াছিল। ট্রেণের গার্ড সাহেবের সৌজন্যে মণ্টু অতিরিক্ত ভাড়া না দিয়া আমার সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসিতে পাইয়াছিল।

প্রমথ নাথের বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সাশমলের পত্নী এবং আমার স্বর্গীয় বন্ধু ভূপেন্দ্র কুমার গুপ্ত এবং রামলাল দে মহাশয়দিগের পুত্রগণের অকৃত্রিম যত্নে আমার এবারকার কলিকাতা ভ্রমণ খুবই আনন্দদায়ক হইয়াছিল। একটী বিষয় বাদে আর কোনও অসুবিধা হয় নাই। সেটী আর কিছু নহে ; আমার অভ্যাস ১০টার মধ্যে প্রাতের আহার সমাধা করা ; কিন্তু কলিকাতায় কোন স্থানেই সে সুবিধা হয় নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

চক্রধরপুরের সহিত আমার সংশ্রব স্থাপিত হইবার পর যে সকল ভদ্রলোকদিগের সহিত আলাপ পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই নাম ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, আরও কতকগুলি ভদ্রলোকের নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইঁহারা অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে চক্রধরপুরে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। আসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জেন নরেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। ইঁহার পিতা পেন্সন প্রাপ্ত আসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জেন স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার দে মহাশয়ের সঙ্গেও পুরুলিয়ায় অবস্থিতি কালে বিশেষরূপ আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। বাবু বাঁকেবিহারী চক্রধরপুর মিউনিসিপ্যালিটীর বর্ত্তমান চেয়ারম্যান, ইউরোপীয়ান ইনষ্টিটিউটের (European Institute) ষ্টোরকিপার শান্তিপুর নিবাসী প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রমেন বাবু), শান্তিপুর নিবাসী মনোরঞ্জন কুণ্ডু, বি, ট্রি, টি কোম্পানীর স্থানীয় প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রমোহন ঘোষ, পুরাতন অধিবাসী কার্ত্তিকপ্রসাদ বর্ম্মণ, হাজি সালারুদ্দীন, হাজি জুমেদালী সওদাগর, হাফিজ আহমহুল্লা, মৌঃ আমির হোসেন, মুন্সী সেলিম খাঁ, মুন্সী সরফরাজ খাঁ, মুন্সী আবদুল লতিফ (লতিফ মাষ্টার), শ্রীযুক্ত রামেশ্বর জোসী, শিউরাম মাড়োয়ারী, রতনচাঁদ মাড়োয়ারী, গৌরীশঙ্কর

মাড়োয়ারী, বাবু ভগবতী সিং, কানুকিশোর পানী, ভগবান সড়ঙ্গী, ঈশ্বরীচরণ সড়ঙ্গী, জানকীচরণ সড়ঙ্গী, মহাবীরপ্রসাদ স্থকুল প্রভৃতি ভদ্রলোকদিগের সঙ্গে পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। বাবু নরেশচন্দ্র ঘোষ ও সন্তোষকুমার সরকার আবগারী দারোগাদ্বয়, চক্রধরপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাঃ অশ্বিনীকুমার মিত্র, সব আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন, নগেন্দ্রনাথের ভ্রাতা রাখালচন্দ্র ঘোষ উকীল, রবীন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গেও এই সময় পরিচয় হয়। ইঁহাদের সকলেরই বাস (ডাঃ দে ব্যতীত) চক্রধরপুর মিউনিসি-প্যালিটীর মধ্যে। মিউনিসিপালিটীর বাহিরে রেলওয়ে কলো-নির (Railway Colony) মধ্যে নিম্নলিখিত ভদ্রলোকগুলির নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিঃ পি, জি, কৃষ্ণস্বামী, মিঃ এ, কে, এস, আইয়ার, মিঃ পি, জি, পটাঙ্কর, মিঃ বদরীপ্রসাদ, মিঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, মিঃ ললিতমোহন ভট্টাচার্য্য, মিঃ পি, এস, আইয়ার, মিঃ সতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মিঃ লছমীপ্রসাদ দীক্ষিত, মিঃ নগেন্দ্র নাথ সান্যাল, বি-এ, মিঃ ফণীন্দ্র নাথ রায় প্রভৃতি। পুলিশ বিভাগ, জঙ্গল বিভাগ এবং অন্যান্য গবর্ণমেন্ট আফিস সংক্রান্ত অনেক কর্ম্মচারীর সহিতই আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তাহার মধ্যে জঙ্গল বিভাগের ই, এ, সি (Extra Asst. Conservator) রায় সাহেব ভূষণচন্দ্র দাস, পুলিশ বিভাগের শ্রীযুক্ত বগলাপ্রসাদ কবি, মৌলবী আহম্মদ বক্স এবং জ্ঞানরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও আবগারী বিভাগের সব ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত সুধীর চন্দ্র ঘোষ, সন্তোষ কুমার সরকার ও নরেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়-

গণের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষাবিভাগের সব ইন্‌স্পেক্টর শীতলপ্রসাদ বসু মল্লিক এবং হরেন্দ্রকুমার দীক্ষিত মহাশয়দিগের নামও উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমান বর্ষের (১৯৩২) আর একটী বিষয়ও এই প্রবন্ধে স্থান পাইবার যোগ্য। এ বৎসর বঙ্গ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি ভারতের অনেক প্রদেশেই প্রচুর পরিমাণ আম জন্মিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে আমাদের চক্রধরপুরের বাগিচায় এত অধিক আম জন্মিয়াছিল যে চারি পাঁচ বার প্রবল ঝড়ে বহু আম নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমরা উদর পূর্ণ করিয়া উৎকৃষ্ট আম উপভোগ কবিয়াছিলাম। সহরস্থ পরিচিত ভদ্রলোকদিগের বাটীতেও অনেক আম উপহার দেওয়া হইয়াছিল। আবার বউমা মহেশপুরের মেয়ে, মহেশপুরের প্রসিদ্ধ আমসত্বের ন্যায় অনেকগুলি আমসত্বও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শতকরা চারি টাকা দরে ল্যাংড়া আম ইতিপূর্ব্বে আর কখনও চক্রধরপুরে বিক্রয় হইতে দেখি নাই।

বর্ত্তমান বর্ষে আম ত মনের সাধে উপভোগ করা হইল। কিন্তু দেশের অবস্থা দেখিয়া, আশঙ্কা হইতেছে জীবনের শেষাবস্থায় বুঝি এক মুঠা অন্নও শান্তির সঙ্গে উদরস্থ করিতে পাইব না। ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক অবস্থার উন্নতিকল্পে মহাত্মা গান্ধী কার্য্যক্ষেত্রে ফকীর বেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু অভীষ্ট সিদ্ধির আশায় তিনি যে পন্থাবলম্বন করিরাছিলেন, দুরদৃষ্টক্রমে তাহার ফল এই

হইল যে বিলাতের দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক হইতে ফিরিতে না ফিরিতেই তিনি স্বয়ং, সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, জহরলাল নেহেরু, জে, এম, সেনগুপ্ত, সর্দ্দার বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ ভারত-মাতার হাজার হাজার বিশিষ্ট সন্তানগণ কারাবরণ করিতে বাধ্য হইলেন। দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি ও শাসনতন্ত্রে, নিয়ন্ত্রিত বিধিব্যবস্থা, আইনকানুন অমান্য করিয়া একটা তুমুল আন্দোলন ও বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিলে অবশ্যই কোন রাজশক্তি ও শাসনতন্ত্র স্থির থাকিতে পারেন না। প্রতীকারের চেষ্টা নিশ্চয়ই করিয়া থাকেন। ফলে অর্ডিনান্সের পর অর্ডিনান্স জারী হইতে লাগিল। কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত হইল। বাংলার হিজলি, বক্সা, বহরমপুর, দমদম প্রভৃতি স্থানে নূতন নূতন জেলখানা খোলা হইল। ব্যয় যথেষ্ট বাড়িয়া গেল। সরকারী কর্ম্মচারীগণের শতকরা দশ টাকা হিসাবে বেতন কাটা হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে পিউনিটিভ পুলিস বসান হইল। যে কঠোর চণ্ডনীতির সাহায্যে প্রতীকারের চেষ্টা হইতেছে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতে সেটা মধ্যযুগের বর্ব্বরতা অবস্থার দিকেই অগ্রসর হইতেছে। শান্তিপ্রয়াসী ব্যক্তি মাত্রেই কবিগুরুর এই অকাট্য অভিমত সমর্থন করিবেন। কিন্তু শাসক ও শাসিতের মধ্যে পরস্পর শান্তি ও সহানুভূতি যে কি উপায়ে এবং কত দিনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উভয় পক্ষের মঙ্গলজনক শাসন-সংস্কার গঠিত হইবে তাহা এখনও ভবিষ্যতের অন্ধকারের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

——:০:——

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বি, এন, রেলওয়ের আসিষ্ট্যাট সার্জ্জেন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ দে মহাশয়কে এখান হইতে নয়ানপুর নামক দূরবর্ত্তী স্থানে বদলী করা হইয়াছে। ইনি অতি সদাশয়, অমায়িক ও পরহিতকারী ব্যক্তি। রেলওয়ে কলোনিতে দুর্গোৎসব প্রভৃতি অনেকগুলি সদনুষ্ঠান ইঁহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইঁহার পত্নীর চেষ্টায় "কল্যাণী সঙ্ঘ" নামক একটী নারী সমিতিও এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সর্ব্বলোকপ্রিয়, মহানুভব ব্যক্তির স্থান পরিবর্ত্তনে সকল সম্প্রদায়ভুক্ত সর্ব্বশ্রেণীর লোকই বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ সান্যাল মহাশয় এখানে "বেঙ্গলী ড্রামেটিক ক্লাব (Bengalee Dramatic Club) প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। ডাক্তার নরেন্দ্র নাথ তাহার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। এই ক্লাবের মেম্বরগণ ১৯৩২ সালের ২৪শে জুলাই তারিখে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটে ডাঃ নরেন্দ্র নাথকে উপযুক্তরূপ বিদায় অভিনন্দন দিয়াছিলেন।

পরলোকগত মহেন্দ্র নাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত করালী চরণ বিশ্বাস প্রভৃতি কতিপয় বাঙ্গালী ভদ্রলোকের উদ্যোগে চক্রধরপুর টাউনে একটী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। সম্প্রতি এই স্কুলটীকে মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। কিন্তু স্কুল কমিটীর সম্পাদক এবং সভ্য মহোদয়গণের অবহেলায় ও

উপযুক্তরূপ পরিদর্শন অভাবে বিদ্যালয়টী অতীব শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল। স্কুল সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের আমূল সংস্কার উদ্দেশে ১৯৩২ সালের ২৫শে জুলাই তারিখে আমাদের বাটীতে একটী সভার অধিবেশন হইয়া কতকগুলি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হইল। এখন মন্তব্য অনুযায়ী কাজগুলি সুসম্পন্ন করিতে পারিলেই স্কুলের অবস্থা ফিরিয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

চক্রধরপুর পুরাণাবস্তি নিবাসী শ্রীযুক্ত কানুকিশোর পানী মহাশয় প্রমুখ উড়িয়া ব্রাহ্মণদিগের প্রযত্নে উক্ত বস্তির জগন্নাথ দেবের মন্দিরে অনেকদিন হইতে প্রতিবৎসর সর্ব্বসাধারণ হিন্দু-বর্গের অর্থ সাহায্যে দুর্গোৎসব হইতেছে। রেলওয়ে কলোনিতেও ডাক্তার শ্রীনরেন্দ্র নাথ দে আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন মহোদয়ের উদ্যোগে, সর্ব্বসাধারণ হিন্দুদিগের অর্থ সাহায্যে বিগত চারি বৎসর হইতে মহাপূজা হইতেছে। উভয় স্থানই চক্রধরপুর টাউন হইতে দূর। মধ্যশ্রেণীর ভদ্র মহিলা এবং বালকবালিকাদের পক্ষে এতটা দূরে যাইয়া প্রতিমা দর্শন ও আমোদ প্রমোদ করা নিতান্ত কষ্টকর। সেইজন্য কালীমন্দির কমিটীর কয়েকজন সদস্য নগরমধ্যবর্ত্তী কালীমন্দির প্রাঙ্গনে শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজা করিবার সংকল্প করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। যুবকবৃন্দ প্রস্তাব করিলেন দুর্গাপূজা কমিটী সংগঠন করিয়া আমাকে উক্ত কমিটীর সভাপতি হইতে হইবে এবং যাহাতে সুশৃঙ্খলার সহিত বিহিত বিধানে পূজাটী নির্ব্বাহ হয় সে সম্বন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে,এই সকল ভদ্রলোকদিগের

মধ্যে অনেকের অনুদার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া কালীমন্দিরের সহিত সমস্ত সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলাম : এইরূপ অব্যবস্থিত-চিত্ত লোকদিগের সহিত পুনরায় যোগ দিয়া একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার লইতে সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে দেখিলাম প্রস্তাবটী খুবই সমীচীন ; ইহার সমর্থন করিয়া প্রস্তাবটা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে প্রকৃতই নগরের একটী অভাব এবং ভদ্রমহিলা ও বালকবালিকাদিগের একটী অসুবিধা দূর হয়। সুতরাং ইতস্ততঃ না করিয়া তাঁহাদিগের প্রস্তাব অনুযায়ী একটী "দুর্গাপূজা কমিটা" এবং উক্ত কমিটীর কয়েকটী সভ্যকে লইয়া ১৯৩২ সালের ৩০শে জুলাই তারিখে একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠন করা হইল। প্রয়োজনীয় অর্থ ও পূজার দ্রব্যাদি সংগ্রহ, প্রতিমা নির্ম্মাণ, দশকর্ম্মান্বিত উপযুক্ত পুরোহিত ও তন্ত্রধারক প্রভৃতির ব্যবস্থা ইত্যাদি পৃথক পৃথক কার্য্যের ভার ভিন্ন ভিন্ন সদস্যগণের উপর ন্যস্ত হইল। এখন জগন্মাতার কৃপায় এই সাধু সংকল্পটী সিদ্ধ হইলেই আনন্দের বিষয় হইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভাবিয়াছিলাম মদীয় অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র জীবনের কথাগুলি পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেই শেষ করিব। কিন্তু দেখিলাম, সময়টাও কাটে না, চক্ষের দৃষ্টি ক্ষীণ, সর্ব্বদা পড়াশুনাও করিতে পারি না। পাড়া পড়সী ভদ্রলোক সকলেই আপন আপন কাজে ব্যস্ত,—মিউনিসিপালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচন লইয়া দলাদলির স্থষ্টি হইয়াছে, অবসর সময়ে তাঁহারা এই আলোচনাতেই বিব্রত। সন্ধ্যার পর বসিয়া সদালোচনা বা গান বাজনার মজলিস প্রভৃতি বসাইবারও কোন স্থযোগ না পাইয়া পুনরায় কলম ধরিলাম।

চাইবাসার খ্যাতনামা উকীল রায় সাহেব নলিনীকান্ত সেন মহাশয়ের একটী কন্যার বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া ১৯৩২ সালের ২১শে আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যার সময় সেখানে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষের ভ্রাতা রাখাল বাবু উকীলের সহিত রাঁচি চাইবাসা মোটরে (Ranchi—Chaibassa Service) যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার পর বিবাহ বাটী হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে বাস ত্যাগ করিয়া রাখাল বাবুর সাহায্যে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলাম। নিজের বাটীতে স্থান সঙ্কুলান হইবে না বলিয়া অনতিদূরে পরিত্যক্ত ইউরোপিয়ান ক্লাবের (European

Club) সুপ্রশস্ত বাংলোটীতে নলিনী বাবু বিবাহ ও ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। পাত্রটী রূপে গুণে সমান; এম-এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। সুদক্ষ পাচক ব্রাহ্মণ দ্বারা মৎস্য, মাংস নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট প্রণালীতে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। চারি পাঁচ রকমের মিষ্টান্নও ছিল। সহরের যাবতীয় বাঙ্গালী ভদ্রলোক, নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী, সম্ভ্রান্ত মুসলমান ও হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকগণ নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেখিলাম কেবলমাত্র বালকবালিকার সংখ্যাই প্রায় দুই শতের অধিক হইবে। ছোট বড় সকলকেই নলিনী বাবু ভুরি ভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন; এক কথায় এই বিবাহে তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। সেই রাত্রিতেই আমাকে চক্রধরপুরে ফিরিয়া আসিবার নিতান্ত প্রয়োজন হওয়ায় রায় সাহেব নেপাল সাহা তাঁহার নিজের মোটরে রাত্রি ১০টার মধ্যেই আমাকে চক্রধরপুরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

এতদিন চক্রধরপুরে রহিয়াছি, কিন্তু এপর্য্যন্ত টাটানগর—জামসেদপুর যাইয়া টাটা কোম্পানীর সুবিখ্যাত লোহা-ইস্পাতের কারখানা (Iron and Steel Works) দেখিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। সাধটী কেন অপূরণ থাকে এই বিবেচনায় ১৯৩২ সালের ২৮শে আগষ্ট প্রাতঃ ৯টার প্যাসেঞ্জারে যাত্রা করিলাম। নন্টু ও মণ্টু (২য় ও ৩য় পৌত্র) আমার সহযাত্রী হইল। বন্ধুবর সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী উকীল মহাশয়কে পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়ায় তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ নিজেদের

মোটর লইয়া ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। প্রাতের আহার চক্রধরপুরেই সমাধা করিয়া গিয়াছিলাম। অপরাহ্ণ ৩টার সময় নানাবিধ ফলমূল, গৃহপক্ক গরম গরম খাবার ও মিষ্টান্নাদিসহ এক এক পেয়ালা কফি পানের পর শৈলেন্দ্রনাথ আমাদিগকে প্রথমে টাটার কারখানা দেখাইতে লইয়া গেলেন। দেখিলাম বিরাট ব্যাপার, সমস্ত কারখানাটার এক একটী বিভাগের কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে ও বুঝিতে হইলে বোধ হয় এক মাসেরও অধিক সময় লাগে। সুতরাং মোটামুটী রকমে দেখিয়া প্রথমে টাটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত সহরটী দেখা হইল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুপ্রশস্থ রাস্তা, নানাবিধ ফল ফুলের বাগান বেষ্টিত সুরম্য বাসভবন, হোটেল, ডাক্তারখানা প্রভৃতি দেখিয়া হঠাৎ কলিকাতার সাহেব পল্লীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাহার পর সাকৃচি নামক পল্লীতে গবর্ণমেণ্টের আফিস, ডাকবাংলো এবং পূর্ব্বপরিচিত উকীল প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অতুলচন্দ্র চৌধুরী, শরতশশী ও তৎসহোদর সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের সহিত দেখা সাক্ষাতের পর সুরেন্দ্র বাবুর বাটীতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফিরিয়া আসিলাম। এই টাটানগর প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চক্রধরপুরের ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা অত্যন্ত মন্দা হইয়া পড়ে এবং দ্রব্যাদির মূল্য অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি হয়। ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানটী জঙ্গলপূর্ণ ছিল ; আজকাল একটী প্রকাণ্ড সহরে পরিণত হইয়াছে। এই স্থানের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সহরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঁচটী পুলিশ থানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত টাটা

কোম্পানীর অগণিত সিপাই, শান্ত্রী ত আছেই। পূর্ব্বোল্লিখিত উকীলবর্গ, সুরেন্দ্রনাথ, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর শরতচন্দ্র আয়কাত এবং চাইবাসার বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বসু এখানে সুন্দর সুন্দর পাকাবাড়ী প্রস্তুত করাইয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ এখানকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল। পুত্র শৈলেন্দ্রনাথও আইন পরীক্ষা দিতেছেন। ভগবৎকৃপায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই পিতার সহকারীরূপে কাজ আরম্ভ করিবেন। কিছুকাল বিশ্রামের পর গরম গরম লুচি, মৎস্য, মাংস, গৃহপক্ক উৎকৃষ্ট মিষ্টান্নাদির দ্বারা আমাদিগকে পরিতোষরূপে আহার করাইয়া সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং ষ্টেসনে আসিয়া আমাদিগকে বোম্বেগামী ডাক গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। এই কৃত্রিমতার যুগে সুরেন্দ্রনাথের সরল, আড়ম্বরশূন্য বান্ধবোচিত ব্যবহারে বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম।

চক্রধরপুর পুরাতনবস্তি নিবাসী শ্রীযুক্ত কানুকিশোর পানী মহাশয় ১৯৩২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টার সময় স্থানীয় ধরমশালায় বর্ত্তমান বর্ষের শারদীয়া মহোৎসব সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনার জন্য একটী বিশেষ সভার অধিবেশন করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত হইয়া আমিও উপস্থিত হই। কানুকিশোর বাবুর উদ্যোগে কয়েক বৎসর যাবত পুরাতন বস্তির জগন্নাথ মন্দিরে দুর্গোৎসব হইয়া আসিতেছে। ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল এই ক্ষুদ্র নগরের মধ্যে ঐ একখানি মাত্র পূজা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর একখানি

পূজা হইলে তাঁহাদের পূজার জন্য উপযুক্তরূপ অর্থ সংগ্রহ হইবে না। কানু বাবুর এ প্রস্তাব অনুমোদন করিতে পারিলাম না। কহিলাম,—"বাপ, (তিনি আমাকে প্রথম হইতে পিতৃ সম্বোধন করিয়া থাকেন) নগরের প্রত্যেক পল্লীতে যদি এক একখানি পূজার আয়োজন হয় তাহা হইলে সমগ্র সহরটী উৎসবে পূর্ণ হইবে; ধূপ, ধুনা হোমাগ্নির সুঘ্রাণে সমস্ত নগর আমোদিত হইবে, প্রতি পল্লীতে স্তোত্র ও চণ্ডী পাঠ হইবে; শঙ্খ, ঘণ্টা এবং নানাবিধ বাদ্যে মুখরিত হইয়া নগরটীকে একটী অপূর্ব্ব উল্লাসে জাগাইয়া তুলিবে। যদি সহরবাসী অন্যান্য ভদ্রলোক আর একখানি বা দুইখানি পূজা করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাকেন, সেটা ত সৌভাগ্যেরই বিষয়। তাহাতে বাধা দেওয়া বা তাহার বিরোধী হওয়া নিতান্তই অসঙ্গত; তাহা ছাড়া ইহা উদারনীতিরও পরিচায়ক নহে। অর্থ সংগ্রহের পরিমাণমত পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আড়ম্বর এবং জাঁকজমক দেখান পূজার উদ্দেশ্য নহে।"

এই প্রসঙ্গে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমারোহের দুর্গোৎসব এবং নবদ্বীপের পশ্চিম প্রান্তস্থিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুটীরে দুর্গোৎসব সম্বন্ধীয় প্রবাদটী মনে পড়িল। এক বৎসর দুর্গোৎসবের সময় রাজসভার জ্যোতিষীবর্গের প্রতি প্রশ্ন হইল,—"বর্ত্তমান বর্ষে আমার রাজ্য মধ্যে মায়ের আবির্ভাব কোথায় হইয়াছে?" জ্যোতিষীগণ গণনা করিয়া সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহ নির্দ্দেশ করিলেন। মহারাজা চারিটী পারিষদসহ ছদ্মবেশে সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইয়া অচিরেই বুঝিলেন যে

সেই স্থানেই বাস্তবিক মায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। রাজধানীতে ফিরিয়া ভক্তপ্রবর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রতি বৎসর বিহিত বিধানে পূজা ও প্রসাদ বিতরণাদি নির্ব্বাহ জন্য ব্রাহ্মণকে একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন।

নানা হট্টগোলের মধ্যে উল্লিখিত প্রবাদটীর কথা সভায় বলিবার সুযোগ ঘটিল না। আমার কথার উত্তরে কানু বাবাজী কহিলেন ;—"আমাদের হইতেছে চিরদিনের পূজা ; আর কালী-মন্দির প্রাঙ্গনে যে পূজার প্রস্তাব হইতেছে সেটা কেবল বাঙ্গালী সম্প্রদায়েরই পূজা, আমাদের পূজাটীর অনিষ্ট চেষ্টাই হইতেছে এই পূজার উদ্দেশ্য।" কালীমন্দির প্রাঙ্গনে যাহাতে পৃথক পূজা না হয় কানুকিশোর এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষকবর্গের এইরূপ দৃঢ় সংকল্প বুঝিয়া আর বাদানুবাদ করা নিস্ফল বিবেচনায় নিঃশব্দে সভা পরিত্যাগ করিলাম। এস্থলে ইহাও উল্লেখের প্রয়োজন যে কানুকিশোর ও তাঁহার সহচরবর্গ সকলেই উড়িয়া। অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত কতিপয় ব্যক্তিও সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমাদের বাল্যকালে শুনিয়াছি, তৎসময়ের কোন কোন উড়িয়া নাকি বলিতেন ;—"মহাপ্রভু জগন্নাথো করে, মহারাষ্ট্র রাজা হোয় ত গেহাড়ি পো বঙ্গাড়ী কো হানি পকাই।" হায় হায় উড়িয়া ভ্রাতাদিগের এই বাঙ্গালী বিদ্বেষ যে এখন পর্য্যন্ত প্রায় সমভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে উপরের ঘটনায় তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। শিক্ষা সংস্কার আদি বিষয়ে তাঁহারা বাঙ্গালীর নিকট যে কতটা ঋণী তাহা বলা যায় না। কোন নাটকের বা যাত্রাগানের অভিনয়

করিতে হইলেও বাঙ্গালা নাটক উড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহারই অভিনয় এখন পর্য্যন্ত করিয়া আসিতেছেন। জাতিগত, ধর্ম্মগত, আচারগত সাদৃশ্য বাঙ্গালীর সহিত তাঁহাদের যতটা আছে, বোধ হয় ভারতের অন্য কোন প্রদেশবাসীদের সহিত সেরূপ নাই ; অথচ চিরদিনই বাঙ্গালী বিদ্বেষ পোষণ করিয়া আসিতেছেন ; কি পরিতাপের বিষয়।

ঠিক এই সময় আবার দেশব্যাপী একটা মহা-আন্দোলনের বিষয় সংক্ষেপেই কিছু লিখিতে হইতেছে। আমাদের সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড্ ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে যে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ভারতের সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায় বিচলিত হইয়াছেন। সকল প্রদেশেই নগরে নগরে তাহার প্রতিবাদ হইতেছে এবং প্রত্যাহারেরও চেষ্টা হইতেছে। এই আন্দোলনের কি ফল হইবে তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন। মহাত্মা গান্ধী আবার এই সম্পর্কে অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হওয়াতে সমস্ত ভারতে এক ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। হিংসানীতির প্ররোচনায় যে একটা ঘৃণিত বিপ্লববাদের উৎপত্তি হইয়াছে, প্রধান মন্ত্রীবরের ঐরূপ সিদ্ধান্তের হেতু কি তাহাই ? অবশ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, অভিশপ্ত বাঙ্গালাদেশে বিপ্লবীদলের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন বোধ হয় হিন্দু। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা এত তুচ্ছ যে এই মুষ্টিমেয় লোকের দুষ্কৃতির জন্য সমগ্র হিন্দুজাতিকে প্রকারান্তরে অপদস্থ ও নির্য্যাতন করা

আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তাদের পক্ষে কতদূর সঙ্গত তাহা তাঁহাদের ন্যায় দায়িত্বপূর্ণ মহৎ ব্যক্তিরা নিজে না বুঝিলে আর কেহই তাঁহাদিগকে বুঝাইতে পারিবে না। সকল দেশেই প্রবাদ আছে, "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।" (Weal and woe come by rotation.) আমাদের দুঃখের চক্রই বহু শতাব্দী সমভাবেই চলিতেছে; কখন গতি একটু মন্থর, কখন বা প্রবল; সুখের চক্র যে আবার কতদিনে ঘুরিতে আরম্ভ হইবে তাহা কল্পনাতে আনিতে পারি না।

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই শেষ করিলাম। যদি আরও কিছুদিন ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় এবং লিপিযোগ্য কিছু সংঘটিত হয়, আশা করি, তাহা বংশধরগণের মধ্যে কেহ না কেহ নিশ্চয়ই লিখিয়া রাখিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমার জীবনে এমন কোন বৈচিত্র্য-পূর্ণ ঘটনা ঘটে নাই যাহার জন্য অথবা আপনাকে একটা দিগ্‌গজ বা ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ প্রমাণ করিবার অভিপ্রায়ে এই আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। জীবনের সাধারণ ঘটনাগুলি এবং যে ভ্রমপ্রমাদ সংঘটিত হইয়াছে তাহাও বেশ ধারাবাহিকরূপে বর্ণনা করিতে সক্ষম হই নাই। আমি অতি তুচ্ছ ও নগণ্য ব্যক্তি। আমার জীবনী হইতে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের বা অপর কাহারও যদি কিছুমাত্র উপকার হয় এই আশায় এবং কতকটা সাময়িক খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া মা জগদম্বার নাম স্মরণ পূর্ব্বক এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস

পাইয়াছি মাত্র। তবে আমার মনে হয় প্রত্যেক বংশেরই এইরূপ একটী ইতিহাস বা বিবরণ থাকা উচিত। তাহাতে সমসাময়িক ঘটনাবলী অনেক অবগত হইতে পারা যায় এবং পরবর্ত্তী বংশধরগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অনেক তথ্য অবগত হইতে পারেন। ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে আজীবন নিজে বড়ই অমিতব্যয়ী ও উদরপরায়ণ। তজ্জন্য অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আহার ও আহার্য্যের বিবরণগুলি অনেক স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারি নাই। সম অবস্থাপন্ন বা সহানুভূতিসম্পন্ন পাঠকবর্গের নিকট ইহা বোধ হয় বিরক্তিকর হইবে না এই মাত্র ভরসা। পূর্ব্বে কখনও বিশেষ-ভাবে বাণীর সেবা করি নাই সুতরাং লিপিচাতুর্য্য মোটেই নাই। আশা করি, সহৃদয় পাঠকপাঠিকাবর্গ এই আখ্যায়িকার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিজগুণে সংশোধন করিয়া লইবেন। জয় মা তারা।

সমাপ্ত

ত্রুটী স্বীকার

এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। আমি নিজে এই কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ না হওয়ায় এবং মুদ্রাকরের অসাবধানতার জন্য অনেক ভ্রম প্রমাদ ইহাতে রহিয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটী নিম্নে শুদ্ধি-পত্রে সন্নিবেশিত হইল।

কলিকাতা
১৫ই কার্ত্তিক ১৩৩৯ সাল।

বিনীত
শ্রীরমাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	১২	লিখিয়াছেন	লিখিয়াছিলেন
৬২	৮	wark	work
৭৩	১৪	প্রাতঃস্মরণীয়	প্রাতঃস্মরণীয়া
৭৯	২১	দুই ঘণ্টা	দুই এক ঘণ্টা
৮১	১	পিপাসা পাইত।	পিপাসা পাইত,
৮২	২০	কাজ করেন এবং	(উহ্য হইবে)
৮৬	১৪	প্লীডার	গভর্ণমেণ্ট প্লীডার
৮৭	২০	অপরিণত	অপরিণতবয়স্ক
৯২	১৯	জমিদারী	জমাদারী
৯৫	৯	ডেপুটী	সব-ডেপুটী
৯৫	১৬	ঐ	ঐ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৭	২২	ডাঃ দুর্গানন্দ দাস	ডাঃ দুর্গানন্দ সেন
১১৮	২	রাধা গোবিন্দ চৌধুরী	চৌধুরী রাধা গোবিন্দ পাল
১২৬	২১	Derector	Director
১৩০	২২	আসিস্ট্যান্ট	পার্সনেল আসিস্ট্যান্ট
১৩৪	১	শরৎচন্দ্র	শরৎকুমার
১৫০	১৩	কানু ভুঁইয়ার	কালু ভুঁইয়ার
১৬৪	৭	Mr. C. I. S	Mr. C. J. S.
১৮৬	১৯	ডাঃ জাহরুল্লা	ডাঃ জহুরুল্লা
১৯৬	৮	দুর্গানাথ	দুর্গাদাস
২০২	১৩	ডেপুটী কালেক্টর	কমিশনার
২০৬	৯	হেমেন্ত কুমার	হেমন্ত কুমার
২১৩	৫	১৯১৮	১৯২৮
২২৭	১৮	কৃষ্ণচন্দ্র গ্রহরাজ	কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ
২৯১	৮	কোলহাল	কোলহান্
৩০২	১৯	oreign	Foreign
৩৩০	১০	সুরেন্দ্র নাথ	সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার
৩৩৬	১৩	যশোহর জেলার···গ্রামে	খুলনা জেলায়
৩৪৬	৭	cooly	coolly
৩৮১	৩	অক্ষরে জীবনে অক্ষরে	জীবনে অক্ষরে অক্ষরে
৩৯৯	৪	শৈলেন্দ্রনাথ	শৈলেন্দ্রকুমার